কিরণময়ী।

উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড।

"She had a rustic, woodland air,
And she was wildly clad:
Her eyes were fair and very fair;
—Her beauty made me glad."

Wordsworth.

কলিকাতা—৮১ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনীলমাধব শেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা;

১৩ নং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের লেন,
গ্রেট ইডিন্ প্রেসে,
শ্রীঅমৃতলাল মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯২ সাল।

ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	জেলার অন্তপাতী	সহরের
২	৬	অন্তপাতী	মধ্যে
৩	৫	বলিলাম	বসিলাম
৫	১৩	ষেহায়া	আমাদের নিকট নির্লজ্জা।
৯	২২	উত্তর	ভাব
১৩	২৩	রূপ	কথা
২১	১	দরিদ্র গ্রন্থকার	জ্ঞানহীন লেখক
২৩	৩	কথা	বিষয়
৮৭	১৯	কিন্তু	কিছু
৯০	১৭	নরেন্	শৌরীন্দ্র
৫	১৮	একাকী হইলেন	দুইজনে মাত্র রহিলেন।
৬	২৩	নরেন্দ্রনাথ	শৌরীন্দ্রমোহন
৫	২১	যেখান	যেখানে
২	৮	বদি	যদি
৪	১	ই	দুই
	৭	নন্দন	মন্দর
৮	১৮	ধরিতে	গড়িতে
৫	২১	পৃথিবীকে	পৃথিবী
	১৭	মত আর	মত
১	২১	পরিচ্ছেদ	স্তবক
২	২০	সবসে	সববসে

৪৭ পৃষ্ঠা ২০ পংক্তিতে পদ্মপলাশবৎ ও ৪৮ পৃষ্ঠা ৭ পংক্তিতে সেই গোলাপ নিন্দিত এই দুইটী কথা ত্যাগ করিয়া পড়িবেন।

৫৩ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তিতে 'যুবকের সরলার মনে দেখিয়া' স্থানে 'যুবককে দেখিয়া সরলার মনে' হইবে।

৪ পৃষ্ঠা ১ পংক্তিতে 'সেই' স্থানে 'সেই সে' এবং ৫১ পৃষ্ঠা ১৩ পংক্তিতে টিপিয়া' স্থলে 'ঈষৎ টিপিয়া' হইবে।

ইহা ব্যতীত সুখী স্থানে সুখী, আলুলায়িত স্থানে আলুলায়িক, উপশম স্থানে উপমশ আদি যে সকল সহজবোধগম্য ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহা অনাবশ্যক বিবেচনায় সংশোধিত করা গেল না।

অভ্যর্থনা।

প্রথম পরিচয়ে আমরা পাঠকবৃন্দের সহিত সদালাপ করিতে পারিলাম না। ভদ্রলোকের সহিত ভদ্রলোকের আলাপ করিতে হইলে, প্রথমতঃ তাঁহার সহিত শিষ্ট ব্যবহার করিতে হয়, তাঁহাকে উচ্চাসন দিয়া আপনার সততার পরিচয় দিতে হয়, কিন্তু আমরা কল্পনারূপ মহা পিশাচীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া সততার মস্তকে পদাঘাত করিতে বাধ্য হইলাম—ভদ্রতার পরিবর্ত্তনে অভদ্রতার পরিচয় দিতে বসিলাম, যেহেতু আমাদিগের প্রথম অভ্যার্থনার স্থান কোন সুরম্য অট্টালিকা নহে, বা কোন চাক্‌চিক্য বিশিষ্ট হর্ম্ম্য মধ্যে নহে, একটী সামান্য অপরিস্কার কদর্য্য প্রান্তর, যেখানে শত শত নর নারীর জীবন অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, যেখানে মনুষ্য, মনুষ্যের প্রাণ সংহারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছে এবং যে স্থানের নাম শুনিবা মাত্রই সজ্জন, অধর্ম্মের ভিত্তিভূমী বলিয়া দূরে পলায়ন করিয়া থাকে, আজ আমরা পাঠকবৃন্দকে সেই পাপ পরিপূর্ণ জীবন ও মরণ সঙ্কট স্থলে লইয়া যাইয়া তাঁহাদিগের সহিত প্রথম আলাপ করিব। আমাদিগের আলাপের অস্ত্র সুমধুর বাক্য নহে—বা ভদ্রোচিত সম্ভাষণ নহে। সম্ভাষণের মধ্যে শব্দশূন্য নিস্তব্ধ-রজনীর ঝিল্লীরব এবং অর্ঘ্যের মধ্যে সুদীর্ঘ ও স্থূলকায় যষ্টি; যদি

পাঠকমহাশয়ের এতদ্‌উভয় মনোনীত হয়, তবে আমাদিগের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া "কিরণময়ী" পাঠে প্রবৃত্ত হউন।

এইরূপ সম্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা বলিব; উপন্যাস পাঠক মাত্রেই প্রেমের কথা শুনিতে ভাল বাসেন। প্রেমের কথা শুনিবার জন্য তিনি অতি দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া—আপন মস্তিষ্ক উৎপীড়ন করিয়া, অবশেষে হয় ত কোন নায়ক নায়িকার কুরুচিপূর্ণ, অপবিত্র প্রেমের কথায় কর্ণপাত করেন এবং বহু সংসর্গ দোষে হয় ত আপনিও কুরুচিপ্রিয় হইয়া পড়েন। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, "কিরণময়ী" পাঠকবৃন্দের নিকট সমাদৃত হইবেই হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, "কিরণময়ীর" প্রেম সমাজ দূষিত হইলেও তাহা পবিত্র, অকপট ও সরলতা পরিপূর্ণ। যে প্রেম, সেই পবিত্র প্রেমময়ের প্রেম হইতে নিঃসৃত—যে প্রেম, স্বভাব স্বহস্তে মানব-হৃদয়ে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই প্রেম স্বভাবে নর নারীর হৃদয়ে মিলিত হইলে, তাহাই সুন্দর ও পবিত্র। এইটী প্রমাণের জন্য আজ আমি "কিরণময়ীর" প্রেম-দৃশ্য পাঠকবৃন্দের নয়ন সম্মুখে অর্পণ করিলাম, সবিস্তার পাঠ করিলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব।

কিরণময়ী।

উপন্যাস।

প্রথম স্তবক।

কামিনী কে?

ধূ ধূ মাঠ—অনন্ত, অসীম। মাঠের এক সীমা হইতে সীমান্তর দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহার নাম "ওরগাঁয়ের ডাঙ্গা"। বর্দ্ধমান জেলার অন্তপাতি প্রায় আট ক্রোশ দূরে, এই নামধেয় একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর বহুকালাবধি পতিত আছে। ইহাতে এ পর্য্যন্ত কোনরূপ শস্যাদির আবাদ নাই, কেবল মাত্র চারিদিকে ছোট ছোট আগাছার ঝোপ, এই অনন্ত মাঠ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগের গমনাগমনের পথ, পদরেখায়-অঙ্কিত রহিয়াছে। পাঠক মহাশয় জানিতে পারেন, পূর্ব্বে এই মাঠে মানুষ খুন হইত, দুরাত্মা দস্যুরা এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের ভিতর লুক্কায়িত থাকিয়া রাত্রিকালে অনেক নরনারীর প্রাণবধ করতঃ তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিত। আমাদিগের দেশস্থ খ্যাতনামা ভক্ত মহাত্মা "কমলাকান্ত" একবার এই মাঠে দস্যুকর্ত্তৃক আবদ্ধ হন। ঈশ্বরানুরাগী ভক্তের প্রাণবধ করে এ জগতে এমন কে আছে? কমলাকান্ত, দস্যুদিগকে মহাশক্তির নাম শুনাইয়া পরিত্রাণ পান। প্রাণ ভয়ে তিনি যে গানটী রচনা করিয়া দস্যু হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন, পাঠক মহাশয় দিগের জ্ঞাপনার্থ আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"শ্যামা মায়ের কেবল চরণ রাঙ্গা, তাও লয়েছেন ত্রিপুরারী,
শুনে হলেম সাহস ভাঙ্গা।
ভাই বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
দুঃখের সময় কেউ কোথা নয়, সার হলো "ওরগাঁয়ের ডাঙ্গা।"

যে সময় আমাদিগের এই গল্পটী রচিত হয়, সে সময় এই বিস্তীর্ণ প্রান্তরের অন্তঃপাতী একখানি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল। ইহার অভ্যন্তরে দুইটী লোক বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছে। একটী বৃদ্ধ, বয়স আন্দাজ ৫০ বা ৫৫ বৎসর হইবে। যদিও বৃদ্ধটী বয়োধিক কিন্তু ইহার অঙ্গসৌষ্টব প্রকৃত প্রস্তাবে বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায়। মস্তকের কেশরাশি প্রায় শুভ্রবর্ণ, এমন কি ভ্রূযুগলেরও দুই চারি গাছি চুল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। অর্দ্ধপক্ক গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাশি গণ্ডদেশ হইতে আকণ্ঠ এরূপ ব্যাপিত রহিয়াছে, যে সময়ে সময়ে হাস্য করিলে তাহার বহু বিস্তীর্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুদ্বারা ভগ্ন দন্তের কতক পরিমাণে লজ্জা নিবারণ হইয়া থাকে। চক্ষু দুটী ঈষৎ গোল ও ক্ষুদ্র, দেখিলে বোধ হয় যেন, ইহার অভ্যন্তরে দুষ্ট বুদ্ধির গূঢ় অভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। বাস্তবিকই ইহার বাহ্যিক আকৃতি যেন, পাপের দ্বিতীয় ছবি বা কদাচার ও নরহত্যার ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি। ব্যক্তিটী একখানি অতি শীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া একাগ্রমনে কতকগুলি অর্থ গণনা করিতেছে। সামান্য মুদ্রা একবার গণনায় শেষ হইতেছে না, বার বার গণিতেছে, "এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়,--এই এ-ক, দু-ই, তি-ন, চা-র, পাঁ-চ, ছ-য়,—উহুঁ-এ-ক, দু-ই, তি-ন, চা-র, পাঁ-চ, ছ-য়। মনে করিতেছিলেন, টাকা বার বার গণনা করিলে বৃদ্ধি হইবে, অন্ধ-বিশ্বাস—সে বিশ্বাস কার্য্যে সিদ্ধি হইল না, টাকা বার বার গণিয়া বাড়িল না; শেষ তাঁহার নিকটস্থ একটী সুন্দর কামিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সরলা! একি! গত সোমবার আমার বাক্সে ৮৲ টাকা ছিল, আজ ৬৲ টাকা কেন? অনুমান করি তুমি আমার বাক্স হইতে টাকা চুরি করিয়াছ। যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে বড়ই লজ্জার কথা; শুদ্ধ লজ্জা নহে, ঘৃণা—ঘৃণা!!"

সরলা বালিকা, বয়স আন্দাজ ১৩ কি ১৪; যৌবনে পদার্পণ মাত্র,

পাপ কি তাহা সরলা জানেনা, প্রতারণা কাহার নাম তাহাতে সরলা অনভিজ্ঞ। সরলা, "সরলা"। বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সরলা বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া রহিল—তাহার উচ্চ তাড়না বাক্যে সরলার চক্ষে জল আসিল, সে আপন অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছিল।

আমরা এই সময়ে পাঠক মহাশয়কে সরলার পরিচয় দিতে বলিলাম। সরলা কে বা কাহার কন্যা তাহা আমরা জানি না, কিন্তু অতি শৈশব কালাবধি সরলা এই কুটীরে প্রতিপালন হইয়া আসিতেছে। সরলার প্রতি-পালক ঐ বৃদ্ধ, সেইজন্য সরলা তাহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিত। এই কুটীরে বৃদ্ধ ব্যতীত অপর কেহ থাকিত না, এবং এই স্থানটী জন-সমাজের অতি প্রান্তর স্থান বলিয়া সরলা এ পর্য্যন্ত অপর কোন পুরুষ মানুষের মুখ দেখে নাই। সরলা জানিত এ পৃথিবীতে শুদ্ধ সে আছে, আর তাহার পিতা আছে, আর আকাশে চন্দ্র আছে, সূর্য্য আছে, নক্ষত্র আছে; তাহার কুটীরের কাছে বৃক্ষ আছে, লতা আছে, গুল্ম আছে, এতদ্ব্যতীত আর একটী উচ্চ স্তম্ভ আছে, যাহার মুখ দিয়া ধূম উদ্গারিত হয়, বাঁশী বাজে, লোকের কলরব হয়। যে দিন পর্য্যন্ত সরলা তাহার পিতার মুখে এই কলরবের কথা শ্রবণ করে, সেই দিন হইতে সে জানিত, যে এই পৃথিবীতে তাহাদিগের ছাড়া আরও অনেক নরনারী বাস করে, তাহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; সেইজন্য সরলা সেই উদ্গারিত ধূমের প্রতি কখন কখন চাহিয়া থাকিত, কখন বা চাহিয়া চাহিয়া হাস্য করিত, আবার কখন আপন মুখে কলের বাঁশীর ন্যায় শব্দ করিয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিত।

সরলার সহচরের মধ্যে তাহার কুটীরে একটী টিয়া পাখী ছিল, কুটীরদ্বারে তাহার পিতার প্রদত্ত একটী হরিণ-শাবক বাঁধা থাকিত। পিতার অবর্ত্তমানে সরলা তাহাদিগের সহিত কথা কহিত—নবীন অধরে প্রকৃতির অধর মিশা-ইয়া সরলা তাহাদিগকে চুম্বন করিত, কখন বা মৃগশাবকের অশ্রুপাত দেখিয়া সরলা তাহার অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছাইয়া দিত। স্বভাব, স্বভাবের সহিত খেলা করে, আমি দেখিতে বড় ভাল বাসি।

স্বভাবের সুন্দর ছবি যে দেখিতে ভালবাসে সেই রূপের মাধুর্য্য বুঝিতে পারে। রূপ, সুন্দরীর পারিপাট্যে নহে; রূপ, অলঙ্কার বা চারু বেশবিন্যাসে নহে; রূপ, অধর প্রান্তে পানের রাগ মিশাইয়া নহে; রূপ, অলক তিলকের অভ্যন্তরে নহে; রূপ, "স্বভাব"—প্রকৃতির সুন্দর ছবি।

মনুষ্য সেই রূপকে বিরূপ করে, প্রকৃতিকে বিকৃতি করিয়া সাজাইতে যায়, স্বভাব সৌন্দর্য্যে কালীর রেখা অঙ্কিত করে, সুতরাং দেশকাল ভেদে সে রূপের নিন্দা হইয়া পড়ে। পাঠক! তুমি যদি স্বভাব সৌন্দর্য্যে মনুষ্যের কারুকার্য্য দেখিতে ভাল বাস, যদি সুন্দরীর দিব্য নয়নে অঞ্জনের কাল রাগ দেখিতে তোমার ভাল লাগে, যদি পাকা চুলে কালিমা রং তোমার মনোনীত হয়, তবে তুমি চক্ষু বুজিয়া থাক, আমাদিগের নায়িকার সে সমস্ত কিছুই নাই। সরলার সুন্দর ললাটে সিন্দূর বিন্দু নাই—দিব্য বিলোল চক্ষে কজ্জলের রেখা নাই—চারু চিকুরে অলকের ছটা নাই। সরলা স্বভাব সুন্দরী, প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সরলা আপনি সাজিয়া আছে; সে জানে না কিরূপে বেশ বিন্যাস করিতে হয়—কিরূপে মৃণ্ময় পাত্রে খয়েরের টিপ্ গুলিয়া ললাটে পরিতে হয়, কিরূপে তাম্বুল চিবাইয়া অধর টানিয়া পানের রাগ দেখিতে হয়, সরলা সে সমস্ত কিছুই জানে না, অথচ সরলা সুন্দরী।

স্বভাব সৌন্দর্য্য কখন কুৎসিত হয় না, বা কুৎসিত হইলেও তাহার সেই কুৎসিত সৌন্দর্য্যে একটু মাধুর্য্য থাকে, তাহাই সুন্দর। সরলার সৌন্দর্য্যে সেরূপ কুৎসিত ভাব কিছুই ছিল না, অথচ পূর্ণ সৌন্দর্য্যের উপর স্বভাবের মাধুর্য্য ভাব ছিল, সুতরাং সরলা সৌন্দর্য্যের মাধুরী, স্বভাব আপন সৌন্দর্য্যে—আপন মাধুর্য্যে সরলাকে গড়িয়াছে, কে তাহাকে চক্ষু মেলিয়া না দেখিবে? পাঠক! একবার সরলাকে দৃষ্টি করুন, তাহার উন্নত ও কমনীয় শরীর, সুন্দর মুখশ্রী, বিলোল দৃষ্টি, লাবণ্য পরিপূর্ণ নব প্রস্ফুটিত গোলাপ বিনিন্দিত গায়ের রং, আলুলায়িত অথচ কুঞ্চিত কেশরাশি; ঐ দেখ, তাহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কোঁকড়াইয়া কোঁক্ড়াইয়া, ললাটের উপর সুন্দর ও উন্নত গ্রীবার চতুষ্পার্শে পড়িয়াছে, কখন বা বায়ু হিল্লোলে

নাচিয়া নাচিয়া, দুলিয়া দুলিয়া, সরলার সুন্দর গোলাপরঞ্জিত মুখখানি চুম্বন করিতেছে। সুন্দরী পাঠিকা! এই দেখিয়া তুমি তোমার পরিপাটী কবরীবন্ধন খুলিয়া ফেল, তোমার চারু চিকুরে স্বভাবের নিত্য খেলা খেলিতে দাও, বায়ুর দোলায় সুন্দর কেশগুচ্ছ দুলিতে দাও এবং সরলার বাম পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন কর, কুৎসিতা হইলেও আমাদিগের চক্ষে তুমি সুন্দরী।"

ইহাও বলি, সরলার একটী দোষ ছিল। সরলা লজ্জাহীনা, লজ্জা কি তাহা সরলা জানিত না কিন্তু এরূপ অবস্থায় সরলার প্রতি আমরা দোষারোপ করিতে পারি না। বালিকাগণ সমাজভুক্ত থাকিলে বা নরনারী পরিপূর্ণ পরিবারবর্গের ভিতুর থাকিলে, অল্প বয়সেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ বুঝিতে পারে, সুতরাং বয়োন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিয়া তাহার হৃদয়কে অধিকার করে, কিন্তু সরলা সমাজ পরিত্যক্তা বিজনবাসিনী, সেইজন্য লজ্জা কি তাহা সে জানিত না, সরলা লজ্জার মাথায় কঙ্কণ মারিয়া বসিয়াছিল, পুরুষ মানুষের সহিত স্ত্রীজাতির কি সম্বন্ধ সরলা সে ধার ধারিত না, সুতরাং সরলা বেহায়া।

সরলা আপন অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া বলিল, "বাবা! আমি ত তোমার টাকা লই নাই, লইবার ইচ্ছা ছিল বটে কিন্তু পাছে তুমি রাগ কর, সেই জন্য লইলাম না।"

বৃদ্ধ। তোমার টাকার প্রয়োজন?

"ক্ষুধা পাইলে তোমাকেই দিতাম, তুমি খাবার কিনিয়া দিতে?"

"আর কিছুই কি প্রয়োজন ছিল না?"

"টাকায় আর কি হয়? হাঁ বাবা! বলনা।"

বৃদ্ধ। হুম্।

কামিনী বৃদ্ধের গম্ভীর স্বর দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল—অনন্যমনে কুটীরের উপরিভাগে চাহিয়া চাহিয়া কি চিন্তা করিল, শেষ বলিল, "বাবা! তুমি আমাকে কেন কলবাড়ীতে যাইতে দেও না?—সেই সেখানে যেখানে ধোঁ উড়ে, বাঁশী বাজে? আমি সেখানে যাইলে পরিশ্রম করিয়া টাকা আনিতে পারি—তাহা হইলে তোমাকেও আর ভাবিতে হয় না।"

বৃদ্ধ প্রথমে একটু হাস্য করিল, কিন্তু সে হাসি তাহার অর্দ্ধপক্ক

গোঁপ ও শ্মশ্রুতে লুক্কায়িত হইল, সরলা তাহা দেখিতে পাইল না। পর-ক্ষণেই বৃদ্ধ যেন কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "সরলা! তুমি কি নির্ব্বোধ! তোমার কি এটা বিবেচনা নাই যে, আমি যদি এই বয়সে তোমাকে কলবাড়ীতে যাইতে দিতাম, তাহা হইলে হয়ত এতদিনে তুমি কাহার সহিত চলিয়া যাইতে, তাহা হইলে আমার উপায় কি হইত?—এই বৃদ্ধ বয়সে কে আমাকে খাওয়াইত? না—সরলা! আমার আর একটী ইচ্ছা আছে, তুমি যেমন সুন্দরী, আর একটু বয়স হইলে সেইরূপ অর্থও উপার্জ্জন করিতে পারিবে,—কিন্তু সেটী অন্য উপায়।"

সরলা তাহার পিতার এইরূপ বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে শূন্য নয়নে বৃদ্ধের প্রতি চাহিয়া রহিল, শেষ বলিল, "না বাবা! আমি কলবাড়ীতে যাইব।"

"চুপ্ চুপ্" বৃদ্ধ সক্রোধে উত্তর করিল, "আমি তোমার দ্বারা অনেক উপায়—"

এইরূপ অসম্পূর্ণ কথার শেষভাগে পর্ণশালার বহির্দ্বারে "গুম্ গুম্ গুম্—দরজা খুলিয়া দাও, পথিক—অতিথি।" এইরূপ উচ্চরব শুনা গেল।

এত রাত্রে অতিথ!—রাত্রি প্রায় ১১টা হইবে। বৃদ্ধ সঙ্কুচিত হইল, বলিল "সরলা! কে দেখ, কিন্তু একেবারে দরজা খুলিও না, প্রথমে আড়াল হইতে দেখিয়া, খুলিয়া দাও।" পুনশ্চ! গুম্ গুম্ গুম্—"আবার আঘাত সরলা! যাও যাও, শীঘ্র যাও।"

সরলা তাহাই করিল। কুটীর হইতে বাহিরে আসিয়া সরলা প্রাঙ্গনে দাঁড়াইল। রজনী অন্ধকার—ঘোর ঘনঘটায় অন্ধকার। সরলা দেখিল আকাশে মেঘ উঠিয়াছে, মেঘমালা বিস্তীর্ণ গগণপট ছাইয়া নক্ষত্র মণ্ডলী, আবৃত করিয়াছে, রজনী গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া নিস্তব্ধে, নিঃশব্দে গম্ভীর ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। বাতাস নাই, এক একবার একটু একটু শীতল বায়ু আসিয়া সরলার শরীর স্পর্শ করিল—অলক দুলাইয়া কেশ পাশ উড়াইল—এক একবার বিদ্যুৎপ্রভা আসিয়া সরলার মুখ খানি চুম্বন করিল, নারীর স্বভাব লজ্জা ও ভয়ে কাতর, বিদ্যুতাভায় সরলার

বিলোল চক্ষুপলক সভয়ে মুদিত হইল,--আবার খুলিল। সরলা প্রাঙ্গণ হইতে বলিল, "বাবা। মেঘ উঠিয়াছে।"

কুটীরাভ্যন্তর হইতে উত্তর নাই।

সরলা একটী প্রদীপ হস্তে বহির্দ্বারের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া দ্বারের আড়াল হইতে দেখিল, "একজন সুন্দর যুবাপুরুষ,—নূতনতর, সে আকৃতি সরলার কুটীরে নাই—বা সরলা সে আকৃতি কখন দেখে নাই, সেইজন্য সরলা সভয়ে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দৌড়িয়া পলায়ন করিল। দ্রুতগমনে সরলার হস্তস্থিত প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হইল,—সরলা প্রদীপটী প্রাঙ্গণে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কুটীরে প্রবেশ করিল।"

কুটীর অন্ধকার। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "প্রদীপ কোথায়?"

"উঠানে।"

বৃদ্ধ কুপিত হইয়া বলিল, "কল্পক্ষী। কল্পক্ষী!!"

এদিকে যুবক এই অবসরে প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল পরক্ষণেই কুটীরাভ্যন্তরে চকমকির শব্দ হইল, "ঠক্-ঠক্-ঠক্—কে তুমি?"

"পথিক।"

"ঠক্-ঠক্-ঠক্, এত রাত্রে পথিক? ঠক্-ঠক্-ঠক্।"

"পথ ভুলিয়া আসিয়াছি—বৈদ্যনাথে যাইব।"

"হুম্—বৈদ্যনাথ, বাবা বৈদ্যনাথ, ঠক্-ঠক-ঠক্, বাড়ী কোথায়? ঠক্-ঠক্—ঠক্।"

"প্রদীপ জ্বাল—পরে বলিব।"

"ঠক্-ঠক্-ঠক্—কল্পক্ষী, কল্পক্ষী, সরী কল্পক্ষী! ঠক্-ঠক্-ঠক্।"

প্রদীপ জ্বালা হইল, যুবক এই অবসরে কুটীরাভ্যন্তরে আসিয়া প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় স্তবক।

যৌবন-তুফান।

যুবা পথিক দেখিতে অতি সুন্দর, পরিপাটী সুশ্রী, বয়ক্রম আন্দাজ ২৫ কি ২৬ বৎসর হইবে, উন্নত কায়, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল—আজানুলম্বিত বাহু, যেন সাহসী বীরপুরুষ। ললাট প্রসারিত, কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দীর্ঘ ও জ্যোতিষ্মান, দেখিলে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগের চর্ম্ম ঈষৎ কুঞ্চিত ও তিন চারিটী উর্দ্ধরেখায় অঙ্কিত—চিন্তা শীলতার পরিচয়। পরিচ্ছদ যদিও সামান্য কিন্তু কোন অংশে দীনভাবাপন্ন নহে, হঠাৎ কোন সৎকুলোদ্ভব ধনবানের পুত্র বলিয়া অনুমান হয়। জাতিতে কি, জানিনা, যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন।

পথিক কুটীরে প্রবেশ মাত্রেই দেখিল, কুটীর খানি অতি জীর্ণ ও অভ্যন্তর অতি অপরিষ্কার। চারিদিকের দিগালে মাকড়সার জাল ও কোণে আরশুলার বাসা, এক পার্শ্বে একখানি খেজুরের চেটাই পড়িয়া আছে; অপর পার্শ্বে একটী মৃণ্ময় আধারে প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে; তাহার পার্শ্বে সামান্য দুই চারিটী ভোজ্য পাত্র, চকমকীর বাক্স, শোলা ও পাথর। অপর দিকে একখানি তক্তাপোষের উপর একটী সামান্য মলিন শয্যা। যুবক বলিল, "তোমাদিগের এই অবস্থায় অতিথি সৎকার প্রশংসনীয়। এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করিলে কৃতার্থ হইব এবং সেই জন্য, অর্থাৎ তোমাদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ আমি কিঞ্চিৎ অর্থ দিতেও প্রস্তুত আছি।"

অর্থের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ প্রথমতঃ পুলকিত হইল, বলিল, "আপত্তি কি?"

যুবক বলিল, "আমি পথভ্রান্ত, আমাকে বর্দ্ধমান যাইবার পথ দেখাইয়া দাও।"

"কেন, তুমি কি পথ চিন না? তুমি কি এই নিকটস্থ কোন গ্রামবাসী নহ।"

"না।"

"এই নিকটের গ্রাম সমূহে তোমার কি কোন পরিচিত লোক নাই।"

"না।"

"বাড়ী কোথায়?"

"কলিকাতার নিকটবর্ত্তী "শিবদহে।"

"যাইবে কোথায়? দেশ ভ্রমণে—তীর্থে তীর্থে. আপাততঃ বর্দ্ধমান, পরে বৈদ্যনাথ, পরে কাশী, গয়া, বৃন্দাবন প্রভৃতি।"

"তোমার সঙ্গে আর কে আছে?"

"কেহই নাই—একাকী।" যুবক প্রথমতঃ এইরূপ প্রশ্ন শুনিয়া ভীত হইল, পরে সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কেন?—তাহাতে তোমার কি?"

"না, তাই বলিতেছিলাম, আমরা দরিদ্র লোক, একজনের অধিক অতিথিসৎকারে কষ্ট হইবে।"

"কষ্টের প্রয়োজন নাই, এবং আমি এখানে থাকিবারও বাসনা করি না, অনুগ্রহ করিয়া একটু অগ্রসর করাইয়া দিলে যথেষ্ট হইবে. পরে আমি একাই চিনিয়া যাইব।"

"কিন্তু একাকী যাইতে আমি পরামর্শ দিই না, সম্মুখে "ওরগাঁয়ের ডাঙ্গা" সেখানে মানুষ মানুষকে খুন করে, সে দিবস আমার একটী পুত্র মারা গিয়াছে।" বলিবামাত্রই বৃদ্ধের চক্ষে জল আসিল।

"আমাকে বধ করে, এ জগতে এখনও সে জন্মগ্রহণ করে নাই।"

বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ ভ্রূ-ভঙ্গি করিল কিন্তু কোন উত্তর করিল না, মনের উত্তর মনেই রাখিল, শেষে বলিল, "রাত্রি অধিক—অনুমান ১১টা হইবে।"

যুবক তাহার হস্তস্থিত একটী "ব্যাগ" গৃহভূমে নামাইয়া একটী সোণার ঘড়ি বাহির করিল ও প্রদীপের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল রাত্রি ১১টা অতীত।

বৃদ্ধ এই অবসরে ঘড়িটীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল.—তাহার বিস্মিত

নয়ন—কুটীল চক্ষু—পাপ পরিপূর্ণ কলুষিত দৃষ্টি, সেই স্বর্ণ নির্ম্মিত সময়-যন্ত্রে পতিত হইল। বৃদ্ধ ভাবিল, ঘড়িটী আন্দাজ ১৫০৲ টাকার অধিক হইবে. কিন্তু প্রকাশ্যে কোন কথা বলিল না।"

এদিকে প্রকৃতি সুন্দরী কুটীরের প্রান্তভাগে অনন্যমনে দাঁড়াইয়াছিলেন, সে সুন্দরী সরলা। সরলার সরল দৃষ্টি, নিষ্পাপ ও পবিত্র ইচ্ছা, উলঙ্গ বেশে আসিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিল—সরলা নির্ল্লজ্যভাবে ও দ্রুত-পদে যুবকের সন্নিকট যাইয়া তাহার হস্তস্থিত স্বর্ণ যন্ত্রটী অনিমিষ লোচনে দেখিতে লাগিল। সরলা দেখিল ঘড়ির কাঁটা নড়িতেছে, যুবকের হস্তের নিকট কাণ পাতিয়া শুনিল "টিক্-টিক্-টিক্,—টিক্-টিক্-টিক্, সরলার কাণে মধুর বাদ্য বাজিল, সরলা প্রফুল্লবদনে যুবকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হাস্য করিল।

সরলার হাঁসি, সরলার বিলোল দৃষ্টি, যুবকের হৃদয়-যন্ত্রে গিয়া আঘাত করিল। যুবক-হৃদয় স্বভাবতই চঞ্চল ও তরল, সামান্য স্ত্রীলোকের পবিত্র দৃষ্টি ও মধুর হাসিতে ও সে তরলতা ভঙ্গ করে, সুস্থির সরোবর মৃদু বায়ু হিল্লোলে দুলিতে থাকে—যন্ত্রের শব্দ নিকটস্থ অপর যন্ত্রে গিয়া প্রতিঘাত করে, পথিক যুবার হৃদয়ে তাহাই ঘটিল। এ দোষ কাহার দিব? 'যৌবন-হৃদয়ের না নারী-দৃষ্টির?' লোকে স্ত্রীলোকের দৃষ্টিকে বিষময় বলে,—নারী জাতির সুন্দর বিলোল দৃষ্টির সহিত বিষাক্ত শরের উপমা দেয়; কিন্তু সরলার দৃষ্টিতে সে বিষ ভাব নাই, সে দৃষ্টিতে কুটীলতা নাই, অপবিত্রতা নাই পাপ নাই—অধর্ম্ম নাই, তবে সরলার দৃষ্টি বিষময় কেন? যৌবন হৃদয়ই বিষময়। যুবা পথিক এই দোষে দোষী।

মোট কথা, যুবকের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। যুবক মনে করিয়াছিলেন, সরলার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না, সেটী ঘটিল না। সরলা তাহার বিলোল দৃষ্টিতে, মৃদুমন্দ সুমধুর হাস্যে, নির্দ্দোষ ও পবিত্রভাবে যুবকের মন আকর্ষণ করিল। যুবক বলিল, "তবে আজ রাত্রে যাইব না, কাল প্রত্যুষে উঠিয়া যাত্রা করিব।

"বৃদ্ধ মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—তবে সেবা?"

"হাঁ, কি আছে ?"

"কিছুই না, আকাঁড়া চাউল, আর কাঁচা রম্ভা।"

"প্রয়োজন নাই—রন্ধন জানি না, কোনরূপ মিষ্টান্ন ?"

"দোকানে।"

যুবক আর কিছু বলিল না। তাহার গাত্রাবরণ হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বৃদ্ধের হস্তে দিল এবং বলিল, "এই লও—লইয়া আইস।"

বৃদ্ধ। না, আমার নিকট টাকা আছে, আমি আনিতেছি।

বৃদ্ধের শিষ্টাচারে যুবক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল কিন্তু অর্থ পুনর্গ্রহণ করিল না। বৃদ্ধ কুটীর হইতে বহির্গমন করিয়া মিষ্টান্ন আহরণে গমন করিল।

যুবকের অবসর উত্তম, এই অবসরে যুবক পুনশ্চ তাহার ঘড়ি খুলিয়া প্রদীপের নিকট ধরিল ; সরলাও আবার আসিল। যুবক বলিল, "তুমি কি ঘড়িটি লইতে ইচ্ছা কর ?"

সরলা হাঁসিয়া বলিল, "না কাজ নাই—খাইবে কি ?"

"ঘড়ি খায়না—তোমাদের খাবার দিতে হইবে না।"

"তবে বনে পলাইয়া যাইবে। আমার একটী বেজী ছিল, তাহাকে একদিন খাবার দি নাই—সে বনে চলিয়া গিয়াছে।"

যুবক বুঝিল সরলা সমাজের বিলাস প্রিয়তার কথা কিছুই জানে না। সেই জন্য যুবা পথিক আর কোন উত্তর করিল না কিন্তু এই সময় তাহার মন আরও চঞ্চল হইল। একাকী কুটীরে, আর কেহ নাই—শুদ্ধ যুবক ও যুবতী ; তাহে সরলা, পৃথিবীর নর নারীর কলুষিত ভাব কিছুই জানে না। এইটি বুঝিয়া যুবক গাত্রোত্থান করিল—সরলার নিকটে যাইয়া তাহার করদ্বয়ে আপন কর মিশাইয়া বলিল, "আমি যদি তোমার সুন্দর মুখখানি চুম্বন করিতে পাই, তাহা হইলে তোমাদের আতিথ্য স্বীকার করিব নচেৎ চলিয়া যাই।"

সরলা সে কথায় কোন উত্তর দিল না, যুবকের করদ্বয় মুক্ত করিয়া অদূরে দাঁড়াইল এবং আপন হস্তে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল।

যুবক লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমি কি তোমাকে কোনরূপে বিরক্ত করিলাম।"

"না—না, কিছু না।" এইরূপ বলিয়া সরলা তাহার মুখ হইতে হাত নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নিকট কি কিছু টাকা আছে ?"

যুবক বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন ?" তোমরা কি চুম্বনের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ কর ?"

সরলা এ কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না, মনে মনে যেন ইহার মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিল কিন্তু পারিল না, অবশেষে বলিল, "তোমার নিকট যদি কিছু টাকা থাকে, সে কথা বাবাকে বলিও না এবং আজ রাত্রে সতর্ক থাকিও, চুপ্—চুপ্, ঐ বাবা আসিতেছে!"

পরক্ষণেই কুটীর পার্শ্বে পদ শব্দ হইল বৃদ্ধ খাদ্য-দ্রব্য হস্তে কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

যুবক এই অবসরে আগন্তুক বৃদ্ধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল বৃদ্ধের বলিষ্ঠ শরীর! প্রথম কুটীর প্রবেশ সময়ে যুবক সে বিষয় কিছুই লক্ষ্য করে নাই, মনে করিয়াছিল, সামান্য ক্ষীণজিবী বৃদ্ধ লোক, পক্ক কেশ ও পক্ক শ্মশ্রু, সরল ও শ্রমজিবী ব্যতীত আর কিছুই নহে, কিন্তু এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া যুবকের ভয় হইল। যুবক দেখিল বৃদ্ধ বলবান ও দৃঢ়কায়, সর্ব্বাঙ্গে মোটা মোটা শীরার উচ্ছ্বাস। আজানুলম্বিত বাহু, কর ও পদপল্লব প্রসস্ত। মুখদ্বয়ে প্রাণিহিংসারূপ মহাপাপের চিহ্ন, অন্তরে দুষ্ট বুদ্ধি—পাপ কল্পনার বহির্বিকাশ। তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিবা মাত্রই যুবকের আত্মাপুরুষ উড়িয়া গেল—সর্ব্বশরীর ভয়ে রোমাঞ্চ হইল, হৃদয় গুরুবেগে আঘাত করিতে লাগিল। যুবক ভাবিল, "যদি এ সময় কোন উপায়ে পলায়ন করি, তাহা হইলে দুরাত্মা বৃদ্ধ কি আমার পশ্চাদগমন করিবে ?"

এ সময় কুটীরের বহির্দ্দেশে ঝড় ও বৃষ্টির ভয়ানক দৌরাত্ম্য। ঝড়ের ভীষণ গর্জ্জন বৃষ্টির বেগে মিসিয়া বৃদ্ধের ক্ষুদ্র কুটীরের ক্ষুদ্র বাতায়নে আসিয়া ঘন ঘন আঘাত করিতে লাগিল। আবদ্ধ কুটীরদ্বারে ও বাতায়নের

পার্শ্ব দিয়া ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীর বিদ্যুতালোক এক একবার আসিয়া কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিল! এ সময় যুবক, সরলা ও বৃদ্ধ, তিনজনেই কুটীরের অভ্যন্তরে। সরলার নিষ্পাপ ও সরলচিত্ত, প্রকৃতির পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত হইল, পাপমতি বৃদ্ধের হৃদয় বজ্র শব্দে ভীত ও সশঙ্কিত, যুবকের চিন্তা আত্মরক্ষায় আলোড়িত। যুবক ভাবিল, "দুর্ভাগ্য একাকী আইসে না; পলাইবার উপায়ানুসন্ধান করিতেছিলাম, হইল না।"

বৃদ্ধ তাহার হস্তস্থিত খাদ্য সামগ্রী যুবকের সম্মুখে দিয়া বলিল, "রাত্রি অধিক—আহারাদি করিয়া শয়ন কর।"

যুবা পথিক প্রথমতঃ বৃদ্ধের কথায় কোন উত্তর করিল না, প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, পরে বলিল, "আমার খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া যাও—পরে খাইব।"

বৃদ্ধ বলিল, "তুমি আমার এই কুটীর-শয্যায় শয়ন কর, আমি তোমারই নিকট কক্ষভূমে শয়ন করিব।"

যুবক বলিল, "না—তাহার প্রয়োজন নাই, যদি আমাকে এখানে থাকিতে হয়, একাকী থাকিব, এস্থলে আর কাহারও শয়ন করিবার আবশ্যক নাই।"

বৃদ্ধ এ সময় একবার সরলার মুখের প্রতি ক্রুদ্ধভাবে দৃষ্টি করিল, যুবক তাহা দেখিতে পাইল না। বৃদ্ধ পরক্ষণেই যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "যাহাতে তোমার কষ্ট না হয়, তাহাই আমার ইচ্ছা; আমি তোমার নিকট শুইতে ইচ্ছা করি না, পার্শ্বে আরও দুইখানি ক্ষুদ্র কুটীর আছে আমরা তাহাতে শয়ন করিব, তুমি একাকী এইখানে শয়ন কর।" এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধ সরলার হস্ত ধরিয়া কুটীরের বহির্ভাগে গমন করিল।"

পাঠক মহাশয় এ সময় যুবকের মনের চাঞ্চল্য সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। প্রাণ ভয়ে ভীত হয় না, এ জগতে এরূপ প্রাণী অতি বিরল। যুবা পথিক যদিও সাহসী ও বলিষ্ঠ, তথাচ আত্মরক্ষারূপ মহাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া যুবক এক একবার মনে মনে ভীত ও চিন্তিত

হইতে লাগিল, এবং এক একবার সাহসে ভর করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি কি কাপুরুষ? আমার শরীরে কি আর্য্যশোণিত বহমান নাই? সামান্য বৃদ্ধের বাক্যে আমি কাপুরুষের ন্যায় কুটীর হইতে পলায়ন করিব? না—কখনই না, দেখি দুরাত্মা দস্যু আমার কি করে—পাপাত্মা নরঘাতকের উচিত দণ্ড বিধান করা আমার ন্যায় যুবাপুরুষের অবশ্য কর্ত্তব্য।" এইরূপ চিন্তা করিয়া যুবক আপন কুটীর দ্বারের খিল আবদ্ধ করিল এবং গৃহের চতুষ্কোণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, ইহার এক পার্শ্বে এক গাছি বাঁশের যষ্টি রহিয়াছে—যষ্টিগাছি পুরাতন—বহুকাল তৈল সেবনে রক্তিম বর্ণ। যুবক সেই যষ্টিগাছি নিরীক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ সন্তোষলাভ করিল—কথঞ্চিৎ সাহস পাইল এবং পরক্ষণে আহারাদির পর কুটীরস্থিত শয্যায় শয়ন করিল।

এ সময় নিদ্রা কোথায়? ঘোর চিন্তা আসিয়া যুবকের হৃদয় অধিকার করিল। যুবক নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিল, বিপদ, প্রাণীহিংসা, আত্মরক্ষা, এই সমস্ত একে একে কখন ভয়, কখন মানব-চরিত্রে ঘৃণা, কখন বা আত্মরক্ষারূপ মানবের স্বাভাবিক প্রেম, যুবকের হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। অবশেষে যুবক দেখিল যেন তাহার নয়ন সম্মুখে একটী ভয়ানক তরঙ্গ-আলোড়িত অনন্ত সমুদ্র। যুবকের দৃষ্টি সমুদ্রের যতদূর গমন করিল, ততদূর দেখিল যেন তরঙ্গ তুফান ভীষণ গর্জ্জন করিয়া হুঙ্কার শব্দে ছুটিয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া যুবকের অন্তর কাঁপিল; সমুদ্রের কুল নাই, কিনারা নাই, অথচ সমুদ্র নাচিয়া নাচিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া, ঘোর ভীম গর্জ্জনে ফেনকমুখী হইয়া কোথায় চলিয়াছে তাহার অন্ত নাই—একের পর এক, তাহার পর এক, তাহার পর অনন্ত একে গিয়া মিশিতেছে। যুবক আরও দেখিল তরঙ্গ-তুফানে একখানি নৌকা, তাহাতে কাণ্ডারি নাই, হাল নাই, দাঁড় নাই, কিছুই নাই, নিরাশ্রয় কাণ্ডারি বিহীন তরী ডুবো ডুবো। যুবক সেই তরণীর দুর্দ্দশা দেখিয়া একবার ঊর্দ্ধে আকাশ পানে দৃষ্টি করিল, দেখিল সেখানেও কেহ নাই,—আকাশ ঘোর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন সুতরাং স্বর্গস্থ কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থই সেই বিপন্ন তরণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন না। তখন যুবক নয়ন মুদিত করিয়া চিন্তা করিল "ওখানি নৌকা নহে,

আমার "জীবন তরণী" যৌবনরূপ মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-তুফানে পড়িয়া জলমগ্ন হইতেছে। তখন যুবক আপনাকে নিন্দা করিল,—সরলার নয়নতৃপ্তকারী সৌন্দর্য্যকে নিন্দা করিল, যে সৌন্দর্য্য তাহার মানস-সরোবরকে এক সময়ে আলোড়িত করিয়াছিল, এবং যে সৌন্দর্য্যের প্রলোভনে পড়িয়া যুবক দস্যু-কুটীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন; যুবক ভাবিল, সেই সৌন্দর্য্য ভাল নয়।

যুবকের কথা এখানে এই পর্য্যন্ত শেষ করিলাম—এদিকে সরলা, যুবকের নিকট হইতে আসিয়া আপন কুটীরে শয়ন করিতে যাইল না, পিতা চলিয়া গেলে আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া, পিতার কুটীরে প্রবেশ করিল—দেখিল, পিতা শয্যার নিকট বসিয়া অবনত মস্তকে কি চিন্তা করিতেছেন। সরলা আস্তে আস্তে পিতার পশ্চাৎদিকে গিয়া দাড়াইল—চিন্তা-মগ্ন পিতার সংজ্ঞা নাই! বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিঃশব্দে অবস্থিতি করিয়া শেষ আপনা আপনই অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিল, "আন্দাজ ১৫০৲ টাকা হইবে, তাহাই বা কম্ কি?"

"বাবা! ঘড়িটী যত মূল্যেরই হউক না কেন, সে বিষয় তোমার আলোচনা করিবার প্রয়োজন?"

বৃদ্ধ শ্রবণমাত্রেই বিস্মিত হইল—অকস্মাৎ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, "সরলা!"

এ সময় সরলা অতি মৃদুস্বরে বলিল, "বাবা! তুমি কি ঐ পথিকের কোন অনিষ্ট করিবে?—কিন্তু আমি থাকিতে পারিবে না।"

শ্রবণমাত্রেই বৃদ্ধের মুখখানি নৈশ অন্ধকারের ন্যায় স্তম্ভিত ও গম্ভীর হইল; বৃদ্ধ ক্রোধান্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "তুমি কিরূপে জানিলে?" কিন্তু পরক্ষণেই আবার ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভাবিল অপর কুটীর হইতে যুবক শুনিতে পাইবে, ইহা মনে করিয়া বৃদ্ধ আস্তে আস্তে অনুচ্চস্বরে বলিতে লাগিল, "স্পর্দ্ধা, স্পর্দ্ধা, আমার উপর কর্তৃত্ব!!—না, না, যাও—সরলা শয়ন কর গিয়া—রাত্রি অধিক।"

"না, বাবা! আমি শয়ন করিব না, যতক্ষণ না প্রভাত হয়, ততক্ষণ

আমি তোমার নিকট হইতে উঠিব না।" এইরূপ বলিয়া সরলা সেই গৃহভূমে স্বইচ্ছায় উপবেশন করিল।

বৃদ্ধ আরও ক্রুদ্ধ হইল, এবারে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। বৃদ্ধ বিকট দৃষ্টি করিয়া সরলার প্রতি চাহিল, "তবে এখনই ইহার প্রতিফল দিব।" এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধ হস্তোত্তোলন করিয়া সরলাকে মারিতে গেল।

সরলা বলিল, "বাবা! তুমি যদি আমাকে স্পর্শ কর তাহা হইলে এখনই আমি চীৎকার করিয়া ঐ ভদ্রলোককে জাগাইয়া দিব ও তাহাকে সকল কথা—"

বৃদ্ধের পুনশ্চ অনুচ্চ কণ্ঠস্বর, কিন্তু ক্রোধমূর্ত্তি! বৃদ্ধ বলিল, "সকল কথা—কি—কি ?"

সরলা এবারে তাহার পিতার বাক্যে আর কোন উত্তর করিল না, আস্তে আস্তে তাহার কাণের কাছে আসিয়া বলিল, "বাবা! তুমি কি উহাকে খুন করিবে ?"

শ্রবণমাত্রেই কুটীর-স্বামী স্তম্ভিত হইল, কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে চক্ষু মুদিত করিয়া কি চিন্তা করিল ও বলিল, "সরলা! আমাদিগের অবস্থা অতি হীন, এমন কি এক এক দিন আমাকে উপবাসও থাকিতে হয়।"

"তোমাকে নহে, যেদিন তোমার অকুলান হয়, সেদিন আমিই উপবাস করি, আমার পেট জ্বালা করে।"

"দূর কম্বক্তি! দূর মিথ্যাবাদি!" এইরূপ তিরস্কার করিয়া বৃদ্ধ সরলাকে শয়ন করিবার আজ্ঞা করিল ও তাহার কাণের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "আমি উহার কোন ক্ষতি করিব না, আমি কি উহাকে খুন করিয়া আপনি ফাঁসি যাইব ?"

"সত্য বাবা! তুমি ত বলিয়া থাক যে, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, সেদিন তোমাদেরই কোন লোকের ফাঁসি হইয়াছিল, তাহাও তুমি আমাকে বলিয়াছ।" এইরূপ বলিয়া সরলা তাহার পিতার কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল ও আপন মনে কি চিন্তা করিতে করিতে কুটীর হইতে বহির্গমন করিল।

এই সময় কুটীর-স্বামী অবনত মুখে মস্তকে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হতভাগিনী সরলা যদি কুটীরে যাইয়া নিদ্রা যাইত, তাহা হইলে এতক্ষণ আমি কর্ম্ম রফা করিতে পারিতাম। উত্তম সদ্যুক্তি আছে—উহাকে এ অঞ্চলে কেহ চিনে না, আমি যদি উহাকে মারিয়া "ওরডাঙ্গার" দক্ষিণ দিকের ডোবায় ফেলিয়া দি, তাহা হইলে কেহই জানিতে পারিবে না। ডোবা গভীর—অতল স্পর্শ! এমন কি লাশ পচিলেও দুর্গন্ধ বাহির হইবে না; দ্বিতীয়তঃ নিকটের গ্রামে যদি উহার বাড়ী হইত, তাহা হইলে অবশ্যই তিন চারি দিনের পর পথিক বাড়ী না ফিরিলে, উহার সন্ধান পড়িত কিন্তু তাহাও ঘটিবার আশঙ্কা নাই, যেহেতু এখানে উহার বাড়ী বা কোন আত্মকুটুম্ব নাই। আর যদিও লোকে জানিতে পারে তাহা হইলে কেহ উহাকে চিনিতে পারিবে না, কে ত কে,—কেহই চিনে না; বাড়ী কোথায় তাহারও উদ্দেশ নাই, তবে ডুবে মরিয়াছে ইহাই সিদ্ধান্ত করিবে। সেইজন্যই ত ইহার নিকট সকল কথা লইলাম।" এই সময় বৃদ্ধের মুখ প্রফুল্ল হইল, বৃদ্ধ আপনাপনি বলিল, "হুম্ লোকটী বলিল, আমাকে পথ চিনাইয়া দাও আমি কিছু টাকা দিতেছি, কিন্তু সামান্য দুই চারি টাকার জন্য "রামা ময়রা" পরিশ্রম করে না,—উপযুক্ত পরিশ্রম করিব এবং উপযুক্ত অর্থও গ্রহণ করিব।"

এইরূপ আপনা আপনি বলিয়া বৃদ্ধ কক্ষভূমে দণ্ডায়মান হইল এবং তাহার কুটীরের ক্ষুদ্র বাতায়ন হইতে হাত বাড়াইয়া দেখিল এখনও বৃষ্টি পড়িতেছে—এখনও অন্ধকার; কিন্তু চারিদিক্ নিস্তব্ধ—আর ঝড়ের দৌরাত্ম্য নাই, রাত্রি নিঝুম, নীরব ও শব্দশূন্য। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে তাহার শয্যার পার্শ্ব হইতে একগাছি মোটা লৌহদণ্ড বাহির করিয়া হস্তে করিল ও অতি সতর্কতার সহিত কুটীর-দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহির হইল,—শব্দ হইল না। দেখিল আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন, সেইজন্য রাত্রিও অন্ধকার। বৃদ্ধ মনে করিল, ভোলা সর্দ্দারকে আসিতে বলিয়াছিলাম, যদি আসিত উত্তমই হইত,—না হয়, একা একাই কাজ সারিব। এইরূপ স্থির করিয়া বৃদ্ধ নিঃশব্দে যুবকের কুটীর-বাতায়নে গিয়া কাণ পাতিল। "বিরক্তি!" যুবা এখনও নিদ্রা

যায় নাই, কুটীরের অভ্যন্তরে চর্ম্ম-পাদুকার শব্দ হইতেছে। বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া চক্ষু সন্নিবেশিত করিল, প্রদীপ জ্বলিতেছে—যুবা কক্ষভূমে পাইচারি করিতেছে। দস্যু ইহা লক্ষ্য করিয়া, শূন্য হৃদয়ে পুনশ্চ নিঃশব্দে তাহার কুটীরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

ইত্যবসরে যুবক পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে অন্য কক্ষে পিতা কন্যার যে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল তাহা আর নাই, দস্যু-কুটীর নিস্তব্ধ, নীরব, রজনীও সেই সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। এ সময় বৃষ্টিরও নিঃশব্দ পতন। যুবক ভাবিল, "আকাশ ধরিয়াছে কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, যাহা হউক, কুটীর পরিত্যাগ করিলে এ রাত্রে নিস্তার পাইব—পথভ্রান্ত হইলে, অন্য পথে পড়িয়া প্রভাতে পথ চিনিয়া লইব।" এইটী স্থির করিয়া যুবক তাহার কুটীর-দ্বার উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দ্বার খুলিল না, আবদ্ধ! বহির্দ্বারে চাবি বন্ধ! যুবক নিরাশ হইল, চিন্তিত হইল, মনে মনে ভীত হইল, ভাবিল, অন্য উপায় দেখি, কিন্তু তাহাও নাই; কুটীরের যে ক্ষুদ্র বাতায়ন ছিল, তন্মধ্যে আপন শরীর প্রবেশ করিবে না, বাতায়ন ভগ্ন করিলে শব্দ হইবে এবং তাহাও সহজ ব্যাপার নহে। যুবক এইরূপ নিরাশ হইয়া ক্ষণিক কক্ষভূমে দণ্ডায়মান হইল। ক্ষণিক ভয়, ক্ষণিক সাহস, ক্ষণিক আত্মরক্ষার ইচ্ছা আসিয়া তাহার হৃদয়কে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিল, কিন্তু ভয়ের অংশই অধিক। যুবক ইতিপূর্ব্বে যে, দস্যু-কুটীরের নিস্তব্ধতা দেখিয়া পলায়ন মানসে মনে মনে আশ্বাসিত হইতেছিলেন—আত্ম-রক্ষার সদুপায় চিন্তা করিয়া প্রফুল্লতা লাভ করিতেছিলেন, এক্ষণে যতই কালবিলম্ব হইতে লাগিল, ততই সেই নিস্তব্ধতা আসিয়া তাহার হৃদয়কে আশঙ্কায় ও অধৈর্য্যতায় উৎপীড়িত করিতে লাগিল, যুবক ততই সভয়ে এক এক বার তাহার কুটীরের আবদ্ধ দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভয়, সতর্কতা উদ্দীপন করে, কর্ণকুহরের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। সুতরাং লঘুশব্দে যুবক সতর্ক হইতে লাগিলেন, শরীর ও মন চমকিত হইতে লাগিল, কর্ণ উৎকর্ণ হইতে লাগিল, এ সময় যুবকের পক্ষে লঘু শব্দও বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ানক!

এইরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ যুবকের কুটীর-দ্বারে কাহার পদ শব্দ হইল, পায়ের খুস্ খুস্ ধ্বনি! শ্রবণমাত্রেই যুবকের হৃদয় কাঁপিল, ধমনী গুরুবেগে আঘাত করিতে লাগিল, শোণিত স্রোত অধিকতর বেগে ধাবমান হইল, লোমকূপ জাগিয়া উঠিয়া শরীরকে লোমাঞ্চ করিল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। যুবক কুটীরস্থ যষ্টিগাছি হস্তে করিয়া ইদানীন্তন আর্য্য-সাহসের পরিচয় দিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, যুবক দেখিল, তাহার কুটীর দ্বারে একজন রমণী মূর্ত্তি, সে মূর্ত্তি "সরলা।"

যুবক বলিল, "কে?"

"আমি—চুপ্।" এইরূপ বলিয়া সরলা তাহার সুন্দর ওষ্ঠদ্বয়ে একটী অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া নিঃশব্দের ইঙ্গিত করিল এবং যুবকের গাত্র স্পর্শ করিয়া তাহার কাণে কাণে বলিল, "বাবা, তোমাকে খুন করিবে, এই কুটীরের পশ্চাৎদিকে দুইজন লোক দাঁড়াইয়া আছে।"

যুবক বলিল, "উপায়?"

"পলায়ন কর,—ঐদিক্ দিয়া, ঐ দিক্ দিয়া।" এইরূপ বলিয়া সরলা পথিকের বাহু ধরিয়া পথ দেখাইয়া দিল।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "সদর দ্বার আবদ্ধ?"

"না—আবদ্ধ ছিল, খুলিয়া রাখিয়াছি, পলাও পলাও কিন্তু এ কথা কাহাকেও বলিও না, আমার বাবা হয়, শুনিলে তাহাকে পুলিষে ধরিবে।"

"কিন্তু তুমি সাহায্য করিয়াছ জানিলে, তোমার বাবা, তোমাকে মারিবে। যদি কোনরূপ অত্যাচার দেখ, তুমিও পলাইও, বর্দ্ধমানে আমার সাক্ষাৎ পাইবে—দামোদর নদীর বাঁধের উপর দিয়া আমার পথ।" এইরূপ বলিয়া যুবক তাহার ব্যাগ হস্তে লইয়া গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও অন্ধকার মাথায় করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই কুটীর-স্বামী ও তাহার সহিত আর একজন দস্যু, দেখিতে দীর্ঘকায়, কাল ও দুর্ম্মুখ মূর্ত্তি, যুবকের কুটীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ দেখিল কুটীরে কেহই নাই—শীকার পলাইয়াছে, আর সরলা যুবকের শয্যায় বসিয়া হাস্য করিতেছে।

দেখিবামাত্রই বৃদ্ধ ক্রোধান্ধ হইয়া সরলাকে উচ্চৈঃস্বরে গালি দিল, বলিল, "এ কায তোর? কপ্বক্তি, সর্ব্বনাশি! বল্ পথিক কোথায়?"

"পলাইয়াছে, আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তুমি তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না।"

"হুম! তাহাতে তোর্ কি?" এইরূপ বলিয়া বৃদ্ধ সরলাকে সক্রোধে ও সজোরে আঘাত করিল। সরলা আঘাত মাত্রেই মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

দস্যুদ্বয় ঐ সময় সরলার অবস্থায় অমনোযোগী হইয়া শশব্যস্তে কুটীর হইতে বহির্গত হইল ও উর্দ্ধগমনে পথিকের পশ্চাদানুসন্ধানে গমন করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না।

তৃতীয় স্তবক।

রত্ন-লাভ।

স্থান, বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী দামোদর নদীর বাঁধ। সময় প্রভাত, সূর্য্যোদয়োন্মুখ পূর্ব্বাকাশে কে যেন একখানি স্বর্ণ থালের ভিতর দিয়া মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছে। পাঠক! সে হাসি দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু সে হাসি যিনি হাসিতেছেন তাঁহাকে দেখেন নাই, শুনিয়াছি এ জগতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, সেই জন্য লোকে সেই হাসিকে সূর্য্যের হাসি বলিয়া থাকে। কেহ বা বিপরীত বলিলে সে কথার প্রতিবাদ করিতে যায়। যাঁহারা বর্হিচক্ষে দেখেন তাহারাই সূর্য্যের হাসি বলিয়া থাকেন, কিন্তু সে দেখায় আমোদ পান না। এক হাসি নিত্য হাসিলে পুরাতন হইয়া যায়, সুতরাং নিত্য আনন্দকারী নহে। কিন্তু যাঁহারা অন্তর-দৃষ্টিতে সেই হাসি দৃষ্টি করেন তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা নিত্য নূতন, নিত্য প্রফুল্লজনক, নিত্য নয়ন তৃপ্তকর, তাঁহারা জড় জগতের সৌন্দর্য্য তুচ্ছ করিয়া ইহার আভ্যন্তরিক এক সুন্দর পুরুষের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া যান, তাঁহার হাসিতেই সর্ব্বদা আপনি

হাসিতে থাকেন। আমি দরিদ্র গ্রন্থকার, অন্তর-দৃষ্টি নাই সেই জন্য সে সৌন্দর্য্য বা সে হাসি বর্ণন করিতে পারিলাম না।

দ্বিতীয়তঃ আমরা যে স্থানের উপলক্ষ করিয়া পাঠক মহাশয়কে নিবেদন করিতেছি, সে সময় সে স্থানে কাক ছিল না, কোকিল ছিল না, শুদ্ধমাত্র দামোদরের অনন্ত স্রোত ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে সাগর সদনে চলিয়াছে; একতানে গাইতে গাইতে মধুর স্বরে চলিয়াছে। আনন্দে, উল্লাসে শরীর দুলাইয়া দুলাইয়া চলিয়াছে। উদয়োন্মুখ সূর্য্যকিরণ বক্ষে ধারণ করিয়া চলিয়াছে। সেই জন্য বেগবতী স্রোতের শব্দ ব্যতীত এরূপ সময়ে আর কিছুই ছিল না, সুতরাং প্রভাতকালীন কাক, কোকিল, বক, চিল, কিছুই ডাকিল না। আমার বিবেচনায় এইরূপ বিহঙ্গকণ্ঠশূন্য প্রভাত আর দুই চারিদিন হইলে আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র গ্রন্থকারের প্রভাত বর্ণন একেবারে উঠিয়া যাইত। এমন কি যে একটু প্রভাত সমীরণ ছিল, তাহাও পরিবর্ত্তিত। আমরা পূর্ব্ব রাত্রে ঝড়ের কথা বলিয়াছি, সেই জন্য প্রভাত সমীরণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহারা বর্ষাকালীন রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, প্রভাত সমীরণ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ সময়ের প্রভাত সমীরণ অনুভব করিতে পারিবেন। সমীরণ অপেক্ষাকৃত সিক্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পথে কর্দ্দম, মধ্যে মধ্যে বৃষ্টির জল এখানে সেখানে গতিরোধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁধের উপরিস্থিত সারবন্ত কর্দ্দমে পদার্পণ করিলে, বাঁধ, পথিককে তাহার কোমল শয্যায় আলিঙ্গন করিবার জন্য চেষ্টা পাইয়া থাকে। এইরূপ সময়ে এবং এইরূপ পথে একজন যুবা পুরুষ বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী দামোদর নদীর বাঁধের উপর দিয়া চলিয়াছেন; সঙ্গে কেহই নাই, শুদ্ধমাত্র একটী ভ্রমণকারীর ব্যাগ। পাঠক মহাশয় ইহাকে চিনিবেন, ইনি সেই পূর্ব্বরাত্রের পলাতক আসামী। যুবক পদ চালনা করিতেছেন ও আপনা আপনি বলিতেছেন, "পথের কষ্ট, কষ্ট নহে; প্রাণ রক্ষা পাইলাম ইহাই যথেষ্ট। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নাম ধন্য হউক—আমি নিষ্কৃতি পাইলাম।"

পথিক এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপন মনে চলিয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার পশ্চাৎ হইতে যেন রমণীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল। শ্রবণ মাত্রেই পথিক পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পুনশ্চ পদ চালনা করিলেন, কিয়ৎক্ষণের পর অকস্মাৎ এক রমণী মূর্ত্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, পথিক যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন, বলিলেন, "কেও ?"

"আমি, আমিও পলায়ন করিয়া তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি! বাড়ী ফিরিব না, বাবার কাছে আর যাইব না, কিন্তু নিরাশ্রয়, মাথা রাখিবার স্থান নাই, বল কি উপায় ?—কোথায় যাইব ?"

"কি পরিতাপ! কেন, তাহারা কি তোমাকে মারিয়াছে ?"

"হাঁ মারিয়াছে, আমাকে ঠেলিয়া দিয়াছে, আমি ভূমে পড়িয়া ঘুমাইয়া ছিলাম, পরে উঠিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি, বাবা দেখিতে পায় নাই এখন উপায় ?"

"তার পর ?"

"তার পর, শুদ্ধ মারে নাই—অনেক কটুকথা বলিয়াছে, সে কথা তোমাকে বলিব না। এক্ষণে আমি একাকী, নিরাশ্রয়, বল কোথায় যাইব ?" এইরূপ বলিবামাত্রই সরলার চক্ষে জল আসিল। সরলা শোক ও দুঃখে কাতর হইয়া আপন করদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিল।

সরলার দুঃখ দেখিয়া যুবকের দয়া হইল। যুবক স্বভাবতই পরের দুঃখে কাতর। যুবক বলিল, "সরলা! তুমি যখন আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছ, তখন আমি এরূপ অকৃতজ্ঞ নহি যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিব, আজ হইতে তুমি আমার হইলে।" এইরূপ বলিয়া যুবক তাহার হস্তস্থিত ব্যাগটী খুলিয়া সরলার হস্তে কতকগুলি স্বর্ণ মুদ্রা দিল ও বলিল, "এই লও, ইহাতে তোমার বাসা ভাড়া, খাই খরচ, বিশ্রাম স্থান সমস্তই হইবে। আপাততঃ ইহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান দেখিয়া তাহাতে অবস্থিতি কর এবং কাল এইরূপ সময়ে ঠিক্ এই স্থানে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

সরলা যুবকের প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলি হাত পাতিয়া লইল, কিন্তু সে

গুলি লইয়া কিরূপে কার্য্যসমাধা করিবে তাহা সরলা স্থির করিতে পারিল না, সেইজন্য অনিমিষলোচনে যুবকের প্রতি চাহিয়া রহিল।

যুবক বুঝিল, সরলা সংসারের কথা কিছুই জানে না। সরলার স্বতন্ত্র ভাব যুবকের চিত্ত প্রফুল্ল করিল, তাহার সুন্দর অথচ পবিত্র মুখখানি যুবকের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল, যুবক বলিল, "সরলা! তুমি এখনও বালিকা—পৃথিবীতে প্রবেশ কর নাই, কিন্তু এখানে থাকিলে, তোমাকে অনেক প্রলোভনে পড়িতে হইবে—অনেক পাপ আসিয়া তোমার হৃদয়কে কলুষিত করিতে চাহিবে! সাবধান, কাহারও প্রলোভনে ভুলিও না—দুষ্ট লোকের পরামর্শে যাইও না—উত্তম পথে থাকিও।"

সরলা সে কথার মর্ম্ম কিছুই বুঝিল না, বলিল, "হাঁ, এ পথে বড় কাদা, এই দেখ আমার পায়ে কাদা লাগিয়াছে।"

যুবক তাহার এরূপ বাক্যের কোন উত্তর করিল না, বলিল, "এখানে কি তোমার কোন বন্ধুবান্ধব নাই, যিনি তোমার বাসা দেখিয়া দিতে পারেন?"

সরলা বলিল, "বন্ধু কে—কাহাকে বলে?"

"তোমার কি এখানে কেহ আপনার লোক নাই?"

"না, অনেক দিন হইল আমার মা মরিয়াছেন—বাবা বাড়ীতে, আমি তাঁহার কাছে যাইব না।"

"তবে কি তুমি নিজে বাসার অনুসন্ধান করিতে পারিবে?"

"কোথায় যাইব তাহা চিনি না, তোমার কাছ হইতে যাইলে বাবা ধরিয়া লইবে।"

যুবক বলিল, "তবে আইস, আমি তোমার বাসা দেখিয়া দিতেছি কিন্তু আজ আর আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, কাল সন্ধ্যার পর ঠিক্ এই সময়, এই স্থানে সাক্ষাৎ করিব। আজ তুমি পরিশ্রান্ত—একাকিনী বিশ্রাম করিও।"

"না তুমি কাছে থাকিলে আমি ভাল থাকিব।"

এইরূপ কথোপকথন সময়ে তাহাদিগের উভয়কে প্রকাশ্যপথে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া, পথের লোক দুই একজন করিয়া তাহাদিগের সমীপে

উপস্থিত হইতে লাগিল। যুবক তদ্দর্শনে সরলাকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ গ্রামের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল এবং সরলার বাসা নিরূপণ করিয়া দিয়া যুবক সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

পরদিন ঠিক্ সন্ধ্যার পর যুবক সেই সময় ও সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোন দূষ্যভাবে সরলার সহিত সাক্ষাৎ করা যুবকের অভিপ্রায় নহে। যুবক সরলার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ—সরলা পূর্ব্বরাত্রে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, এই প্রত্যুপকার পাশে বদ্ধ হইয়া যুবক এইরূপ স্থলে ও এইরূপ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠক মহাশয় ইহার বিপরীত বলিবেন, বলিবেন যুবক যুবতীর নির্জ্জন সাক্ষাৎ অতি দূষণীয়, ইহার অভ্যন্তরে পাপের কলুষিতভাব লুক্কাইয়া আছে, বিশেষ সরলার বয়স ১৪, যুবকের ২৫; কিন্তু যুবক আমাদিগের অনেক দিনের পরিচিত আমরা বাল্যকাল হইতে দুইজনে একত্রে থাকিতাম। সেইজন্য যুবকের চরিত্র আমি বিশেষ অবগত আছি, যদিও সময়ে সময়ে কোন কামিনীর মুখশ্রী দেখিলে, কালধর্ম্মদোষে যুবকের মন চঞ্চল হইত—যুবক আপনা আপনি অস্থির হইতেন কিন্তু সে অস্থিরতা অতি অল্পক্ষণ; যুবক সেইজন্য অনুতাপ করিতেন, আপন দুর্ব্বলতার জন্য মনে মনে যারপরনাই দুঃখিত হইতেন এবং ভবিষ্যতে সেই বিষয় সতর্ক থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রজীবন উত্তীর্ণ নবীন যুবা পুরুষ কতকগুলি সামাজিক সুনিয়মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন ও তদনুযায়ীক কার্য্য করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন। সামাজিক সুনিয়ম ও জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যাহা ন্যায়ানুগত ও সত্য বলিয়া যুবকের হৃদয়ঙ্গম হইত, যুবক তাহাকেই “ধর্ম্ম” বলিয়া প্রতিপালন করিতেন এবং তাহাই পালন করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। মোট কথা, স্ত্রীজাতির প্রণয়াভিলাষী যুবক নহেন, বরং স্ত্রীজাতির প্রলোভিত মুখশ্রীকে যুবক সময়ে সময়ে নিন্দা করিতেন। যদিও যুবক কবি, বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রিয়কর্ম্ম ছিল, সুতরাং রমণীর কমনীয় সৌন্দর্য্য কখন কখন কবিতায় আবৃত্তি করিয়া তিনি সে রূপের প্রশংসা করিতেন, কিন্তু হৃদয়ে স্ত্রীসৌন্দর্য্যে যুবকের বীতস্পৃহা ছিল।

আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, যুবক চিন্তাশীল এক্ষণে বলিলাম "কবি"। স্বভাবসিদ্ধ কবি ও গায়ক। যুবক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আপন কবিতায় আবৃত্তি করিয়া এবং আপন কণ্ঠে মিলাইয়া গান করিতে ভাল বাসিতেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যুবকের চিত্তরঞ্জক ও নয়ন-তৃপ্তকর ছিল, সেইজন্য প্রকৃতির শোভা দেখিয়া যুবক কখন কখন উল্লাসিত হইতেন, কখন বা নির্জ্জনে উপবনে উপস্থিত হইয়া কোন সুন্দর পুষ্পবৃক্ষের নিকটে দাঁড়াইতেন এবং সুন্দর ফুল তুলিয়া, তাহার সৌন্দর্য্য কবিতায় আবৃত্তি করিয়া আপনা আপনিই বিমোহিত হইতেন ও তাহাকে কত কি বলিতেন; আবার কখন বা বনরাজির মধ্যে গিয়া বনবিহারী-তরুলতাকে সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের প্রেমের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, হয়ত তাহাদিগের আলিঙ্গন বর্দ্ধন করিয়া দিতেন। কখন ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া আকাশে নক্ষত্র মণ্ডলীর শোভা দেখিয়া বিমোহিত হইতেন, চন্দ্র সূর্য্যের সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয়ের ও নয়নের তৃপ্তিভাজন হইত। অতএব এরূপ সময়ে ও এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া যুবকের মন যে বিমোহিত হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? যুবক দেখিলেন, তাহার পার্শ্বে—পদতলের নিম্নদেশে, স্রোতবাহিনী দামোদর ঝর্ ঝর্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, মস্তকের উপর জ্যোৎস্নালোক—পূর্ণচন্দ্রের উদয়। জ্যোৎস্নালোক স্রোতবক্ষে পতিত হইয়া ঝিক্ মিক্ করিতেছে, আকাশের হাসি, মর্ত্ত্যের হাসির সহিত মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব সুন্দর ভাব ধারণ করিয়াছে। যুবক অকস্মাৎ দেখিলেন স্রোতবক্ষে চন্দ্রমার আর সে শোভা নাই—স্রোতবাহিনী প্রবাহিনীর মলিন বদন। যুবক উপরে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন—চন্দ্রমার নিম্নদেশে একখানি কাল মেঘ আসিয়া ধীরে ধীরে গমন করিতেছে—এই সময় যুবক মেঘকে উল্লেখ করিয়া একটী গান ধরিলেন। গানটী এই—

দাঁড়াও দাঁড়াও ওহে ঘন। *
বল এত দ্রুত কোথা করিছ গমন?

---

* ঝিঁঝিট সুরে কাওয়ালির তালের সঙ্গে গাওয়া যাইবে।

কাঁদাইয়া তটিনীরে, আঁধারিয়া ধরণীরে
যাও কি ভেটিতে তুমি নিজ প্রিয়জন?
তোমার মত হে যম, কাঁদাইয়া পরিজন,
মানব জীবন কোথা যায় একদিন—
তারাও সেথায় যায়, তুমি কি যাও তথায়,
দেখাও দেখাও তবে কেমন সে জন।

গীতটী সম্পূর্ণ হইয়াছে মাত্র, এমন সময় অকস্মাৎ সরলা আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবক অনন্যমনে ছিলেন, হঠাৎ সম্মুখে কামিনী-মূর্ত্তি দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

"আমি—সরলা।"

"তোমার নাম কি সরলা?"

"হাঁ।"

"পিতার নাম?—সেই দস্যু, দুরাত্মা পিতার নাম?"

"রাম মদক?"

"উনিই কি তোমার পিতা—না আর কেহ?"

"না—উনিই আমার মা, বাপ, সকলই?"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা উভয়ে পার্শ্বস্থ একখানি শিলাপটের উপর উপবেশন করিলেন। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তোমার পিতা যে আমাকে খুন করিবার মনস্থ করিয়াছিল, তাহা তুমি পূর্ব্ব হইতে কিরূপে জানিতে পারিয়াছিলে? তোমার পিতা কি ঐরূপ খুন করিয়া থাকে?"

"না—কখনই নহে। তবে আমার বাবার অবস্থা অতিশয় মন্দ, সেইজন্যই তিনি তোমাকে খুন করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক যখন আমি দেখিলাম, তিনি তোমার ঘড়িটীকে দেখিতেছেন, তখনই আমি তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

"তা—তার পর?"

"তার পর তিনি তোমাকে শুইতে বলিয়া, আস্তে আস্তে তোমার ও তাঁহার বাড়ীর সদর দ্বারে চাবি বন্ধ করিলেন, তাহাতেই আমার আরও সন্দেহ হইল, আমি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি উহাকে খুন করিবে ?" তিনি বলিলেন, "না।" কিন্তু আমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলাম না, তাঁহার বালিসের নীচে হইতে চাবি আনিয়া তোমার ও বাহিরের দরজা খুলিয়া রাখিলাম, তাহার পর তুমি সকলই জান।"

"হাঁ! তুমি কিরূপে পলাইয়া আসিলে ?"

"বাবা ও ভোলা সর্দ্দার আমাকে মারিলে পর, আমি অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার কুটীরে ঘুমাইয়াছিলাম, ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে দেখিলাম তোমার কুটীরের মেজেয় পড়িয়া আছি, কিন্তু বাড়ীতে কেহই নাই দেখিয়া আস্তে আস্তে পলাইয়া আসিয়াছি।"

"যুবক বলিল, "ওঃ! কি ভয়ানক সয়তানের হাতে তুমি মানুষ হইয়াছ ?"

"ভয় কি ? তোমার পশ্চাৎ আসিতে আমার কিছুই ভয় হয় নাই, যাহা ভয়, তাহা বাবা ও ভোলা সর্দ্দারের জন্য ; বিশেষ ভোলা সর্দ্দার বাবাব বন্ধু, মানুষ খুন করে!"

যুবক বুঝিল, সরলা তাহার বাক্যের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিল না, সেই জন্য জিজ্ঞাসা করিল, "সরলা! তুমি কি কখন লেখা পড়া শিখিয়াছিলে ?"

"না, আমি কখন তাহাকে দেখি নাই, সে কে ?"

যুবক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল, তুমি কি কখন প্রার্থনা করিয়া থাক ?"

"হাঁ, বাবার নিকট—যখন বাবা আমাকে মারিতে আইসেন, তখন আমি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, যাহাতে তিনি না মারেন ; না, শুনিলে পলাইয়া যাই।"

"আর ঈশ্বরের নিকট ?"

"ঈশ্বর কাহার নাম ?-- ভোলা সর্দ্দার কে বলিতেছ ?"

শ্রবণমাত্রেই যুবক আশ্চর্য্য হইলেন। যুবক জানিতেন ঈশ্বর জ্ঞান মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ, সকল আত্মাতেই নিহিত আছে, যুবক এইটী পুস্তকে পাঠ করিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু সরলার হৃদয়ের এইরূপ ভাব দেখিয়া যুবক বিস্মিত হইলেন।

যুবক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাল তুমি কি জান না যে, উপরে একজন ঈশ্বর আছেন ?"

"কোথায় ?"

"আকাশে ?"

"কৈ ? উপরে তারা, চাঁদ, সূর্য্য থাকে, ঈশ্বর কাহার নাম ?"

"ভাল, তুমি কি বলিতে পার না যে, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি এবং যে চন্দ্র সূর্য্যের নীচে আমরা অবস্থিতি করিতেছি, সেই পৃথিবীর এবং সেই চন্দ্র সূর্য্যের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ?"

"না !"

"এ কথা কি কেহই তোমাকে শুনায় নাই ?—এ বিষয় কি একদিনও তুমি মনে চিন্তাও কর নাই ?"

"প্রয়োজন ? ক্ষুধা পাইলে বাবাই আমাকে খাইতে দিতেন ; তাঁহার না থাকিলে উপবাস করিতাম। ঈশ্বর চিন্তা করিলে কি পেট ভরিয়া থাকে, না সুনিদ্রা হয় ?"

যুবক কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাল, সরলা ! ঐ যে দূরে একটী বাড়ী দেখিতেছ, যাহার উচ্চ চূড়া দেখা যাইতেছে—"

"হাঁ, দেখিতে পাইতেছি।"

"উহার নাম কি ?"

"কেন ?—মন্দির,—দেবালয় ?"

"উহার ভিতর কখন তুমি গিয়াছিলে ?"

"না, কখনই না।"

"ভাল, উহার ভিতর কি হয় তুমি বলিতে পার ?"

"বাবা বলিয়াছেন, উহার ভিতর কতকগুলি লোক যাইয়া অনর্থক কি গোলমাল করে, আর কতকগুলো লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে।"

যুবক বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "সরলা! তোমার বাবা!—বলিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক সরলা আমি তোমাকে লইয়া কি করিব! তুমি অতি কৃপাপাত্রী।"

"হাঁ আমি অতি গরিব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।" এই বলিয়া সরলা কাঁদিয়া ফেলিল।

যুবক প্রথমতঃ সরলার বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু আবার তাহার ক্রন্দন দেখিয়া যুবকের দুঃখ হইল, তাহার আন্তরিক নির্দ্দোষ অথচ পবিত্র ভাব বুঝিয়া যুবক প্রফুল্লিত হইল ও ভগ্নি ভাবে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "সরলা! তোমাকে লেখা পড়া শিখিতে হইবে।"

"সে কি? না, তাহা আমি জানি না।"

"তবে তুমি আমার নিকট থাকিয়া কি করিবে? কি উপায় করিলে আমি তোমাকে ভবিষ্যতে সুখী করিতে পারিব?"

"তুমি আমার নিকট থাকিলেই আমি সুখী হইব, তুমি আমার বাসায় চল, আমরা দুইজনে একত্রে থাকিব।"

শুনিবা মাত্রই যুবকের মন চমকিয়া উঠিল, কিন্তু আবার সরলার নির্দ্দোষ ও পবিত্রভাব মনে করিয়া যুবক অনিমিষ লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। যুবক ভাবিল, "সরলা ঈশ্বরের অস্তিত্বে অন্ধ, কিন্তু ঐশ্বরিক পবিত্রতায় সরলার হৃদয় চিত্রিত।" এই দেখিয়া যুবক মনে মনে যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল।

বাল্যকাল হইতেই যুবক কোন বিষয় নূতন দেখিলে তাহাতে কৌতূহল প্রকাশ করিত এবং সেই বিষয়েরই পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইত; সেইজন্য যুবা, সরলার ঈশ্বর বিমূঢ় সরল হৃদয়ের উন্নতি সাধনে সঙ্কল্প করিল এবং তাহাতেই জ্ঞান ও ধর্ম্মবীজ রোপণ করিবার জন্য ইচ্ছুক হইল। যুবক বলিল, "সরলা! তবে তুমি আমার সহিত একত্রে থাকিতে ইচ্ছা কর? কিন্তু সাবধান, আমরা উভয়ে কোন দূষিত প্রেমে আবদ্ধ হইব না।"

সরলা বলিল, "আমি তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না।"

"তোমার বুঝিবারও আবশ্যক নাই, কিন্তু তাহা হইলে তোমার উপর আমার অনেক কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ভর করিতেছে, আমি তোমাকে সেই সকল কর্ম্ম করাইব।"

"তবে কি তুমি আমার প্রভু হইবে, আর আমি তোমার দাসী হইব।" এইরূপ বলিয়া সরলা, অকস্মাৎ যুবকের দক্ষিণ কর আকর্ষণ করিয়া আপন করদ্বয়ে মর্দ্দন করিল।

যুবকের মন চঞ্চল হইল, কিন্তু সরলার চিত্ত স্থির ও অটল। সরলা চঞ্চলতার ধার এখনও ধারে নাই, সুতরাং যুবক শশব্যস্তে আপন হস্ত মুক্ত করিয়া লইল, সরলা দুঃখিত হইল।

যুবক বলিল, "তুমি যেরূপ করিলে সুখী হও তাহাই করিও।" এইরূপ বলিয়া যুবক পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যে বাসা তোমাকে দেখিয়া দিয়াছি, সে বাসায় কি তুমি স্বচ্ছন্দে আছ?"

"না।"

"কেন? বাড়ীর লোকেরা কি তোমার সহিত কোনরূপ অসৎ ব্যবহার করে?"

"না, কিন্তু তাহারা বড় গোলমাল করে?"

"তাহাতে তোমার কি?"

"আমার ইচ্ছা যেখানে কোন লোক নাই সেইখানে আমি থাকি, তাহা হইলে আমি তোমাকে নির্জ্জনে ভাবিতে পারিব।"

শ্রবণ মাত্রেই যুবকের মন, পুনশ্চ চমকিত হইল, পুনশ্চ চঞ্চল হইল, কিন্তু বুদ্ধিমান যুবা আপনা আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, এবং সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সরলা! আজ তুমি তোমার বাসায় যাও, কাল আমি তোমার জন্য একটী নূতন ও নির্জ্জন বাসা দেখিব, সেখানে থাকিলে তুমি সুখী হইবে এবং আমিও তোমার সহিত থাকিয়া তোমাকে লেখা পড়া শিখাইব—তোমাকে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাইতে শিখাইব—এবং দেখাইব যে, তোমার পৃথিবীর পিতা অপেক্ষা, উপরে আর এক পিতা

আছেন যিনি আমাদিগকে যার পর-নাই স্নেহ করেন ও অধিক ভাল বাসেন। একণে তুমি তোমার বাসায় যাও. কাল আবার এইরূপ সময়ে এইখানে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।"

"তবে কি তুমি আমার বাসায় যাইবে না?"

"না, রাত্রিকালে তোমার বাসায় যাইলে, লোকে তোমার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিবে, সেই জন্য যাইব না।"

সরলা সাশ্রুনয়নে বলিল, "সে কি রকম?"

"বুঝিবে না; তবে চল, আমি তোমাকে তোমার বাসার সন্নিকটে ছাড়িয়া দিব।" এইরূপ বলিয়া যুবক শিলাপট হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। সরলাও দাঁড়াইল কিন্তু সরলা পদচালনা করিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তে যুবকের বস্ত্র ধরিল এবং বামহস্তে আপন অঞ্চলে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যুবকের মন সরলার ক্রন্দন দেখিয়া দুঃখিত হইল। যুবক বলিল, "সরলা! তুমি কাঁদিও না, কাল আমি তোমার জন্য নূতন বাসা স্থির করিব, এবং তথায় যাইয়া দুইজনে একত্রে থাকিব।" এইরূপ বলিয়া যুবক সরলাকে সঙ্গে লইয়া তাহার বাসার অতি নিকটে ছাড়িয়া দিল, ও আপন গম্য স্থানে গমন করিল।

যুবক গমন করিলে, সরলা কিয়ৎক্ষণ তাহাকে দেখিতে লাগিল; যতদূর দৃষ্টি গেল, ততদূর ও ততক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যুবককে দেখিতে লাগিল, এবং অবশেষে আপন বাসায় প্রবেশ করিল।

চতুর্থ স্তবক।

বন-বিহার।

যুবকের কথা বলিব। যুবক কোন ধনাঢ্য লোকের একমাত্র পুত্র। পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও যুবক পথের পথিক। বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনের মধ্য সোপানে আসিয়াই যুবক সংসার-বৈরাগী। সংসার

যুবকের ভাল লাগিত না; আত্ম পরিবার যুবকের বিষ-বৈরী; ঐশ্বর্য্যের সুখসচ্ছন্দতায় যুবকের বিতৃষ্ণা। যুবক জানিত সে একাকী, আত্মজন মধ্যে, বন্ধু বান্ধবের মধ্যে, সে স্বতন্ত্র ও একাকী। এ জগতের স্বতন্ত্র ভাবই বৈরাগীর ভাব, সেইজন্য যুবক সর্ব্বদাই স্বতন্ত্র থাকিতে ভালবাসিত, নির্জ্জনতাই তাহার জীবনের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। এমন কি, পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে যুবক মধ্যে মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইত—কোথায় অগম্য নির্জ্জন স্থানে গিয়া আপন মনে বসিয়া থাকিত, কেহ তাহা সন্ধান পাইত না, আবার হয়ত তিন চারি দিন পরে আপনা আপনই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইত। যুবকের এরূপ মনের ভাব কেহ বুঝিতে পারিত না, এবং যুবকও তাহা জানিত না। কি নির্জ্জনে, কি স্বজনে, যুবক সর্ব্বদাই যেন কোন বস্তু খুঁজিয়া বেড়াইত, তাহার অন্তরে যেন কোন একটী গূঢ় বস্তুর অভাব, এইটীই অনুভব করিত, কিন্তু সে বস্তুটী কি তাহা সে নিশ্চয় করিতে পারিত না, সেইজন্য কোন একটী নূতন সামগ্রী দেখিলে, তাহার প্রতি যুবক চাহিয়া থাকিত, সেই বিষয় লইয়া বার বার পর্য্যবেক্ষণ করিত, বার বার চিন্তা করিত, তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিত এবং অবশেষে হয়ত উহাতে অন্তরের অভাব পূরণ না হইলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইত, মনে মনে আপনা আপনি কি বলিত, কখন বা বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিত।

যুবকের পিতা তাহার একমাত্র পুত্রের এইরূপ মনের ভাব দেখিয়া অনেক চিকিৎসা করাইয়াছিলেন, অনেক উপায়ে তাহার মনঃপীড়ার শান্তি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, শেষ চিকিৎসকদিগের অনুরোধে পিতা, আপন পুত্রকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইতেন। যুবক যখন যাহা বলিতেন, পিতা তদনুযায়ীক কার্য্য করিতেন। চিকিৎসায়, শারীরিক পরিশ্রমে, শুশ্রূষায় অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল, এক্ষণে পুত্রের চিত্ত প্রফুল্লতার জন্য পিতা তাঁহাকে মাসিক যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতে লাগিলেন; যুবক সেই অর্থ লইয়া, দেশ ভ্রমণ, তীর্থ গমন প্রভৃতি আপন ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া থাকিতেন।

অর্থের অভাব নাই। যুবক ভাবিলেন, সরলা নূতন সামগ্রী, সরলাকে পাইলে তিনি সুখী হইবেন, তাঁহার মনের যে গূঢ় অভাব তাহা দূর হইবে সেইজন্য যুবক দেশ ভ্রমণে ক্ষান্ত দিয়া সরলার জন্য বর্দ্ধমান সহরে একটী সুন্দর অট্টালিকা ভাড়া লইলেন। স্থান সুন্দর ও নির্জ্জন; দাস দাসী সমাকীর্ণ করিয়া সরলাকে একটী দ্বিতল হর্ম্ম্য মধ্যে রাখিয়াছিলেন এবং আপনিও তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অপযশ ভয়ে যুবক আপন নাম গোপন করিয়া বর্দ্ধমানে "নরেন্দ্রনাথ" বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন।

সরলাকে বিদ্যাবতী করা নরেন্দ্রের অভিপ্রায়, সেইজন্য যুবক গ্রামস্থ একজন বৃদ্ধ গুরু মহাশয়কে সরলার শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গুরুমহাশয় নিত্য আসিয়া সরলাকে বর্ণপরিচয় পড়াইতে বসিতেন, কিন্তু সরলা বিদ্যাশিক্ষায় বীতস্পৃহ; বোধ হয় সরলাকে যদি গৃহকর্ম্ম করিতে হইত, বা অপর কোন কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত, তাহা হইলে হয়ত সরলা গুরুমহাশয়ের নিকট প্রিয়পাত্রী হইতে পারিত, কিন্তু যে বর্ণপরিচয়ে সরলার পিতারও কোন অধিকার নাই, সে বর্ণপরিচয়ে সরলার যে অধিকার হইবে তাহা সম্ভব নহে, অতএব গুরুমহাশয় আসিলে সরলা মনে মনে বিরক্ত হইত, ও এক এক দিন গোপনে বসিয়া রোদন করিত। গুরুমহাশয় একদিন সরলার এরূপ অন্যায় ব্যবহার দেখিয়া নরেন্দ্র নাথকে বলিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথের অনুরোধে সরলা বিদ্যাভ্যাসে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইল।

এদিকে নরেন্দ্রনাথ সরলার জন্য যে বাড়ীটী ভাড়া লইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্দেশে একটী উপবন ছিল; উপবনে, পুষ্প, লতা, বৃক্ষ, পুষ্করিণী প্রভৃতি অনেক স্বভাবের বিচিত্র ছবি সজ্জিত ছিল, সেইজন্য নরেন্দ্রনাথ সেই উপবনের প্রান্তে একটী ক্ষুদ্র গৃহে অবস্থিতি করিতেন, সেটী তাহার নির্জ্জন স্থান। নরেন্দ্রনাথ সেইখানেই আহার করিতেন, সেই-খানেই চিন্তা করিতেন, সেইখানেই নানা বিষয়ের পুস্তক আনাইয়া পাঠ করিতেন, কখন বা আপন মনোগত ভাব, বা স্বভাবের সৌন্দর্য্য কবিতার আবৃত্তি করিয়া সুমধুর কণ্ঠে গান গাইতেন।

একদিন পাঠ করিতে করিতে নরেন্দ্রের অধিক রাত্রি হইল। নরেন্দ্রনাথ গৃহের একটী বাতায়ন খুলিয়া দেখিলেন, রাত্রি অধিক, ঘোর নৈশ অন্ধকারে নৈশ গগন ছায়িয়াছে—ভাবুক নরেন্দ্রনাথ, রজনীর উদ্দেশে একটী গান কবিতায় আবৃত্তি করিয়া গাইতে লাগিলেন।

* তুমি কে কামিনি !
তিমির বরণা, তিমির বসনা,
ভ্রমিছ ধরণী, উদ্যানে আপনি।

আলুলায়িত নিবিড় কুন্তল,
তাহে প্রকাশিত, তারা ফুলদল,
হীরক প্রভায়, ভাতিছে সকল,
মুখে অট্টহাসি, শশাঙ্ক ভালিনী ?

তব আগমনে, ধরাচরগণ,
সুনিদ্রার ক্রোড়ে, করিল শয়ন।
হইল ধরণী, শান্তি নিকেতন, তোমারি কৃপায়।

কি মন্ত্রে স্তম্ভিত, করিয়া ধরায়,
ভ্রমিছ একাকী, পাগলিনী প্রায়,
সারা রাতি ধরি, কার তরে হায়,
নয়নের নীরে, ভিজাও ধরণী ?

হইলে রাত্রি, ভব সম্মিলন,
প্রফুল্লিত নব, দম্পতীর মন,
গোপনে রহিয়, সাধে জীবগণ, তোমারি কৃপায়।

যাঁর তরে সদা, কাঁদে মম মন,
তুমি কি মিলাবে, পাব না সে ধন ?

* গানটি একতালায় গাওয়া যাইবে।

দাও বলি মোরে, তাঁহার সন্ধান,
কৃপা করি ওগো, সন্তাপ-নাশিনী।

অথবা তোমার, সে সাধ্য থাকিলে,
ভাসিয়া এহেন, নয়ন সলিলে,
ভ্রমিতে কি সদা, কাঁদিয়া ভূতলে, অনাথিনী প্রায়?

তুমিও কি হায়, অভাগার মত
তাঁহার সন্ধানে, ফিরিছ সতত?
কে বলিবে, আর তবে তাঁর তত্ত্ব;
যাব কার কাছে, বল গো রজনী।

এইরূপ গানটী সমাপ্ত হইয়াছে মাত্র, এমন সময় নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যেন, কে এক কামিনী-মূর্ত্তি আলোক-হস্তে তাঁহার বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। নরেন্দ্র ভাবিলেন "সরলা। আশ্চর্য্য! বালিকার এখনও নিদ্রা নাই! আমার কণ্ঠ শুনিয়া সরলা এই ঘোর রাত্রে একাকিনী আসিয়া গান শুনিতেছে, কাল এ বিষয়ে তাহাকে তিরস্কার করিব।" নরেন্দ্রনাথ মনে মনে বিরক্ত হইলেন, সরলা বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী, অথচ অনর্থক সময় ক্ষেপণ করিয়া এই শিক্ষার সময় অবহেলায় অতিবাহিত করিতেছে, নরেন্দ্র সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সরলার জন্য একাকী এই স্থানে পড়িয়া আছেন, এইটী সময়ে সময়ে চিন্তা করিতেন, কিন্তু তাহাতে দুঃখিত হইতেন না, বা দুঃখ নরেন্দ্রনাথের উদার চিত্তকে স্পর্শ করিতে পারিত না। বস্তুতই যে অন্তঃকরণ স্বভাবের নিত্য গায়ক, যে অন্তঃকরণ নির্জ্জনপ্রিয়, যে অন্তঃকরণ স্বভাব-সৌন্দর্য্য দৃষ্টি মাত্রেই আপনা আপনি বিমোহিত হয়, সে অন্তঃকরণে পৃথিবীর শোক, দুঃখ জয়লাভ করিতে পারে না। নরেন্দ্রনাথ আপন স্বাভাবিক উদার চিত্তে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল থাকিতেন; তিনি মধ্যাহ্নে আহারাদির পর, কি বৃষ্টি, কি উত্তাপ, মাথায় করিয়া আতপত্র-হস্তে তাঁহার গৃহের নিকটস্থ উপবনে গিয়া উপস্থিত হইতেন, কখন ফুল তুলিয়া গান গাইতেন, কখন কোন বৃক্ষের নব পত্র দেখিয়া প্রফুল্ল হইতেন, আবার কখন জলাশয়ের সুন্দর শোভা দেখিয়া এক দৃষ্টে

তাহার পানে চাহিয়া থাকিতেন, এবং কখনবা বাসায় আসিয়া তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি পাঠ করিতেন। তাঁহার প্রিয় সঙ্গীর মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ও ইংরাজী উচ্চ কবি থাকিত, এতদ্ব্যতীত সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি পুরাতন দর্শনকারেরাও নরেন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইতেন। নরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ যে, পুস্তক ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যের কীট ছিলেন, তাহা নহে, জীবের প্রকৃতি, প্রাণীবৃন্দের স্বাভাবিক সরলভাব, তাঁহার হৃদয়-তৃপ্তিকারী ছিল, এতদ্ব্যতীত নরেন্দ্রনাথ সময়ে সময়ে মানব-হৃদয়ও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, নূতন প্রতিবাসীর মধ্যে যদি কেহ কখন তাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহার অন্তর পরীক্ষা করিতেন, তাঁহার হৃদয়ের ভাব, হৃদয়ের নূতনত্ব, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য, গ্রহণ করিতেন এবং তাহাতেই আমোদ পাইতেন।

এইরূপে নরেন্দ্রনাথ দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সরলার বিদ্যা শিক্ষার বিষয় একদিনের জন্যও নরেন্দ্রনাথ তত্ত্বাবধান করিতেন না। নরেন্দ্রনাথ জানিতেন, সকল মনুষ্যই একদিনেই বিদ্যালাভ করিতে পারে না, জ্ঞানোন্নতির সীমা নাই, সুতরাং সময় সাপেক্ষ। সেই জন্য নরেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ গুরুমহাশয়কে সরলার জ্ঞানোন্নতির জন্য নিযুক্ত করিয়া তাহাতেই নিশ্চিন্ত ছিলেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথের প্রত্যুষে ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি আপন শয্যা হইতে শুনিলেন, অদূরে বামা কণ্ঠে কে গান গাইতেছে! অতি সুন্দর কণ্ঠ! সঙ্গে সঙ্গে তাল মান লয়, আরও সুন্দর ও সুশ্রাব্য! বিশেষ গানটী তাঁহার নিজের রচিত; সে দিবস রাত্রে, তিনি যামিনীকে উদ্দেশ করিয়া যে গানটী গাইয়াছিলেন, এটী তাহাই। নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন ও অবশেষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আস্তে আস্তে সরলার অট্টালিকার একটী বাতায়নের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন সরলাই গান করিতেছে; এরূপ অনন্যমনে সরলা গানটী গাইতেছে যে, নরেন্দ্র-নাথের অন্তঃপুর গৃহ প্রবেশ সরলার হৃদয়ঙ্গম হইল না। নরেন্দ্রনাথ কিয়ৎক্ষণ পরে সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সরলা! আইস, আমরা উপবনে যাই।"

সরলা অকস্মাৎ নরেন্দ্রনাথকে দেখিয়া প্রফুল্ল হইল, তাহার গোলাপ রঞ্জিত সুন্দর মুখকান্তি প্রস্ফুটিত হইল; সরলা হাসিল, বলিল "চল যাই।"

নরেন্দ্রনাথ সরলাকে দক্ষিণ পার্শ্বে লইয়া আপন কুটীর সম্মুখস্থ উপবনে আসিলেন। নরেন্দ্রনাথ সরলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সরলা?"

"কি?"

"বোধ হয় আমি তোমার গৃহে গিয়াছিলাম বলিয়া তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছ?"

"তোমার উপর!—অসন্তুষ্ট! কখনই না, বরং তুমি আমার কাছে সর্ব্বদা যাও নাই বলিয়া আমি পরিচারিকাকে ডাকিয়া দিতে বলি।"

"তাহারা কি বলে?"

"ডাকিয়া দেয় না—আমার ব্যগ্রতা দেখিয়া হাসে।"

নরেন্দ্র আর কিছু বলিলেন না। সম্মুখের একটী গোলাপ পুষ্প তুলিয়া বলিলেন, "সরলা! তুমি কি এইরূপ ফুল ভাল বাস।"

"তুমি বাস?"

"হাঁ।"

"তবে আমিও বাসি; কিন্তু আমার বাড়ীতে এরূপ ফুল নাই, ঐ সকল ফুল, আমি এখানে আসিয়া দেখিতেছি।" এইরূপ বলিয়া সরলা নরেন্দ্র নাথের হাত ধরিয়া তাহার হাত হইতে ফুলটী লইল।

নরেন্দ্রনাথ কিছুই বলিল না, সরলার প্রতি একবার চাহিল, দেখিল, সরলার মুখের যেরূপ সৌন্দর্য্য গোলাপে সে সৌন্দর্য্য নাই। যুবক ভাবিল, মানুষ স্বভাব-সৌন্দর্য্য নয়নে দৃষ্টি করে, হৃদয়ে অনুভব করে, কিন্তু স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যে আরও একটু মাধুর্য্য আছে, সে মাধুর্য্য মনেই বুঝিতে পারে—হৃদয়ে হৃদয়ে সে সৌন্দর্য্যের মিলন। "গোলাপ কি বুঝিবে,—হৃদয়শূন্য!"

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "সরলা! তুমি উত্তম গায়িকা!"

"আর তুমি উত্তম গায়ক! আমি সে দিন তোমার গান শুনিয়াছি; সুন্দর—সুন্দর, অতি সুন্দর।"

"হাঁ, আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম, তুমি আমার বাতায়নের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেলে।"

সরলা ভীত হইল, বলিল, "বোধ হয় তবে তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

"না সরলা! না, আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসি, সঙ্গীতের ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত, ইহা সকলের নাই কিন্তু তোমাতে আছে। তুমি যেমন সুন্দরী সেইরূপ সুকণ্ঠা! আমি তোমার গান শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

সরলা প্রফুল্লিত হইল, আনন্দে সাশ্রুনয়নে যুবকের দক্ষিণ করপল্লব ধারণ করিয়া চুম্বন করিল। নরেন্দ্রনাথ এই সময় স্তম্ভিত! তাঁহার হৃদয় চঞ্চল হইল, ধমনী গুরুবেগে আঘাত করিতে লাগিল!

সরলা বলিল, "আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি রাগ করিয়াছ।" এইরূপ বলিয়া সরলা তাহার নয়ন মুছিল ও বলিল, "তবে তুমি সকলই জান?"

"আর কি জানি?"

"জান না? আমি প্রত্যহই রাত্রে তোমার গান শুনিতে যাই এবং বিছানায় শুইয়া শুইয়া তোমার সেই সকল গান গাই; রাত্রে আমার ঘুম হয় না, হয়ত কোন দিন উচ্চৈঃস্বরে তোমার গান গাইয়া ফেলি,—গুরুমহাশয়ের লেখা পড়া আমার ভাল লাগে না।"

সরলার কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহার এরূপ মনের ভাব দেখিয়া মানব হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অনুভব করিলেন, সরলাকে কোন কথা বলিলেন না। সরলা পুনশ্চ বলিল,—

"আমার ইচ্ছা, প্রত্যহ রাত্রে আমি তোমার গৃহে গিয়া গান শুনি। আমি কোন গোল করিব না, তুমি তাহা দেখিতে পাইবে?"

"রাত্রে? কেন, রাত্রে যাইবার তোমার আবশ্যক? তোমার সঙ্গীত শিখিবার ইচ্ছা হয়, আমি দিনমানে তোমার গৃহে গিয়া তোমাকে গান শিখাইব, তাহা হইলে হয়ত তুমি আমার নিকট হইতে অন্যত্রে যাইলেও তথায় তুমি আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।"

তাহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সরলার শিক্ষক

আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সরলা তাঁহাকে দেখিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পাঠ অভ্যাস করিতে পাঠাগারে প্রবেশ করিল।

নরেন্দ্রনাথ গুরুমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে, মহাশয়, আপনি উত্তম ছাত্রী পাইয়াছেন, না ?"

"হাঁ উত্তমই বটে ? আমাকে সরলার জন্য অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, দুইদিনের পড়া একদিনে প্রস্তুত করিয়া রাখে, অতি উত্তম ছাত্রী !"

গুরুমহাশয়ের কথার ভঙ্গিমা দেখিয়া নরেন্দ্রনাথের সন্দেহ হইল, মনে করিলেন, শিক্ষক তাঁহার প্রিয়পাত্র হইবার জন্য তোষামোদ করিতেছেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাল, তবু কতদূর শিক্ষা হইয়াছে ?"

"কেন ?—কেন ?—এই দেখুন না, এই স্বল্প দিনের মধ্যেই দুইভাগ বর্ণপরিচয় শেষ হইয়াছে, এইবার কথামালা ধরাইব।"

"বেশ ! বেশ ! আর সে বিষয়ের কথা—সরলার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মাইবার কথা—তাহার মনে পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইবার, তাহাকে তাঁহার প্রেমে বিগলিত করিবার বিষয় যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাতে কতদূর সফল হইয়াছেন ?"

"সে কথা আর বলিবেন না ; আমি জানিনা যে সরলা কি প্রকার সমাজে শিক্ষিত—কিন্তু তাহার মন এরূপ কঠিন, এরূপ ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞাসূচক যে, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি অত্যন্ত অসভ্য জাতি ভিন্ন আর কাহারও মন সেরূপ ঈশ্বর শূন্য হইতে পারে না ; বলিতে কি, সরলার হৃদয় নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ।"

যুবক মনে করিলেন, ঈশ্বর তোমাকে সরলার ন্যায় নির্দ্দোষ নিষ্পাপ হৃদয় প্রদান করুন। যিনি প্রেমময়—যিনি সমস্ত জগতের প্রভু—তাঁহাকে তাঁহার সৃষ্টবস্তু জানিলেই কি আর না জানিলেই কি—পাপকার্য্যে রত মানব নিয়ত কলুষিত কার্য্যে রত থাকিয়া যদি তাঁহাকে সতত উপহাসভাবে অথবা সমাজের ভয়ে ডাকে, তবেই কি তাহার উদ্ধার হইবে—আর যে এই জগতে নির্ম্মল নিকলঙ্ক চরিত্রে থাকিয়া কেবল তাঁহাকে ডাকিতে জানে না, এই অপরাধে সে তাঁহার নিকট পাপা

হইবে—কখনই নহে—জগদীশ এত অবিচারক নহেন। হাসিয়া বলিলেন,—"যাহা হউক—যাহাতে ঈশ্বরের প্রেমবীজ সরলার হৃদয়ে প্রোথিত হয়, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন—দেখিবেন, যত্নের যেন কোনরূপ ত্রুটি না হয়।"

"না, তাহা হইবে না—যতদূর সাধ্য যত্ন করিব, কিন্তু বোধ হয় সফল হইব কি না সন্দেহ" এই বলিয়া গুরুমহাশয় সরলার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিলেন, নরেন্দ্রনাথও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

পঞ্চম স্তবক।

প্রণয়-বিকাশ।

উভয়ে সরলার পাঠ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সরলা তখন একমনে একধ্যানে পাঠে রত ছিল—পাঠ তাহার নিজের উপকার ভাবিয়া করিত না—কেবল নরেন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হইবে—যাহাকে সে ভালবাসে—যাহাকে সে দেবতার ন্যায় দেখে—যাহার মুখ সে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারে না—যদি আপনি পড়িলে সে সন্তুষ্ট হয়, তবে সরলা কেন না পড়িবে? তাই সরলা আজি নরেন্দ্রনাথের মনোরঞ্জন জন্য একাগ্রচিত্তে পাঠে রত ছিল, আপনার জন্য নহে।

নরেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিলে, সরলার পাঠভ্যাস ঘুচিয়া গেল, তখন সে একদৃষ্টে একমনে নরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল—চাহিয়া চাহিয়া নরেন্দ্রের সেই বিমল মুখ-ছবি আপনার চক্ষে অঙ্কিত করিতে লাগিল। হরি! হরি! সরলার পড়াশুনা আজ এই পর্য্যন্তই শেষ হইল।

নরেন্দ্র বলিলেন, "সরলা! পড়াশুনায় মনোযোগ দাও ত—গুরু-মহাশয়কে ত উপেক্ষা কর না—তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য কর ত—দেখিও যেন অন্যথা না হয়—তাহা হইলে আমি বড় অসন্তুষ্ট হইব—তোমার উপর রাগ করিব।"

সরলা নিরুত্তর; তখন সে অনন্যমনে নরেন্দ্রের মুখখানি ভাবিতেছিল, তাঁহার কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

নরেন্দ্রনাথ পুনশ্চ বলিলেন, "সরলা, তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাও নাই—অথবা শুনিতে পাইয়াও আমার কথায় অবহেলা করিতেছ?"

সরলা পুনরায় নিরুত্তর, নির্ব্বাক। নরেন্দ্র দেখিলেন, সে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে; নরেন্দ্র অন্যমনা হইলেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের সে ভাব সহ্য হইল না; তিনি রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "দেখিলেন মহাশয়—দেখিলেন ত—এ রূপ অবাধ্য অমনোযোগী ছাত্রী —নিয়তই আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে, পড়িতে পড়িতে সময়ে সময়ে এরূপ অন্যমনস্ক হয় যে, সাত ডাকে উত্তর পাওয়া যায় না—আমার দোষ কি মহাশয়!"

বাস্তবিকই নরেন্দ্রনাথের নিকট গুরুমহাশয় যে সরলার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই মিথ্যা; তাহা কেবল নরেন্দ্রনাথকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য—আর আপনার কর্ম্মটী বজায় রাখিবার জন্য। কিন্তু এক্ষণে নিরুপায় দেখিয়া আপনাকে বাঁচাইবার জন্য চেষ্টা করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ একমনে কি ভাবিতেছিলেন—কি ভাবিতেছিলেন তাহা তিনি জানেন না—তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই—তিনি তাঁহার হৃদয়-শূন্যতা অনুভব করিতেছিলেন—কিন্তু কি যে অভাব—কি জন্য যে তাঁহার হৃদয় সহসা শূন্য হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। বোধ হয় সেই জন্য—সেই অভাবটী পূরণ করিবার জন্য—সরলার প্রতি তাঁহার ভালবাসার অভাব, সেই হৃদয়শূন্যতার কারণ কিনা তাহাই জানিবার জন্য ভাবিতেছিলেন—অন্যমনস্কভাবে সেই অভাবটী বাহির করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের সেই ক্রোধোক্তিগুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—তিনি শূন্যহৃদয়ে শূন্যনয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্—সরলার বোধ হয় আজ শরীর খারাপ আছে—আজ আর আপনাকে পড়াইতে হইবে না, আজ আপনি যাইতে পারেন।"

গুরুমহাশয় ত তাহাই চান—যুবকের কথা শেষ হইতে না হইতেই গৃহের বাহিরে অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলেন। এমন সুবিধা কেহই ছাড়ে না।

নরেন্দ্র সরলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন এখনও সেই বড় বড় চক্ষু দুটী তাঁহার উপর সমভাবে ন্যস্ত রহিয়াছে—এখনও সরলা তাঁহার সেই মুখখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে—যুবক কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "সরলা, তুমি এখানে থাক—পড়াশুনা কর—শিক্ষক নিকটে নাই বলিয়া পাঠে অবহেলা করিও না। আমি যতক্ষণ না আসি ততক্ষণ এইখানে বসিয়া থাক, কোথাও যাইওনা।"

এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিলেন; তখন তাঁহার হৃদয়ে সরলার মুখখানি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল—সরলার ভালবাসা তাঁহার মস্তিষ্কের প্রত্যেক শিরায় প্রত্যেক ধমনীতে বিরাজ করিতেছিল। তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন—"আমার হৃদয় কি এতই দুর্ব্বল যে সামান্য বালিকার প্রেমে বিগলিত হইল—আমি কি মনুষ্য নামের যোগ্য নহি—অথবা মানব মাত্রেই দুর্ব্বল হৃদয়, কেন না কোন কবি বলিয়াছেন—

'Weak and irresolute is man;
The purpose of today
Woven with pains into his plan,
To-morrow rends away.'

প্রভো! নাথ! তাই আজ তোমার এ অধম সন্তান তোমাকে তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ে বলাধানের জন্য ডাকিতেছে। প্রভো! বল দেও, চিত্তসংযমের ক্ষমতা দেও। একি হইল দেব! আমি যে চিত্তের আবেগ কোনমতে শান্ত করিতে পারিতেছি না। যতই মনে করি আর বালিকার বিষয় ভাবিব না, ততই যেন ভাবনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—যতই তাহার সেই নিষ্কলঙ্ক মুখখানি, সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা মনে পড়ে—ততই যেন তাহাকে ভালবাসিতে, তাহার সেই ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভালবাসা দিতে ইচ্ছা করে। একি! আমি কি পাগল হইলাম—যে আমি চিরকালই স্ত্রীলোকের প্রতি বিরক্ত, বাল্যকাল হইতে স্ত্রীসৌন্দর্য্যের পক্ষ-

পাত্রী নহি—আজি কেন সেই আমি এরূপ হইলাম—সরলার সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিলাম। না, কখনই হইবে না—সরলার সহিত একসঙ্গে থাকা আমার কোন মতেই হইতে পারে না—কল্যই সরলাকে স্থানান্তরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিব—স্ত্রীরূপের বশীভূত হইব না। বালিকার মনে কষ্ট হইবে—সে আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না—সে মনে বড় কষ্ট পাইবে, কিন্তু কি করিব? বালিকা জানে না যে পাষাণ-হৃদয়ে প্রণয়-বীজ বপন করিতে চেষ্টা পাওয়া বৃথা। কখনই হইবে না—সরলার সহিত একত্রে বাস করা কখনই হইবে না—কি জানি মনুষ্যের মন কখন কি ভাবে পরিণত হয়।" যুবকের মন বিকৃত হইয়াছিল—তিনি কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই—তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়াছিল—মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইয়া ছিল—তিনি শান্তি লাভের আশায় উপবনে আসিলেন। যে ফুলগুলি তিনি ভালবাসিতেন—যে গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি মোহিত হইতেন—কবিতায় সে সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিতেন; সেই গাছগুলি যেখানে ছিল সেইখানেই আছে—সেই সমভা-বেই তাহাদের সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে—সেই সমভাবেই তাহাদের সুগন্ধ বিকাশ করিতেছে—সেই হাসি হাসি মুখে যুবকের হস্তসুখ অনুভব করি-বার চেষ্টা করিতেছে, আর মৃদু মন্দ সমীরণ ভরে হাসিয়া গড়িয়া পড়ি-তেছে। কিন্তু যুবকের কিছুই ভাল লাগিল না—সেই উপবন, সেই গাছ-গুলি, সেই নির্জ্জন গৃহ—যাহা তিনি এত ভালবাসিতেন, আজ আর তাঁহার ভাল লাগিল না—আজ যেন সকলই তিনি বিষবৎ দেখিতে লাগি-লেন; তাঁহার চক্ষে জগৎ শূন্য দেখিতে লাগিলেন; তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, উপবনের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে—নির্ম্মল শশধর সুনীল গগনে উঠিয়া হাসিতেছে—স্নিগ্ধ কিরণ আসিয়া নরেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিল—নরেন্দ্রনাথ চমকিয়া উপরে চাহিলেন, দেখিলেন, সুধাংশু হাস্যবদনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে—শাদা শাদা মেঘগুলির সহিত খেলা করিতে করিতে চলিয়াছে—কোলে চকোরীগুলি খেলা করিতেছে—চন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া

তাহার সেই সুধামাখা কিরণগুলি অঙ্গে মাখিয়া তাহার মুখসুধা পান করিতেছে, আর শশাঙ্ক প্রফুল্লচিত্তে তাহাই দেখিতেছে। যুবক দেখিলেন—দেখিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"চন্দ্র! এ জগতে তুমিই সুখী, আমি হতভাগ্য, তোমার ও বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয় কি বুঝিব, ঐ যে তোমার কোলে চকোরীগুলি খেলা করিতেছে. আর যে তুমি প্রফুল্ল আননে তাহাদের প্রতি চাহিয়া আছ—তোমরাই জান তোমরা কি বিশুদ্ধ প্রণয়সুখ অনুভব করিতেছ। আমি অভাগা, তোমাদের মনের কথা কি জানিব। কিন্তু সুধাংশো! জানিও তোমার ন্যায় আমাকেও ভালবাসিবার লোক আছে, এমন এক সরল-হৃদয়া বালিকা আছে, যে ভালবাসিব বলিয়া ভালবাসেনা—যে ভালবাসা না পাইয়াও নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসে, যে কবির সহিত সমস্বরে বলিতে পারে—

'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।'

কিন্তু শশাঙ্ক! আমি এমনই পাষাণ-হৃদয় যে তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছুক নহি—তাহার ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভালবাসা না দিয়া সে ভালবাসে এই অপরাধে তাহাকে পৃথক করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলাম। আহা! সরলা বালিকা আমাকে না দেখিয়া বাঁচিবে না।

তখন যুবকের মনের উদ্বেগ শান্ত হয় নাই। এমন সময়ে সেই সুদূর নগর ছাপিয়া একটী মধুর সঙ্গীত যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। কে গাহিতেছে—

গগন নিরমল,
শশাঙ্ক সুবিমল,
বিমল রজনী তায়।
দেখি, চকোরীগুলি,
হরষে খেলি খেলি,
চাঁদে ধরিবারে ধায়॥
বহুদিন পিপাসা,
মিটায় মন-আশা,
জোছনা মাখিয়া গায়।

শশধর হেরিয়া,
আকাশেতে ভাসিয়া,
ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥

যুবক স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ পাদচালন করিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার হস্ত গণ্ডদেশে ন্যস্ত ছিল—তিনি চিত্তসংযমের চেষ্টা পাইতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ ঐরূপ ভাবে বেড়াইয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন,—"না, কখনই হইবে না, স্ত্রীলোকের রূপে আমি কখনই মুগ্ধ হইব না। আমার যে মনের মানস চিরকাল অবিবাহিত থাকিব—প্রকৃতিকে সহচরী করিয়া এই নশ্বর জীবন কাটাইব—তাহা হইতে কখনই বিচলিত হইব না। সরলাকে স্থানান্তরে যাইতেই হইবে—কালই তাহার জন্য অন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব—আর অবোধ বালিকাকে আমাকে ভালবাসিতে নিষেধ করিব, বৃথা আমাকে ভালবাসিয়া তাহাকে মনঃক্লেশ ভোগ করিতে দিব না। কল্যাই—কল্যাই—"

আত্মাভিমানী যুবক জানেনা যে, ত্রিজগতে এমন কেহই নাই যে প্রকৃতির সেবা করে না; পরম প্রকৃতির অংশ যে সকল দেবী এই সৃষ্টির ভার গ্রহণ করিয়াছেন—স্ত্রীজাতি তাঁহাদেরই অংশজাত। সেই জন্য স্ত্রীজাতিকে অবহেলা করিয়া এজগতে কেহই থাকিতে পারে না। পরম যোগী যোগাবলম্বনে বহুকাল অতীত করিয়াও রমণীর রূপলাবণ্যে কিম্বা কটাক্ষবাণে অথবা সুমধুর কণ্ঠ শ্রবণে বিচলিত হইয়াছেন—অন্য পরে কা কথা। এ বিষয়ে যদি কোন সন্দেহ থাকিত, তাহা হইলে আর শ্রীকৃষ্ণ আদ্যাশক্তি রাধিকার চরণ ধরিয়া বলিতেন না—

"ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম জীবনং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।"

এমন সময়ে সহসা যুবক পশ্চাতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেন; দেখিলেন যে সরলা তাঁহার চীৎকার শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিতেছে। অবোধ বালিকা জানেনা যে তাহাকে কি ভীষণ সংবাদ শুনিতে হইবে—জানেনা যে

কল্যই তাহাকে ভিন্ন বাটীতে থাকিতে হইবে—জানেনা যে কল্য হইতে আর যুবককে—তাহার ভালবাসার জিনিসকে—তাহার প্রিয়বস্তুকে—আর সে দেখিতে পাইবে না—হয় ত জন্মের মতই দেখিতে পাইবে না। কেননা যুবক সরলার সহিত চিরকালের মত পৃথক হইতে মনস্থ করিয়াছিলেন—মনস্থ করিয়াছিলেন যে, সরলাকে প্রচুর অর্থ দিয়া—যাহাতে সে যাবজ্জীবন সুখে কাটাইতে পারে, এরূপ অর্থ দিয়া ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন বাটীতে রাখিয়া আসিবেন; আর কখনও দেখা করিবেন না।

সরলা নিকটে আসিয়া যুবকের হস্তে হস্ত দিয়া বলিল, "কি হইয়াছে?—ওরূপ চীৎকার করিতেছিলে কেন?—কোনরূপ ভয় পাইয়াছ কি?"

সবেগে সরলার হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিয়া যুবক কহিলেন, "সরলা! শুন, আর তোমায় আমায় একত্রে বাস করা ভাল দেখায় না, নানা লোকে নানা দূষ্য কথা বলিবে, তাই বলিতেছি, কাল হইতে তুমি ভিন্ন বাসায় থাকিও—তোমার জন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিব—তোমার হাতে প্রচুর অর্থ দিব—কোন কষ্ট হইবে না, কেবল আমাকে আর কখন দেখিতে পাইবে না, এইমাত্র।" বলিবার সময় যুবক মনে বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন, কেন না তাঁহার চক্ষে জলের চিহ্ন ছিল।

"এইমাত্র" যুবক বলিলেন বটে, কিন্তু সরলার হৃদয়ে সেই কথাগুলি গুরুতর লাগিল। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি যাইলে যদি তুমি সুখী হও, তবে অবশ্য যাইব—কাল কেন, আজই যাইতেছি। আমি তোমার অর্থ চাহিনা—সুখস্বচ্ছন্দ চাহিনা; যাহাকে ভালবাসিতাম, তাহাকেই যদি না পাইলাম তবে আমার আর এ সুখে কাজ কি! পৃথিবীতে কেহই নিরাহারে মরে না—তবে মনে এই বড় দুঃখ রহিল, যে তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে—দরিদ্র বলিয়া ত্যাগ করিলে—কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট নহি—যেখানে থাকিব, সেইখানেই তোমার সুখের জন্য প্রার্থনা করিব।" সরলার মনে তখন কিঞ্চিৎ ঈশ্বর-প্রেমের আবির্ভাব হইয়াছিল।

এই বলিয়া সরলা জন্মের মত সেই সুখের আবাস ত্যাগ করিয়া চলিল। যুবক চিত্রার্পিতের ন্যায়, কাষ্ঠ-পুত্তলিকার মত, তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কিন্তু যুবকের কথা সরলার মনে শেল সম বিঁধিয়াছিল। কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই, তাহার মস্তক ঘূরিতে লাগিল, শরীর অবশ হইয়া আসিল; সরলা আর শরীর স্থির রাখিতে পারিল না, অজ্ঞান হইয়া পড়িবার উপক্রম হইল; তখন যুবক সত্বরে আসিয়া সরলাকে ধরিয়া বলিল, "সরলে! প্রাণেশ্বরি! আর না! তুমি আমাকে এতদূর ভালবাস যে, আমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত—আর আমি এমনই অধম—এমনই নীচ —এমনই নীচ যে, তোমাকে কষ্ট দিতে—তোমার প্রাণ-হনন করিতে প্রস্তুত। আর না! সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর সাক্ষী—সমস্ত জগৎ সাক্ষী! আজ হইতে আমি তোমার হইলাম—আজ হইতে ভালবাসার বদলে তোমায় ভালবাসা দিলাম। আইস, প্রাণেশ্বরি, গৃহে আইস—আর জীবন থাকিতে তোমার সহিত পৃথক হইব না।"

তখন সরলা যুবকের বক্ষে মস্তক রাখিয়া শুইয়াছিল—আর যুবক প্রেমভরে যুবতীর মুখ-চুম্বন করিতে করিতে বিশুদ্ধ প্রণয়ের স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছিলেন। যুবকের কঠিন হৃদয় কোমল হইল—পাষাণ অন্তরেও প্রণয়-বীজ অঙ্কুরিত হইল।

ষষ্ঠ স্তবক।

ভালবাসার প্রতিদান।

মূর্চ্ছাপনোদন হইলে সরলা অনুভব করিল যে, সে কাহার বক্ষে মস্তক ন্যস্ত করিয়া শুইয়া আছে; তখন সে ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিল— ধীরে ধীরে সেই পদ্মপলাশবৎ, হরিণ নয়নবৎ চক্ষু দুইটী খুলিল; খুলিয়া বিলোল দৃষ্টিতে যুবকের প্রতি চাহিল—দেখিল যে, সে তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের ধন, ভালবাসার বস্তু নরেন্দ্রনাথের আলিঙ্গনে বদ্ধ; তখন তাহার হৃদয় আহ্লাদে ভরিয়া গেল। সে অতীত যাতনা সমস্ত ভুলিল, শরীরে বল

পাইল, গাঢ় বাহুপাশে নরেন্দ্রনাথকে বদ্ধ করিয়া বলিল, "বল, আর কখন আমায় ত্যাগ করিবে না—বল, কখন আর আমাকে পৃথক হইতে বলিবে না—বল, আজ হইতে আমাকে তোমার ওই মুখখানি—ওই সুন্দর মুখখানি প্রাণ ভরিয়া, আশা মিটাইয়া দেখিতে দিবে—বল, তাহা হইলেই আমি সুখী হইব।"

তখন নরেন্দ্রনাথ সজলচক্ষে, অনুতপ্ত হৃদয়ে, সরলার সেই শশধর-বিনিন্দিত মুখখানির সেই গোলাপ-নিন্দিত কপোলদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না, সরলা, কখনই না, প্রাণ থাকিতে আর তোমায় আমায় পৃথক হইব না—সর্ব্বসংহারক কাল ভিন্ন আর কেহই আমাদিগকে বিভিন্ন করিতে পারিবে না—আজি হইতে তোমাকে ভালবাসিব—ভালবাসার পরিবর্ত্তে ভালবাসা প্রতিদান দিব।"

হায়, ভ্রমান্ধ যুবক জান না যে মনুষ্য দৈবাধীন—জাননা যে মানবমাত্রেই আপনাপন ভবিষ্য সুখের ছবি অঙ্কিত করে, কিন্তু দৈবই তাহা ভিন্নরূপ করিয়া দেয়; হায়, নরেন্দ্রনাথ আজি তুমি জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানের মত কথা বলিলে।

তখন সরলা সুন্দর বদনে বিম্ব-নিন্দিত অধরে, কুন্দ-নিন্দিত দন্তে মধুর হাসি হাসিয়া আপনার ভুজপাশ শিথিল করিল—প্রফুল্ল মুখে সন্তুষ্ট হৃদয়ে নরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল হইতে মস্তক উঠাইয়া বলিল, "তবে আজ হইতে আমাকে ভালবাসিলে—তবে আজ হইতে আমাকে তোমার সহিত একত্রে থাকিতে অনুমতি দিলে; বাস্তবিক তোমার সহিত পৃথক হইবার কথা মনে হইলে মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগে—হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। তুমি উপহাস ভাবে যাহা বলিয়াছিলে, তাহা আমি সত্য মনে করিয়াছিলাম, সেই জন্যই না আমার ওরূপ অবস্থা হইয়াছিল।" আহা! সরলা বালিকা, নরেন্দ্রনাথের অতীত কথাগুলিকে, একবার মাত্র তাঁহার আলিঙ্গন পাইয়া উপহাস মনে করিল—কিন্তু নরেন্দ্রনাথ যে কত ক্লেশে, কত মানসিক যন্ত্রণা ভোগের পর, সেই কথাগুলি কত অনিচ্ছায়, মনের আবেগে বাহির করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই জানেন, আর সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরই জানেন। আহা! সরলা, সরলতার জাজ্বল্যমান প্রতিমূর্ত্তি।

সরলার কথায় যুবকের মনের কষ্ট আরও বাড়িয়া উঠিল—অনুতাপ আরও তীব্র হইল, তখন তিনি নিম্নদৃষ্টিতে মৃত্তিকার উপর চাহিয়া রহিলেন; সরলার মুখপানে চাহিতে আর সাহস হইল না; তাঁহার মনে হইতেছিল, "আমি কি পাষণ্ড, কি পাষাণ-হৃদয়; আমি আবার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখাই, আমার ন্যায় পাপী সেই পবিত্র নাম লইতে অধিকারী নহে—পাপী না হইলে আর এরূপ সরলা বালিকার কোমল হৃদয়ে কষ্ট দিতে সাহসী হই।"

উভয়ে কিয়ৎক্ষণ নীরবে রহিলে পর, সরলা হাসি হাসি মুখে পুষ্পদাম-তুল্য কোমল হস্তে নরেন্দ্রের হস্ত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, নরেন্দ্রনাথ ও মন্ত্র-মুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। যুবকের একবার আলিঙ্গনে একবার মিষ্ট সম্ভাষণে সরলা সকল ক্লেশ সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছিল।

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল—ঘূর্ণায়মান চক্রের ন্যায় একটী দিনের পর আর একটী দিন সময়-পথে ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম দিন কয়েক নরেন্দ্র নাথ অনুতাপে কাটাইতে লাগিলেন; লজ্জায় আর তিনি সরলার সহিত কথা কহিতে পারিতেন না—কথা কহিবার ইচ্ছা হইলেও যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিত—যেন কত কি অপকর্ম্ম করিয়াছেন—যেন সরলার নিকট তিনি কত অপরাধে অপরাধী—তিনি লজ্জায় সরলার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতেন। কিন্তু নরেন্দ্রের সে ভাবে সরলার মনে বড় কষ্ট হইত; সে তাহা সহ্য করিতে পারিত না; তাহাতে তাহার মনে কত কি সন্দেহ হইত—নরেন্দ্র তাহাকে দেখিতে পারে না মনে করিত। একদিন আর সে থাকিতে না পারিয়া নরেন্দ্রনাথকে নিকটে পাইয়া, স্পষ্টই বলিল,—"তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কাছে থাকিলে আমি সুখী হই—পিতার সে ভয়ানক দুর্ব্যবহার ভুলিয়া যাই, বলিয়াই কি তুমি আমাকে দেখা দেওনা—আমার সহিত কথা কওনা—তাহা না হইলে কেনই বা তুমি নিয়ত অন্তরে থাক—দৈবাৎ আমার সম্মুখে পড়িলে কেনই বা সভয়ে দূরে চলিয়া যাও। বাস্তবিক তোমার ব্যবহারে আমার মনে বড় কষ্ট হয়; যদি যথার্থই ভালবাস, তবে আমার নিকট হইতে চলিয়া যাইও না—আমার সহিত কথা কহিও।"

সেই দিন হইতে যুবক সাহস পাইলেন—হৃদয়ের গুরুভার নামাইলেন; সেই দিন হইতে যুবক প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখন তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে, লজ্জায় লজ্জায় কাটাইবেন না। যখন সরলা তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছে—তাঁহার সমস্ত পূর্ব্ব-আচরণ ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার ভালবাসার, তাঁহার সহিত কথা কহিবার, একত্রে থাকিবার প্রার্থী হইয়াছে, তখন তিনি কেন আর তাঁহার সরলার প্রতি দুর্ব্যবহার-জনিত অনুতাপে দগ্ধ হইবেন, কেন আর কাতর-হৃদয়ে মর্ম্মবেদনা সহ্য করিবেন। এখন তাঁহার উচিত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা; কিন্তু সেই পাপের প্রায়শ্চিত কি?—যুবক ভাবিয়া দেখিলেন, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বালিকা যাহাতে সুখী হয়, তাহাই করা। সেই জন্য সেই দিন হইতেই যুবক চিত্ত প্রফুল্ল করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন; আবার পূর্ব্বের ন্যায় সরলার সহিত হাসি মুখে কথা কহিতে যত্ন পাইলেন, তাহার সহিত নিয়ত একত্রে থাকিতে ইচ্ছুক হইলেন; তিনি যে বিষয়ে সফল হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইলেন। আবার সকলে দেখিল যে, তাহাদের সেই পূর্ব্বের ন্যায় হাসি খুসি আরও গাঢ়তর হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের পরস্পরকে দেখিবার ইচ্ছা আরও বাড়িয়াছে, তাহাদের নির্জ্জনে কথোপকথন আরও অধিক-মাত্রায় চলিতেছে। বস্তুতঃ সরলার সহিত যুবকের ভালবাসা বড়ই প্রগাঢ় হইয়াছিল।

হয় ত অনেকে যুবক যুবতীর এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া দূষিবেন, হয় ত অনেকে তীব্র উক্তি করিয়া কহিবেন, এ আবার কি! সরলা যেন কিছুই জানেনা, কিন্তু যুবক জ্ঞানী হইয়াও কিরূপে সরলার সহিত—এক অবিবাহিতা পূর্ণবয়স্কা বালিকার সহিত এরূপ প্রণয়-সম্ভাষণ করিতেছেন। সমাজের নিকট তাঁহারা দোষী হইলেও হইতে পারেন—যেহেতু শঙ্খধ্বনি, স্ত্রী-আচার বা মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি কোনরূপ বিবাহের অঙ্গ তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের নিকট তাঁহারা কোন মতেই দোষী হইতে পারেন না, কারণ বিবাহ আর কিছুই নহে, কেবল দুইটী যুবক যুবতীর যাবজ্জীবন অকপট প্রণয়ের সহিত যাপনের প্রতিজ্ঞা মাত্র; কিন্তু তাঁহারা উভয়েই তাহাতে প্রতিজ্ঞত এবং ভবিষ্যতে পাঠক পাঠিকারাও

দেখিতে পাইবেন যে, নানা বিপদে, নানা প্রলোভনে পড়িয়াও কেহই সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হয়েন নাই।

একদিন উভয়ে একত্রে উপবনে একখানি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছেন; মৃদু সমীরণ সরলার বস্ত্রের প্রান্ত ও সূক্ষ্ম কেশগুলি লইয়া খেলা করিতেছে—সুন্দর সুগন্ধ ফুলগুলির সৌরভ লইয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিতেছে—প্রত্যেক বৃক্ষপত্রে প্রত্যেক পুষ্পদলের উপর চন্দ্র কিরণ পড়িয়াছে। সুন্দর রজনী, মনোহর স্থান।

সহসা নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "সরলা, বল দেখি এরূপ সুন্দর রাত্রি তোমার মনোহরণ করে কি না?"

"করে বই কি!—কিন্তু সকল সময় নয়, তুমি নিকটে না থাকিলে নিতান্ত সুখের জিনিষও আমার কাছে বিষ বলিয়া বোধ হয়।"

"কেন সরলা, তুমি কি আমাকে এতই ভালবাস?" এই বলিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া সরলার সেই সুন্দর গণ্ডদেশ দুইটি টিপিয়া ধরিলেন।

যুবকের গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া সরলা কহিল, "তাহা কি আবার বলিতে হইবে!"

"আচ্ছা সরলা, আমার যদি তোমার গুরুমহাশয়ের মত ফোগ্‌লা মুখ ও তোব্‌ড়ান গাল থাকিত, তাহা হইলেও কি তুমি আমাকে ভালবাসিতে?"

"বাসিতাম বই কি! কিন্তু তুমি যে কোন মতে সেরূপ কুৎসিত হইতে পার, আমার ত তাহা বোধ হয় না।"

"সরলা, তুমি তোমার শিক্ষককে যৌবনকালে দেখ নাই, আমিও দেখি নাই; কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, সে যৌবনকালে দেখিতে অতি সুন্দর ছিল—যদি আমাকে তোমার সুন্দর বলিয়া জ্ঞান থাকে, তবে বুঝিয়া লও, আমা অপেক্ষাও সুন্দর ছিল। যদি বাঁচিয়া থাকি, জানিও, আমাকেও এক দিন ঐরূপ কুৎসিত হইতে হইবে।"

"আমার ত বিশ্বাস হয় না যে, তুমি কখন দেখিতে কুৎসিত হইতে পার—সময় কখন তোমাকে কুশ্রী করিতে পারে; ঐ সুন্দর মুখখানি কি কখন বিকৃত হইতে পারে?—না কখনই পারে না।"

"সরলা তুমি আমাকে ভালবাস বলিয়াই এরূপ বলিতেছ, তাই তোমার ওরূপ বিশ্বাস। কিন্তু জানিও, সময়ে সকলেরই পরিবর্ত্তন আছে।"

"তোমাকে আমি যেরূপ ভালবাসি, তাহা আর কথায় প্রকাশ করা যায় না; শুনিয়াছি, সঙ্গীতে না কি মনের ভাব অনেক পরিমাণে প্রকাশ করা যায়, কিন্তু বিধাতা আমাকে গীত রচিবার ক্ষমতায় বঞ্চিত করিয়াছেন। আহা! যদি আমার তোমার ন্যায় কবিতা রচনার কিম্বা সঙ্গীত রচনার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে দেখাইতাম যে, তোমাকে আমি কত ভালবাসি। ভাল, সঙ্গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?"

"যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে বলিতে হইবে, মহর্ষি ভরত প্রথমে সঙ্গীত বিদ্যার অবতারণা করেন। তিনি গান্ধর্ব্ববেদ প্রণেতা এবং স্বর্গে দেবতা ও অপ্সরাদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। আইস, রাত্রি অধিক হইয়াছে, গৃহে যাই" এই বলিয়া সরলার হস্ত ধরিয়া যুবক উপবন হইতে গৃহে গমন করিলেন।

সপ্তম স্তবক।

সাংঘাতিক কথা।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, মাসের পর মাস অতিবাহিত হইতে লাগিল। কাল-বিহঙ্গমের অনন্ত-পক্ষে ভর দিয়া কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যায়, তা দুই চারি মাস কি ছার!!

সরলা এখন আর সেরূপ কুটীর-বাসিনী সরলা নহে; এখন আর সে কাঁটা চলিতে দেখিয়া ঘড়ীকে বেজীর ন্যায় কোন জীবিত প্রাণী মনে করে না; এখন আর ঈশ্বরের নাম, লেখাপড়ার নাম শুনিয়া অবাক্ হয় না; এখন সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানিয়াছে—লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে, প্রণয় কি বস্তু তাহা বুঝিয়াছে; সমাজ-শিক্ষিত মানবের সহিত মিশিয়া সরলা সামাজিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যৌবনে স্ত্রী পুরুষের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে,

বৃদ্ধ পিতার সহিত সেরূপ নির্জ্জন-আবাসে থাকিয়া ও যুবককে সরলার মনে দেখিয়া, এমন এক ইচ্ছা বলবতী হইয়াছিল, যাহা অবশেষে প্রণয়ে পরিণত হইল।

যুবক যুবতীর দিন, সেই সমভাবেই চলিতেছিল—সেই একত্রে বাস—সেই একান্তে কথাবার্ত্তা—সেই পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রেমালাপ—সেই এক ভাবেই চলিতেছিল; কখন মনে করে নাই যে, অনন্ত বিচ্ছেদ অনন্ত ক্লেশ তাহাদের জন্ত ভবিষ্যৎ-গর্ভে নিহিত আছে।

একদিন সরলা শুইয়াছিল, মুক্ত-বাতায়নপথে সুখদ মলয় মারুত আসিয়া তাহার গাত্র স্পর্শ করিতেছিল; সরলা সুখে নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু সরলা সেই সুখের নিদ্রাতে বড় এক অসুখের স্বপ্ন দেখিল। সে দেখিল, "যেন এক অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ আসিয়া নরেন্দ্রকে কি বলিল, আর নরেন্দ্র সরলার সহিত একটীও কথা না কহিয়া—কোথায় যাইতেছেন তাহা না বলিয়া, সেই লোকটীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া যাইলে পর, যেন কতিপয় ভীষণাকৃতি দৈত্য আসিয়া সরলাকে লইয়া গেল—সরলা কত কাঁদিতে লাগিল, ছাড়িয়া দিবার জন্ত তাহাদিগকে কত অনুরোধ করিতে লাগিল—কিন্তু তাহারা যেন কোনমতেই তাহার কথা শুনিল না, তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর সে অনেক নূতন নূতন বিপদে পড়িতে লাগিল; নরেন্দ্রনাথের সহিত যেন কতকাল বিচ্ছিন্ন রহিল।" নিদ্রাবেশে সরলা চমকিয়া উঠিল, তাহার সুখের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চিন্তায় ও আশঙ্কায় সে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিল; কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলিতে তাহার সাহস হইল না।

বলিতে ভুলিয়াছি যে, প্রাতে ও অপরাহ্নে ভ্রমণ, যুবকের একটী দৈনিক কার্য্যের মধ্যে ছিল। যেদিন সরলা উপরিলিখিত দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছিল, ঠিক্ তাহারই পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি অভ্যাস-সিদ্ধ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, তখন অল্প অল্প অন্ধকার হইয়াছে। ভ্রমণকালে সরলাকে সঙ্গে লইতেন না; সরলা ত আর সেই দরিদ্র-কুটীরবাসীর কন্তা নহে, এখন সে তাঁহার প্রণয়-আধার কাজেই হিন্দু ভদ্র-সমাজের আচাব ব্যবহারের অধীন। কিয়ৎদূর

গিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, তিন জন লোক, দেখিলে সামান্য মধ্যবিৎ শ্রেণীর বলিয়া বোধ হয়, তাঁহার পিতার বিষয়ের কোন কথা বলিতে বলিতে যাইতেছে। পিতার নাম শুনিবামাত্রই যুবক ধীরে ধীরে পদচালনা করিয়া তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই যুবকের পিতার বিষয়ে কতকটা আভাস দিয়াছি। বলা হইয়াছে যে, যুবকের বাড়ী শিয়ালদহে। প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিধারে অনেক স্থান লইয়া লৌহ-দণ্ডে বেষ্টিত। সেই পতিত ভূমির খানিকটায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফলফুলের গাছ; একস্থানে প্রকাণ্ড গোশালা, পার্শ্বে অশ্বশালা, তথায় তিন চারিখানি সুন্দর গাড়ী ও পাঁচ ছয়টী ঘোটক থাকিবার স্থল, একপার্শ্বে সহিস কোচমানেরা থাকে। প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে কতিপয় গৃহ, তাহা দ্বার-রক্ষক ও ভৃত্যদিগের বাসস্থান। যুবকের পিতা প্রায় অর্দ্ধ বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, কিন্তু যৌবনের পূর্ণ-সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। অত্যন্ত দানশীল; কোথায় দাতব্য চিকিৎসালয় হইবে, অমনি ৫০০৲ টাকা স্বাক্ষর করিলেন; কোথায় বা অনাথশালা করিয়া দিলেন; কোথায় কোন দরিদ্র ব্যক্তি কন্যাদায় বা পিতৃমাতৃ-মৃত্যুদায়ে কষ্ট পাইতেছে, অমনি তাহার জন্য তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিলেন। কাজেই দূর দেশান্তরে অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়াছিল—বিশেষতঃ বর্দ্ধমানের নিকটস্থ কতিপয় গ্রাম তাঁহার জমীদারীর মধ্যে থাকায়, সে সকল স্থানের সকলেই তাঁহাকে জানিত; উপরি লিখিত লোক তিনটী তাহারই একটী গ্রামবাসী।

যাহা হউক, যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলিব। যে তিনটী লোকের কথা বলিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন আর একজনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে শুনেছ, আমাদের জমীদার বিজয়বাবুর নাকি বড় শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, শুনেছি নাকি, এখন তখন।"

"হাঁ, তা আর শুনিনি! কেবল আমাদের গ্রামে কেন? সকল গ্রামেই ত তাঁর পীড়ার কথা রাষ্ট্র হয়েছে। ছোট বড় সকলেই ত একথা শুনেছে। আহা! ঈশ্বর করুন, যেন আরোগ্য-লাভ করেন। আহা! বড় অমায়িক

লোক, বড় দয়ার শরীর” দ্বিতীয় ব্যক্তি এই উত্তর দিল। বলিবার সময় সে মনের আবেগে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না।

তৃতীয় ব্যক্তি আশ্চর্য্য-ভাবে বলিল, “বল কি! কৈ আমি ত একথা শুনি নাই, এই যে সেদিন তিনি রামা মণ্ডলের বাকী খাজনা মাপ্ কল্লেন, এর মধ্যেই কবে এমন ভারী ব্যায়রাম হ’ল। আহা! একটী বই ছেলে নয়, তা সেটীও কাছে নাই, কোথায় আছে—তারই বা ঠিক্ কি! খবর পেয়েছে কিনা, তাই বা কে জানে?—আহা! তাইত গা, এখন ভগবান্ রক্ষা কল্লে হয়।”

প্রথমে যে কথা কহিয়াছিল, সে তাহার উত্তরে বলিল, “তুমি কি রকম কোরে জান্‌বে? তুমি এতদিন বিষয়কার্য্যে মুর্শিদাবাদে ছিলে, আজ এসেছ বইত নয়; কিন্তু শুনেছি নাকি বড় শক্ত ব্যায়রাম, অম্লশূল। অনেক বড় বড় ডাক্তার, বড় বড় হাকিম কবিরাজ জবাব দিয়েছে; এখন কেবল এক ঈশ্বর মাত্র ভরসা।”

এইরূপ বলিতে বলিতে তাহারা চলিয়া গেল।

যুবক সমস্তই শুনিলেন, শেষ পর্য্যন্ত শুনিলেন—প্রথম ব্যক্তির শেষোক্ত ভয়ানক কথাগুলি শুনিলেন; তখন আর তাঁহার পা উঠিল না, তিনি সেইখানে—সেই পথের ধূলি-রাশির উপর বসিয়া পড়িলেন; তখন তাঁহার মনে কত কি ভাবনার উদয় হইতেছিল। গৃহ পরিত্যাগ করিবার সময় তাঁহার পিতার পুনঃ পুনঃ নিষেধ-বাক্যগুলি, সজল-নয়ন ও কাতর ভাব সকলই একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তখন তিনি আপনাকে আপনি শতেক ধিক্কার দিয়া, সহস্রবার নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “হায়! আমি কি হতভাগ্য—পিতার কি কৃতঘ্ন সন্তান! হায়! আমার এ মহাপাপের শাস্তি নাই। যখন পিতা আমাকে সজল-নেত্রে বলিয়াছিলেন, ‘বাবা, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমাকে ছাড়িয়া যাইও না—যদি একান্তই যাও, বেশী দিন বিদেশে থাকিও না, তোমাকে না দেখিলে আমি বাঁচিব না, হয়ত কোন কঠিন পীড়া আসিয়া আমার দেহের অবসান করিবে।’—দুইটী হস্ত ধরিয়া পিতা আমাকে যখন এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তখন কেন আমি তাঁহার কথা

শুনি নাই। আহা! যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাইত ঘটিতে চলিল। হায়! তাঁহার অন্তিমকালেও কি তাঁহাকে একবার দেখিতে পাইব না। কিন্তু গত কথা ভাবিয়া আর ফল কি! এখন আমার বাড়ী যাওয়া সর্ব্বপ্রকারে উচিত হইতেছে। যদি তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, একবার তাঁহাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলেও তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিব — পায়ে ধরিয়া বলিতে পারিব, "পিতঃ! তোমার অধম অকৃতজ্ঞ সন্তান তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া ক্ষমা চাহিতেছে।"

যুবক কলের পুতুলের মত সহসা উঠিয়া বাসস্থান অভিমুখে চলিলেন; তখন তাঁহার মন পিতার ভাবনায় ব্যাকুল ছিল—সরলার বিষয় তাঁহার মন হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

গৃহে আসিয়া, যুবক শয্যার উপর বসিয়া পড়িলেন; সরলা নিকটে ছিল, তাঁহার ঘনশ্বাস ও নৈরাশ্য-মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। অনুমান করিল, বুঝি, কোন ভাবী বিপদাশঙ্কা তাহার নরেন্দ্রনাথকে ব্যাকুল করিয়াছে; তাই সে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিল, "কি হইয়াছে? আজ তোমাকে এরূপ বিমর্ষ ও দুঃখিত দেখিতেছি কেন?"

"এরূপ অবস্থা কেন? সরলা, তুমি তার কি বুঝিবে!—আমার হৃদয়ে যে কি ভীষণ যাতনা হইতেছে, তাহা তুমি কি জানিবে, সরলা!" এই বলিয়া যুবক ক্ষিপ্তের ন্যায় গৃহের বাহিরে গেলেন। সরলার দুঃস্বপ্ন ফলিতে চলিল—সরলার হৃদয় পূর্ব্বরাত্রির স্বপ্ন ভাবিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বাড়ীতে মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল—বাগানের মালী গাড়ী ডাকিতে গেল—পরিচারকেরা পথের আবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী গুছাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিল—প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি বাক্স-বদ্ধ হইয়া গাড়ীতে উঠিল—দেখিতে দেখিতে যুবক বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সরলার নিকট আসিলেন; "আমার পিতার মুমূর্ষাবস্থা; আমার দয়ালু, ক্ষমাশীল পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া, তাই এত শীঘ্র যাইতেছি; দুই এক দিনের মধ্যে আমার পত্র পাইবে। ঈশ্বর করুন, যেন তিনি ভাল থাকেন, তাহা হইলে যত শীঘ্র পারি তত শীঘ্র আসিব; ভয় কি সরলা,

শান্ত হও, ও কি, তুমি কাঁদিতেছ কেন? করুণাময় ঈশ্বর অবশ্যই আমাদিগের ভাল করিবেন।” এই বলিয়া যুবক সত্বরপদে যাইয়া গাড়ীতে উঠিলেন; যাইবার সময় সরলার সহিত আর কোনরূপ মিষ্ট সম্ভাষণ করিলেন না।

ঘর্ঘর শব্দে পথের ধূলি উড়াইয়া শকটখানি রেলওয়েষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেল—স্বপ্নের কিয়ৎ অংশ সত্য হইল।

যতক্ষণ দৃষ্টি যায়, ততক্ষণ সরলা সেই গাড়ীখানির প্রতি চাহিয়া রহিল—অদৃশ্য হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, “বিধাতা, আমাকে কষ্টভোগের জন্যই ইহ সংসারে পাঠাইয়াছেন। বালিকাবস্থায় পিতার নিকট অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, এখন আবার নূতন মর্ম্মবেদনা উপস্থিত। হায়, কুস্বপ্ন সত্য সত্যই ফলিতে চলিল!”

সরলা, যথার্থই বলিয়াছ, অনেক দুঃখ-ভোগের নিমিত্তই তুমি সৃজিত হইয়াছিলে।

অষ্টম স্তবক।

পিতা ও পুত্র।

প্রথম স্তবকে বলিয়াছি যে যুবক বৈদ্যনাথে যাইবার রাস্তায় পথ ভুলিয়াছিলেন অনেকে বলিতে পারেন যে, তখন যদি রেলই হইয়াছিল, তবে পদব্রজে যাইবার প্রয়োজন কি? তিনি ধনীলোকের সন্তান, তাঁহার যদি বৈদ্যনাথে তীর্থ কিম্বা কোন কার্য্যোপলক্ষে যাইবারই আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা হইলে ত শিবিকা বা অন্য কোনরূপ যানারোহণে যাইতে পারিতেন; কিন্তু যুবক সেরূপ কোন উদ্দেশ্যে যান নাই, তিনি কিছু অর্থ লইয়া পদব্রজে নানা স্থানের নানারূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, লোকের রীতিনীতি দেখিয়া বিপুল আনন্দ পাইবার প্রত্যাশায় গিয়াছিলেন; এখন ও

ইয়ুরোপে অনেক লোক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসীমা উত্তীর্ণ হইলে, রেলে না যাইয়া ঐরূপ পদব্রজে নানা স্থান দেখিয়া নূতন নূতন জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে সময়ের কথা লিখিতেছি, সে সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া না হউক, জামালপুর পর্য্যন্ত যে রেল হইয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি।

যথাসময়ে রেলওয়ে শকটখানি আসিয়া হাবড়ায় থামিল; নানা-বর্ণের নানাজাতির লোক দলে দলে সেই ব্রহ্মাণ্ড-বাহিনীর উদর হইতে নামিতে লাগিল—কিন্তু যুবকের সহিত তাহাদের মনের অবস্থা কত বিভিন্ন—তাহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত বাড়ীর আমোদ আহ্লাদে যোগ দিতে যাইতেছে, আর আমাদের নরেন্দ্রনাথ কিনা, গুরুভারাক্রান্তহৃদয়ে আপনার পিতার জীবন সংশয় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। একখানি ভাড়াটীয়া গাড়ী আরোহণে যখন যুবক আপনার পিত্রালয়ের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি আন্দাজ একটা হইবে--দ্বারের দ্বারপাল অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে; বাড়ীতে জনপ্রাণীরও শব্দ শুনা যাইতেছে না।

দ্বার শৃঙ্খল-বদ্ধ ছিল, কাজেই নরেন্দ্রনাথ বাহির হইতে দ্বার-রক্ষককে ডাকিতে লাগিলেন; অনেক ডাকের পর তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—সে ইতিপূর্ব্বে নিদ্রাযোগে কত কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল—ঘুমের ঘোরে রাজা উজীর মারিতেছিল—সুখসেব্য দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় শয়ন-সুখ অনুভব করিতেছিল—ছিন্ন কন্থায় শয়ন করিয়া কোটী মুদ্রার অধিকারী হইতেছিল, কাজেই সে, সুখের ঘুম ভাঙ্গাতে বিরক্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "আপনি কে মশা, অত হাঁক ডাক কেনো মশা"

নিদ্রার আবেশে সে নরেন্দ্রনাথের স্বর অনুভব করিতে পারে নাই—দেখিয়াও চিনিতে অক্ষম হইয়াছিল, তাই ঐরূপ আধ বাঙ্গলা আধ হিন্দীতে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

"কিরে! দয়ালসিং, আমায় চিনতে পারিস্‌নি! বাবা কেমন আছেন?"

"ওঃ আপ্ হ্যায়—বহুত রোজ বাদ হামকো মালুম নেহি হুয়া—বাবুতো

আভি থোড়া আচ্ছা হ্যায়" এইরূপ ছাড় ছাড় কথার সহিত নিদ্রা-বিজড়িত চক্ষে দয়ালসিং কপাট খুলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে সেই লৌহ-কপাটদ্বয় আসিয়া ভিত্তির উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন হইল, নরেন্দ্রনাথ বহুদিনের পর সেই পৈতৃক আবাসে পদার্পণ করিলেন।

সত্বরে যুবক দ্বার হইতে বাটী পর্য্যন্ত সেই ক্ষুদ্র পথটী অতিক্রম করিলেন—তখন চারিধারে প্রকৃতি হাস্য করিতেছিল, জ্যোৎস্না প্রত্যেক বৃক্ষপত্রে, পুষ্করিণীর সলিলে, সৌধ শিখরের উপর শুইয়াছিল—নিশীথ মৃদুপবন কচিৎ-উন্মুক্ত বাতায়ন-দ্বার নড়াইতেছিল—উন্নত-শীর্ষ তরু সকলের নব কিশলয়গুলি দোলাইতেছিল। দুই চারিটী গৃহপালিত ছাগ মেষ ইতস্ততঃ ঘুমাইতে ঘুমাইতে রোমন্থন করিতেছিল, তাঁহার পদশব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া উঠিল; যুবক সকলই দেখিলেন, তখন তাঁহার চিন্তার অনেকটা শান্তি হইয়াছিল, কেবল পিতাকে দেখিবার ইচ্ছাই যা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী।

যখন সেই পথটী অতিক্রম করিয়া যুবক পিতার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহার পিতা শুইয়াছিলেন, কিন্তু জাগ্রত; শরীর অত্যন্ত শীর্ণ বটে, কিন্তু মুখে কোনরূপ যাতনার চিহ্ন নাই। প্রথমে পদশব্দ শুনিয়া তিনি চমকিত হইয়া "কেও, মধু-হরি-রামা" ইত্যাদি কয়েকটী ভৃত্যের নাম অতি ক্ষীণস্বরে উচ্চারণ করিলেন।

"না বাবা, আমি, তোমার অধম ও অকৃতজ্ঞ সন্তান শৌরীন্দ্রমোহন" এই বলিয়া যুবক শয্যার উপর পিতার পদতলে পড়িলেন।

"কেও, শৌরিন্দ্র, বাপ এসেছিস্" এই বলিয়া পিতা অতি ক্লেশে উঠিয়া বসিয়া যুবককে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল—বহুদিনের পর পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল; তখন যুবক পিতার নিকট আপনার অবাধ্যতার জন্য কত ক্ষমা চাহিলেন—কত অশ্রুজল প্রবলবেগে বহিয়া তাঁহার পিতার পদদ্বয় সিক্ত করিতে লাগিল—আর পিতা তাঁহাকে কত সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কত প্রকার মিষ্টবাক্যে তাঁহার অনুতাপের লাঘব করিবার চেষ্টা করিলেন, তা আর কি বলিতে হইবে?

পাঠকপাঠিকারা, জানিয়া রাখুন যে, যুবকের যথার্থ নাম শৌরীন্দ্র-

মোহন, এখন নানাস্থলে তিনি উভয় নামে পরিচিত হইবেন, সেই জন্যই বলিতেছি. দুইটী নামই স্মরণ রাখা উচিত।

নবম স্তবক।

নূতন বিপদ।

যুবক চলিয়া যাইলে পর, কিছুদিন সরলা সেই নির্জ্জন বাসস্থানে কাটাইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া নরেন্দ্রের আগমন-প্রত্যাশায় বহির্দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিত, আবার সন্ধ্যা-সমাগমে নৈশ অন্ধকারে ধরণী আবৃত হইলে, স্তিমিত নক্ষত্রালোকে পৃথিবী ছায়িলে, হতাশ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিত; কখন বা উপবনে আসিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ-করিয়া, চক্ষুজলে মৃত্তিকা ভিজাইত—কত গভীর দুঃখ-ব্যঞ্জক কথা কহিত; কিন্তু কেই বা সে কথা শুনে, আর কেই বা তাহার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করে—সঙ্গীর মধ্যে একজন পরিচারিকা আর একজন পাচিকা মাত্র; তা তাহারা আর তাহার দুঃখের কথা কি বুঝিবে!

বিষাদের দিন শীঘ্র ফুরায় না—সরলার নিকট সেই কতিপয় বিচ্ছেদের দিবস কয়েক যুগের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। প্রিয়-কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার বঙ্গমতীতে লিখিয়াছেন—

"জীবন না যায় রে!
যায় দিন যায়, দিনমণি যায়,
নিবিয়া নিবিয়া রে!
সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল,
মিশিয়া মিশিয়া রে!
যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে
ছায়াতে মিশায় রে!
সকলি ত যায়, কেবল দুখের
জীবন না যায় রে!"

যথার্থ কথা; দুঃখের জীবন যে কত কষ্টবহ, তা যে ভোগ করিয়াছে সেই বলিতে পারে। সরলা যদি কবি হইত, তাহা হইলে যখন নিরাশায় তাহার হৃদয় পূরিত, তখন হয়ত সে মর্ম্মভেদী স্বরে ঐরূপ কোন গীত গাহিয়া আপনার গভীর মানসিক ক্লেশের পরিচয় দিত; কিন্তু সেই মনঃ-ক্লেশের সময়ে কি সরলা কোনরূপ সান্ত্বনা পায় নাই—পাইয়াছিল, কিন্তু সে অতি সামান্য—যুবকের নিকট হইতে দুই তিনখানি নীরস পত্রিকা মাত্র। (পাঠকেরা মার্জ্জনা করিবেন, যেহেতু সে সকল পত্রে সরলার প্রতি কোনরূপ অনুরাগ-কথা নাই, তাহা সরলার নিকটে কোনমতে আদরণীয় হইতে পারে না)—তাহাতে কেবল যুবকের পিতার পীড়ার কথা এবং একখানায় দুইকেতা ১০০৲ টাকার নোট ছিল। সরলা যখন সেই সকল চিঠি পড়িত, তখন সে কোনরূপে রোদন সম্বরণ করিতে পারিত না—যুবকের প্রণয়ের হ্রাস ভাবিয়া সে দীর্ঘশ্বাসের সহিত অশ্রুজলে গণ্ডদেশ সিক্তকরিত—কাজেই তাহাতে দুঃখের লাঘব না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

সময় কাহারও কথা শুনে না—দুঃখের হউক সুখের হউক তোমার দিন কাটিবেই কাটিবে—তোমার একটী দুঃখসুখের দিনের পর আর একটী দুঃখসুখের দিন আসিবেই আসিবে—পৃথিবীর এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম। সরলার পক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল—কষ্টের দিন যন্ত্রণায় যাইতে লাগিল, এইমাত্র।

একদিন পরিচারিকা বাজারে পোদ্দারের নিকট হইতে নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা আনিতেছিল, অন্যদিন সে হাসি হাসি মুখে, একে তাকে, পথের লোক ডাকিয়া কথা কহে, কিন্তু সেদিন সেভাব নাই—বিষণ্ণ বদনে, শুষ্কমুখে, কম্পিত-হৃদয়ে আসিতেছে—রাস্তায় অন্যান্য পরিচারিকারা তাহাকে কত কি কথা কহিল—নিকটে আসিয়া কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু সে সে কথায় 'না কি হাঁ' কিছুই উত্তর দিল না। সকলেই মনে করিল, কিছু না কিছু ঘটিয়াছে—তাহা না হইলে সে অত বাক্‌পটু হইয়া আজ অন্য মনস্ক কেন?

শ্লথপদে গৃহে আসিয়া সে ভগ্নস্বরে, সরলাকে বলিল, "এই নেও গো, দিদীঠাকরুন তোমার টাকা নেও?"

সরলা কোন দিন পরিচারিকাকে ওরূপ বিমর্ষ দেখে নাই, সেইজন্য সন্দিগ্ধমনে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কামিনী, কি হইয়াছে, তোর আওয়াজ আজ ভাঙ্গা ভাঙ্গা কেন ?"

"আর বাপু, যে কথা শুনে এলেম, তাতে পেটের পীলে চমকে যায়—পেটের ভাত চাল হয় গো!"

"কেন কি হয়েছে ?"

"হবে আর কি ! যা হবার তাই হয়েছে—ডাকাতি গো ডাকাত্তি !"

"ডাকাত্তি ! সে কিরে ! কোথায় ডাকাত্তি হয়েছে ?"

"শোননিগা, এই গাঁয়ের তারিণীর মা, আহা দুঃখী মানুষ ৫০০৲খানি টাকা পুঁজী ছিল—তাই খাটিয়ে টাটিয়ে কোনমতে দিন কাটাত—কাল রাত্রে তার বাড়ীতে পোড়া ডাকাত পড়ে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে গেছে গো! আহা মাগী বড় ভালমানুষ ছিল গো—আমার অনেক উপকার করেছে।"

"সত্য নাকি !"

সত্য না ত কি মিথ্যে গা—আহা, আমাদের কি দশা হবে গা—হাঁগা, যদি আমাদের বাড়ীতে আজ ডাকাত পড়ে, তা হলে আমরা তিনটী মেয়ে মানুষ, কি করে রক্ষা পাব গা" এই বলিয়া কামিনী উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠিল।

"তা আর ভাবিলে কি হইবে ! অদৃষ্টে যা আছে, তাহা অবশ্যই ঘটিবে, ভাবিয়া ত কোন ফল হইবে না।" অন্যমনস্কভাবে সরলা এই উত্তর দিল।

যে দিন সরলার সহিত পরিচারিকার উপরিউক্ত কথাবার্ত্তা হয়, তাহার পর দুইচারি দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল—যদিও সহরের ভিতরে অনেক স্থানে অনেকরূপ কথা শুনা যাইত—যদিও কেহ কেহ ভয়ে ভিখারীদিগকে ভিক্ষা দিত না, পাছে সে ডাকাতের চর হয়—যদিও অনেকে ভয়ে বৈষ্ণব বাবাজীদিগকে বাড়ীতে ডাকিয়া গান শুনিত না, পাছে সে ছদ্মবেশী দস্যু হয়—যদিও চিমটাধারী ভস্মমাখা সন্ন্যাসী দেখিলে, অনেকে ভয়ে দূরে পলায়ন করিত—যদিও অপরিচিত লোক গৃহে আসিলে তাহাকে অনাদরের সহিত ব্যবহার করিয়া শীঘ্র বিদায় করিয়া দিত, তত্রাচ সরলার সেই

সহরের প্রান্তস্থিত নির্জ্জন গৃহটী শান্তিময় ছিল; কিন্তু সে শান্তি বহুদিন ভোগ করিতে হইল না।

রাত্রি দুই প্রহর—দূরে ঘোর-নিনাদে রাজবাটীর বৃহৎ কাংস্য-ঘড়ী বাজিয়া উঠিল; সমস্ত পৃথিবী অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে আবৃত—সমস্ত পথঘাট তিমিরাবরণে গভীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে—দূরে ক্বচিৎ দুই একজন প্রহরীর হৈ হৈ রব শুনা যাইতেছে, এমন সময় 'খট্—খট্—খট্' সহসা সরলার গৃহের বাহিরে শব্দ হইল। সরলা তখন গাঢ়-নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল—নরেন্দ্রের প্রতিকৃতি তখন স্বপ্নযোগে তাহার সম্মুখে নাচিতেছিল—আর সে, সকল কষ্ট, সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়া তাহাই দেখিতেছিল, এমন সময়ে 'খট্—খট্—খট্' শব্দ সরলা শুনিতে পাইল। সরলা মনে করিল যে, কোন মূষিক বা মার্জ্জার ঐরূপ শব্দ করিতেছে—সেইজন্য সে, সেবিষয়ে তত মনোযোগ করিল না—আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা পাইল; কিন্তু পরক্ষণেই মনুষ্যের অস্পষ্ট শব্দ—কতিপয় মুহূর্ত্ত পরেই 'দরজা খোল্—দরজা খোল্—নইলে ভেঙ্গে ফেল্‌ব,. এই কর্ক্কশ-শব্দের সহিত পুনঃ পুনঃ দ্বারে আঘাত। সরলা অত্যন্ত ভীত হইল, তখন আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে, সে প্রাণভয়ে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিল, দেখিতে দেখিতে দুই কদাকার মূর্ত্তি মশাল-হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল।

"বড় সুখে ঘুমচ্ছিলি, না! এখন টাকা কড়ি কোথায় আছে সব দে, নইলে জানিস্ ত"—এই বলিয়া সেই নরহন্তা দস্যুদিগের মধ্যে একজন একখান তীক্ষ্ণধার ছুরিকা দেখাইল।

"আমার ত কিছুই নাই—যাহা আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে লইতে পার।" "স্বচ্ছন্দে লইতে পার" বিকট মুখভঙ্গী করিয়া উপহাসস্বরে সেই ব্যক্তি সরলার নিকটে যাইয়া বলিল, "দিবি ত দে, নইলে মেরেফেল্‌বো—নীচের লোক বলেছে যে, তোর কাছে অনেক টাকা আছে; তাই বল্‌চি, ভালয় ভালয় দে, যদি দিস্ তাহলে কোন ভয় নেই, নইলে মর্‌তে হবে।"

সভয়ে তাহার মুখপানে চাহিয়া সরলা কহিল, "তুমি কি ভোলা সর্দ্দার! যদি তাই হও, তাহা হইলে দয়া করিয়া আমার প্রাণ ভিক্ষা

দেও; তুমি সকলই লইয়া যাইতে পার, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই।"

"হুঁ-উ তাই ত, তুই আমার নাম জানিস্ দেখচি যে, তা আর বেশীদিন জান্‌তে হবে না" এই বলিয়া বিকট হাসি হাসিয়া ভোলা সর্দ্দার বজ্রমুষ্টিতে সরলার হস্তধারণ করিয়া সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার বক্ষে আমূল বসাইবার উপক্রম করিল।

এতক্ষণ অপর ব্যক্তি দূরে দাঁড়াইয়া সকল ঘটনা দেখিতেছিল, সরলার কথার স্বর শুনিয়া, তাহাকে চিনিতে পারিল—এক্ষণে উপস্থিত বিপদ্ দেখিয়া সে নিকটে লাফাইয়া পড়িল।

"মূর্খ! দেখ্‌ছিস্ নি ও আমার মেয়ে সরলা।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সবলে ভোলা সর্দ্দারের সেই সছুরিক-হস্ত ধরিল। সেই ভীষণ আক্রমণে তাহার অপর হস্ত শিথিল হইয়া আসিল, তখন সরলা নিষ্কৃতি পাইয়া কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বলিল, "হায়, আমার দশা কি হবে; বাবা! এখনও তুমি এই কাজ কর!" এই বলিয়া সরলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

ভোলা সর্দ্দার আপনার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না দেখিয়া নৈরাশ্য-স্বরে বলিল, "দেখ্, রামা, তুই সব্ কাজ খারাপ করে দিলি—এ যদি বেঁচে থাকে, তা হলে আর আমাদের নিস্তার নাই, এমন মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল।"

"তুই যা বল্‌চিস্ তা ঠিক্ বটে, কিন্তু তোকে সে ভাবনা ভাব্‌তে হবে না, যাতে দুদিক বজায় থাকে, তা আমি কর্‌বো" এই বলিয়া বৃদ্ধ বিছানা হইতে চাদর টানিয়া লইয়া সরলার গাত্র আবৃত করিল। ভোলা তখন টাকা কড়ি ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর বোঁচকা বাঁধিতেছিল, কাজ শেষ হইলে বলিল, "কাজ ভাল হলো না ও যদি আমাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসে, তা হলে আমাদের বড় বিপদ্।"

"পালিয়ে আস্‌তে পার্‌লে ত—শীগ্‌গির সেরে নে—শীগ্‌গির সেরে নে" এই বলিয়া সরলাকে স্কন্ধে করিয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে বৃদ্ধ রাম মদক গৃহের বাহিরে পড়িল—ভোলা ও লুণ্ঠন-সামগ্রী হস্তে তাহার সঙ্গী হইল।

দশম স্তবক।

নিষ্ফল অন্বেষণ।

সুখ ও দুঃখ পৃথিবীর দুইটী অলঙ্ঘনীয় বস্তু—পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়া অবধি মানব-জীবন এই দুইটী অনিবার্য্য পদার্থ ভোগ করিয়া আসিতেছে। এ জগতে এমন কেহই নাই, যিনি মৃত্যুকালে বলিয়া যাইতে পারেন, 'আমার সমস্ত জীবন দুঃখে বা সুখে অতিবাহিত হইয়াছে, আমি কোন দিন ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখ কিম্বা দুঃখ ভোগ করি নাই।'—এই নশ্বর পৃথিবীর চারিধারে চাহিয়া দেখ, দেখিবে, এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! এক সময়ে কত লোক হাসিতেছে, আবার কত লোক কাঁদিতেছে; হয় ত, কাল যে হাসিয়াছিল, আজ সে কাঁদিতেছে; অথবা কাল যে কাঁদিতেছিল, আজ সে হাসিতেছে। তাই বলিতেছি, গৃহধর্ম্মে থাকিয়া সুখদুঃখবোধ পরিত্যাগ করা সহজ কথা নহে—তাহা হইলে আর কোন জ্ঞানী ব্যক্তি লিখিতেন না—

"সুখস্যানন্তরং দুঃখং, দুঃখস্যানন্তরং সুখম্ ;
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ।"

তুমি একটু ভাবিয়া দেখ—পৃথিবীর নিত্য ঘটনাগুলি ক্ষণেক চিন্তা করিয়া দেখ, দেখিবে, উক্ত শ্লোকের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক বর্ণ সত্য—আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের অবস্থিতির ন্যায় সত্য।

কিন্তু তাই বলিয়াই কি এ পৃথিবীতে সুখী ব্যক্তি নাই? মানবমাত্রেই কি সুখী হইতে পারে না?—পারে বই কি! এই অনিত্য সংসারে থাকিয়া যে মায়া-বন্ধন কাটাইতে পারে—যে ঈশ্বরে তদ্গতচিত্ত হইয়া, বিপদে তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া—তিনি অবশ্যই আমার মঙ্গলের জন্য ইহা করিতেছেন, এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হয়—তুমি দেখিবে, ধরণীপৃষ্ঠে সেই যথার্থ সুখী—চিরকালের জন্য সুখী—দেখিবে যে, সেরূপ ব্যক্তি সুখের সময়ে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইবে না, দুঃখের সময়েও মনঃকষ্টে কাতর হইবে না—সুখ দুঃখ তাহার পক্ষে সমান বস্তু। ভক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন—

"দুখ্‌মে সব্‌ হরি ভজে, সুখে না ভজে কোই ;
সুখ্‌মে যো হরিভজে, দুখ্‌ কাঁহাসে পাই।"

কিন্তু সেরূপ লোক এই অবনীতে অতি বিরল ; সকলেই প্রায় সুখের সময় আমোদে দিন যাপন করে, ভ্রমক্রমে ঈশ্বরের পবিত্র নাম মুখে আনে না, আর বিপদ্‌ আসিলেই সেই পবিত্র নামের উপর শত সহস্র দোষারোপ করে ; সেই জন্যই বলিতেছি, লোকের দিন চিরকাল সমান যায় না।

যে রাত্রে 'সরলার অপহরণ রূপ' সেই ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, ঠিক্‌ তাহার দুইমাস পরে একখানি গাড়ী আসিয়া সেই জনমানবহীন দম্পতীযুগলের পূর্ব্ববাসস্থানের দ্বারের নিকট থামিল—একটী পূর্ণবয়স্ক যুবাপুরুষ শশব্যস্তে গাড়ী হইতে নামিলেন—এ যুবক আর কেহই নহে, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত নরেন্দ্রনাথ এক্ষণে শৌরীন্দ্রমোহন। তাঁহার আর সেই পূর্ব্বের মত সুন্দর মুখশ্রী নাই, বলিষ্ঠ গঠন নাই—সেই স্বল্পদিনের মধ্যেই যেন তিনি কত বৎসর অতিক্রম করিয়াছেন। শরীর শীর্ণ, বদন মলিন, সে সুন্দর গৌরবর্ণের উপর এখন কালিমা পড়িয়াছে—মুখখানি বিষাদের রেখায় অঙ্কিত ; দেখিলে বোধ হয়, যেন সম্প্রতি কোন ভয়ানক মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। ফলতঃ সরলার সহিত সেই বিচ্ছেদের সময়ে যুবক নিয়ত পিতার নিকট থাকিতেন—আবার যখন পিতার পীড়া ক্রমে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল—যখন চিকিৎসায় আর কোন ফল দেখিল না—যখন দিন দিন যুবকের পিতার দেহ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল—তখন যুবককে সর্ব্বদা তাঁহার কাছে থাকিতে হইত, তাঁহার সেবা শুশ্রূষা সকলই তিনি নিজে করিতেন, পিতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে তিনি আপনার শরীরকে শরীর বলিতেন না—অসময়ে আহার করিতেন, হয় ত পর পর দুই তিন দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রা যাইতে অবকাশ পাইতেন না, যদি কখন ক্লান্ত চক্ষু দুইটী নিদ্রার আবেগে ঢুলিয়া আসিত, পিতার সামান্য ক্ষীণস্বরেই আবার তিনি চাহিয়া উঠিতেন। ক্রমে

পিতার মৃত্যুকাল আসিল—সেই সুন্দর দেহে ভীষণ কালিমা দেখা-দিল—তখন যুবক সেই শব-দেহ ক্রোড়ে করিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। কত লোকে কতরূপ সান্ত্বনা দিল, কিছুতেই তিনি শান্তি পাইলেন না—আর ও কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইলেন—তাহাতে যে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইবে, বর্ণ যে মলিন হইবে, সেই ষড়্‌বিংশতি বর্ষীয় যুবাপুরুষকে যে ষষ্টিবৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধের ন্যায় দেখাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু কিছুই চিরস্থায়ী নহে—যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে মাতা আর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সন্তানের মৃত্যুশোক ভুলিতেন না, সন্তানেরা ও পিতা মাতার মৃত্যু-জনিত শোক ভুলিয়া গিয়া আবার সংসারে মনো-নিবেশ করিত না। কালে সকল দুঃখেরই উপশম হয়—কালে নরেন্দ্র-নাথেরও সেই গভীর শোক কমিয়া আসিল, তখন তিনি ভাবিলেন, "পৃথিবী অনিত্য, সংসার অনিত্য, পিতার পর পুত্র, বৃদ্ধের পর যুবা সংসারে প্রবেশ করিতেছে। সকলেরই ভাগ্যে শোকের অংশ আছে, কেহই তাহা হইতে পরিত্রাণ পায় না—কিন্তু তাই বলিয়া কে সংসার-কার্য্যে অবহেলা করে! কে সুখী না হইতে চেষ্টা পায়!—বিধাতা আমাকে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, আমি কেন তাহাতে উপেক্ষা করিব!" তখন তিনি কতক পরিমাণে সুস্থ হইলেন—আবার সরলার চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল—তিনি সরলার সহবাসে সুখী হইবার জন্য ইচ্ছা করিলেন—একটী নির্জ্জন কুটীর হইতে যে একটী অমূল্য রত্ন বিনা আয়াসে পাইয়াছিলেন, তাহা গলে পরিয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবনের অবশিষ্ট অংশটী কাটাইতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু হায়, চিরদিন সমান যায় না; যুবকের ভাগ্যে সে সুখ ঘটিল না—বিধির নির্ব্বন্ধ কে অন্যথা করিতে পারে, ভাগ্যলিপি কে খণ্ডাইতে পারে।

রাম মদক ও ভোলাসদ্দার বাটীতে প্রবেশের পূর্ব্বেই পাচিকা পলায়ন করিয়াছিল—সে দস্যুভয় শুনিয়া অবধি রাত্রিকালে সেই অরক্ষিত গৃহে থাকিত না; এক্ষণে দূর হইতে যুবককে দেখিয়া সে নিকটে আসিল।

যুবকের মন পূর্ব্বেই খারাপ হইয়াছিল—মনে কেমন একরূপ উদাস-ভাবের উদয় হইতেছিল—হৃদয় সবেগে আহত হইতেছিল—বিষাদ যেন আরও ঘোররূপে তাঁহার শরীর আক্রমণ করিতেছিল ; কিন্তু কারণ কি ?—তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই ; আবার যে নূতন মনঃক্লেশ ভোগ করিতে হইবে, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত ও তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। তিনি ইতস্ততঃ সরলার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন—কিন্তু কে সে কথার উত্তর দিবে ?—সরলা ত আর সেখানে নাই, যে বহুদিনের পর তাহার নরেন্দ্রনাথের কথার স্বর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আসিবে। যুবক অত্যন্ত ভীত হইলেন—তিনি প্রত্যেক গৃহ, উপবনের প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার প্রাণের সরলাকে দেখিতে পাইলেন না। পাচিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল—সে সেই ভয়ানক দিবসের পরদিন আসিয়া দেখিল যে, পরিচারিকা বন্ধনাবস্থায় আছে—তখন সে তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত শুনিয়াছিল ; যুবক যখন হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন, তখন সে সম্মুখে আসিয়া বলিল, "আপনার যেমন বিশ্বাসের শ্রী—এক অচেনা গরিবের মেয়েকে অত বিশ্বাস করা আপনার উচিত হয় নি—এমন অনেক ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য দুঃখীর মেয়ে আছে—যারা রাস্তাঘাটে যুবাপুরুষদের আপনাদের রূপে ভুলিয়ে কৌশলে তাহাদের সমস্ত অর্থ অপহরণ করে—আপনি জান্‌বেন, আপনার সরলাও ঐ রকম একটী—এতদিন সুবিধা খুঁজ্‌ছিল, এখন সময় বুঝে যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে পালিয়ে গেল—ডাকাত গুলো বোধ হয় ওর বাপ দাদা।"

"নারকী! অতি জঘন্য কৃমিপূর্ণ নরকও তোর বাসস্থানের যোগ্য হইতে পারে না। কি বলিব, তুই স্ত্রীলোক, নহিলে তুই ইহার যোগ্য প্রতিফল পাইতিস্" ভীষণ ক্রোধোক্তি-সহকারে যুবক তাহাকে এই কথাগুলি বলিলেন।

কামিনী—সরলার পরিচারিকা, যদি ও ভয়ে ডাকাতির পরদিন হইতে সেই বাটীতে পদার্পণ করিত না, তথাপি প্রায়ই প্রত্যহ একবার না একবার আসিয়া যুবকের খোঁজ করিয়া যাইত ; আজও সে সেইরূপ আসিয়াছিল—

পাচিকার কথা আরম্ভের পূর্ব্বেই সে আসিয়াছিল—এক্ষণে যুবকের কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "ঠিক্ বলেছেন বাবু, উহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত, হলই বা মেয়ে মানুষ। দিদিঠাকুরুণ্ বেশ্যা, দিদিঠাকুরুণ্ অসৎচরিত্রের লোক, তুই লোক দেখে ও চিন্‌তে পারিস নি।" এই বলিয়া সে সেইরাত্রের ঘটনাগুলি যথাযথ আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিল—বর্দ্ধমানে দস্যুভয়—সেই রজনীতে তাহাদের আগমন—তাহার উপর তাহাদের অত্যাচার ও অবশেষে তাহার বন্ধন—সরলার ও দস্যুদিগের অস্পষ্ট শ্রুত কথাগুলি এবং সরলাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় লইয়া প্রস্থান—সমস্তই যাহা শুনিয়াছিল এবং দেখিতে পাইয়াছিল, সকলই বলিল—বলিয়া অবশেষে কহিল, "নিয়ত ডাকাতি হইতেছে দেখিয়া, পুলিষের লোকের অনেক বদ্‌লোকের উপর সন্দেহ হয়—তাহার মধ্যে দুইজন লোকের উপর উহারা বিশেষ সন্দেহ করে—ভোলাসদ্দার নামে যে একজন নিষ্কর্ম্মা লোক নিয়ত এই গ্রামে বেড়াইত, তাহার চেহারা বড় ভয়ানক এবং আর একজন লোক যে পূর্ব্বে সদুপায়ে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু পরিশেষে ভীষণ মদ্যপায়ী হইয়া অনেক জঘন্য কাজ করিয়া, একটী নির্জ্জন স্থানে লোকের অনুসন্ধান হইতে আপনাকে পৃথক রাখিয়াছিল, তাহাকেও অনেক লোকে ডাকাতির সময়ে দেখিয়াছিল—পুলিষ হইতে তাহাদের অনুসন্ধান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই।"

'এই সকল কথা শুনিয়া যুবকের মস্তক ঘুরিয়া গেল, তখন আর তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, দুরাত্মা দস্যু রাম মদক তাহার কন্যাকে অপহরণ করিয়াছে। অবিলম্বে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া সমস্ত কথা কহিয়া পরিশেষে বলিলেন, "যত অর্থ ব্যয় হউক, তিনি ব্যয় করিতে প্রস্তুত আছেন—রীতি-মত অনুসন্ধান আরম্ভ হউক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বড় দয়ালু লোক ছিলেন, যুবকের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল—তিনি পুলিষের উপর আদেশ করিলেন যে, 'যতদূর সাধ্য সরলা ও দস্যুদ্বয়ের অন্বেষণ কর'—কিন্তু অনেক অনুসন্ধানে, অনেক ছদ্মবেশী-শান্তিরক্ষকে ও কিছুই করিতে পারিল না; শীঘ্রই জানা গেল যে, রাম মদক

ও ভোলা সর্দ্দার সে দেশে নাই—সেই কুটীর খানি পরিত্যক্ত হইয়াছে, বহু-দূরে কোন গ্রামে তাহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। অনুসন্ধানের শেষ দিবস অবধি যুবক সেই গ্রামে ছিলেন, যখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে ডাকিয়া বলি-লেন, "দেখ, এত অনুসন্ধানেও কোন ফল হইল না—যদি কখন কোনরূপে তাহাদের সন্ধান পাওয়া যায়, তোমার ঠিকানা লিখিয়া যাও, লিখিয়া জানাইব।"

ম্যাজিষ্ট্রেটের সদয়-ব্যবহারে যুবক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল, তিনি হতাশ-হৃদয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন; আসিবার সময়, সেই পরিচারিকাকে, তাহার উপকারের এবং সরলার চরিত্রের উপর অটল বিশ্বাসের জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া আসিলেন।

একাদশ স্তবক।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু।

যতই কেন জ্ঞানী হও না—যতই কেন বিদ্যালোকে হৃদয় আলোকিত কর না—যতই কেন পবিত্রাত্মা, শুদ্ধচেতা লোক হওনা—মায়াবন্ধন ত্যাগ করা বড় সহজ কথা নহে; তাহা হইলে আর ভরত ঋষি দারাপুত্র ত্যাগ করিয়া, অবশেষে একটা সামান্য মৃগ-শাবকের স্নেহে পড়িয়া আপনার যোগযাগও ইষ্টদেবতা ভুলিয়া গিয়া, পরিশেষে সেই মায়ার জন্য ততদূর পর্য্যন্ত দুঃখভোগ করিতেন না। মহাযোগী বিশ্বামিত্র সামান্য এক অপ্সরার রূপে মোহিত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিতেন না। সকলেই মুখে বলিতে পারে—

> "তুমি কার? কে তোমার! এই কথা সার;
> জানিল যে, বুঝিল সে, সংসার অসার।"

—কিন্তু কাজে করে কে?

রাসেলাস যখন এক জ্ঞানীব্যক্তিকে উপদেশ দিতে শুনিয়াছিলেন, "পৃথিবী অনিত্য, মানব-জীবন অচিরস্থায়ী—পিতা বল, মাতা বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, কেহই কাহার নহে—সমস্ত হইতে পৃথক্ থাকিও, বৃথা শোক ও মোহে পড়িয়া কষ্ট পাইও না।"—তখন তিনি মনে করিয়াছিলেন,—যদি ইহজগতে কোন সংসারী ব্যক্তি মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া থাকে, তবে ইনিই সে; কিন্তু আবার সেই লোককে যখন এক দুই-চারি বৎসরের কন্যার শোকে বালকের ন্যায় রোদন করিতে দেখিলেন, তখন বুঝিয়াছিলেন যে, 'পৃথিবীতে যথার্থ জ্ঞানী ব্যক্তি নাই—লোকে মুখে যেরূপ মায়াশূন্য ও শোকদুঃখশূন্য হইতে উপদেশ দেয়, কার্য্যে সেরূপ করিতে পারে না।'

মনুষ্যের আশা ভরসা যে কিছুই নহে—তাহাদের সুখের কাল যে বালির বাঁধের মত ক্ষণভঙ্গুর, তাহাতে আর সন্দেহ কি?—চিরকালই মানব সুখ-আশা করিয়া আসিতেছে—প্রিয়জন লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইতেছে—আমার আমার বলিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতেছে—আবার যখন সেই প্রিয়জনের সহিত চিরবিরহ উপস্থিত হইতেছে, তখনই হাত পা আছাড়িয়া কাঁদিতে বসিতেছে; এই জন্য এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই কোন প্রাচীন কবি বহুকুলায়বিশিষ্ট বৃক্ষের সহিত এই মানব-সঙ্কুল ধরিত্রীর তুলনা দিয়া বলিয়াছিলেন—

"একবৃক্ষসমারূঢ়া নানাপক্ষিবিহঙ্গমাঃ
প্রভাতে দশদিশো যান্তি কা তত্র পরিবেদনা॥"

যুবক প্রচুর জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন—পৃথিবীকে অসার বলিয়া তাঁহার মনে বিশেষ ধারণা ছিল—কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুশোক পাইবার পর যখন সরলার সহিত তাঁহার সম্ভবতঃ চিরপার্থক্য ঘটিল—তিনি তাহাকে চিরকালের মত হারাইলেন, বলিয়া মনে করিলেন—তখনও ত তাঁহার সহস্র সহস্র উপদেশ-বাক্য মনে ছিল, কিন্তু তাহাতে ফল ফলিল কি? তাঁহার শোক দ্বিগুণতর হইয়াছিল—মনের যাতনা আরও বাড়িয়াছিল। তিনি কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, নির্জ্জনে বিলাপে কাটাইতেন, কেহ কথা কহিলে বিরক্ত হইতেন—চিরসুহৃদদিগকেও বিষ বলিয়া বোধ

করিতেন—কেবল ক্ষিপ্তের ন্যায় গৃহের চারিধারে বেড়াইয়া বেড়াইতেন—কথন বা 'ঐ যে সরলা আসিতেছে' বলিয়া একদিকে যাইতেন, আবার নিরাশ হইয়া অন্যদিকে দৌড়াইতেন—তখন তিনি জ্ঞানী হইয়াও অত্যন্ত অজ্ঞানের মত কার্য্য করিতেন, যুবা হইয়াও বালকের ন্যায় রোদনে তৎপর ছিলেন।

যুবকের সেই পূর্ব্বের চঞ্চল প্রকৃতি ও সংসারে বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে কৃষ্ণগোবিন্দ নামে এক নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতিকে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারক করিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, যখন শৌরীন্দ্র-মোহন সংসারে মনোনিবেশ করিবে—সংসারী হইয়া দিন কাটাইবার ইচ্ছা করিবে, তখন তিনি তাহাকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দিবেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর বাড়ী নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর অতি নিকটেই ছিল। চরিত্র বড় উদার—প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না; কখন অজ্ঞানে কাহারও একটী কপর্দ্দক নষ্ট করেন নাই—কখন কাহাকে একটীও কর্কশ-বাক্য কহেন নাই; বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসর হইবে—মুখশ্রী অনিন্দনীয়। বড় কবিতা-প্রিয় লোক ছিলেন; কবিতা লিখিতে, কবিতা পড়িতে বড় ভালবাসিতেন—তখন ত আর আমাদের মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র সেন প্রভৃতি কোন নূতন কবি ছিলেন না, তাই তিনি কবিকঙ্কণ, রামপ্রসাদ সেন, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ইত্যাদি প্রাচীন কবিদিগের গ্রন্থ-পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন—কখন বা নির্জ্জনে বসিয়া গীতগোবিন্দ, রঘুবংশ বা কুমার পাঠে মন নিবিষ্ট করিতেন, আবার কখন বা সেই সকল সংস্কৃতকবিদিগের গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ করিয়া, দশজন বন্ধুর নিকট, তাহার দোষ গুণ বিচারের জন্য পাঠ করিতেন। স্বভাব, আমোদ-প্রিয়—সকলেরই সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেন; দরিদ্র আতুর লোকদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিতেন—কোন লোকের ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদিন মনের আবেগে যুবক তাঁহার অভিভাবককে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন—তিনি যে মনাগুণ হৃদয়ে পুষিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে এরূপ

জলন্ত-শিখায় তাঁহার দেহ ভস্মাবশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল যে, পরিশেষে তিনি আর সে যাতনা সহ্য করিতে পারিলেন না—মনে করিয়াছিলেন, দিবারাত্রি অশ্রুজলসেকে সে অগ্নি নিবাইবেন; কিন্তু তাহা না হইয়া, সেই যন্ত্রণানল আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল—জীবনের ভার আরও অসহ্য হইয়া উঠিল, তাই তিনি আর থাকিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-গোবিন্দ বাবুকে আপনার শোকের কারণ সমস্ত ভাঙ্গিয়া বলিয়াছিলেন।

তুমি লোকের কাছে সকল দুঃখকাহিনী ভাঙ্গিয়া বল—দেখিবে যে, তাহার অনেক উপশম হইয়াছে; যাহারা মনের কষ্ট মনেই রাখে, তাহারাই পরিণামে উন্মাদ হয় অথবা আত্মহত্যা করে—সেই জন্য, শান্তি পাইবার আশায়, যুবক আপনার শোকের কারণ সমস্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সমস্ত শুনিয়া কৃষ্ণগোবিন্দবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—মনে করিলেন, শৌরীন্দ্র এরূপ চরিত্রের লোক নহে যে, সে এক অসৎচরিত্র স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করিবে—তাই তিনি যুবকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "তোমার এ শোক ভুলিতে চেষ্টা কর, বৃথা যাতনাকে মনে স্থান দিও না।"

যুবক কহিলেন, "ইচ্ছাই ত তাহাই—কিন্তু পারিনা যে"

"পারিবে—চেষ্টা করিলেই পারিবে—না হয়, কোন সাধারণ কার্য্যে মনোনিবেশ কর, তোমার অর্থের অভাব নাই, লেখাপড়া জান, তুমি মনে করিলেই ত বড়লোক হইতে পার—অনেক কার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পার।"

যুবক সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

"ভাল, তাহাই যদি তোমার অভিপ্রেত না হয়—দেশ-হিতকর কার্য্যে আপনাকে ব্রতী কর—যাহাতে দেশের মঙ্গল হয়—দেশের উন্নতি হয়, সেই কার্য্যে নিয়ত যত্নশীল থাক—তাহা হইলে অনেক পরিমাণে অতীত ঘটনা ভুলিতে পারিবে।"

যুবক তথাপি অধোবদনে নিরুত্তরে রহিলেন।

তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু হতাশ-হৃদয়ে দুঃখিত-মনে গৃহ হইতে বহির্গত

হইলেন, যাইবার সময় বুঝিলেন, "শোক বড় গুরুতর হইয়াছে—সময় আপনি ভিন্ন কেহই এ রোগের প্রতীকার করিতে পারিবে না।"

দ্বাদশ স্তবক।

অযাচিত বন্ধু।

এইরূপে ত দিন কাটিতে লাগিল, কিন্তু যে ভীষণ শোকে নরেন্দ্রের দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইতেছিল, তাহার উপমশ হইল কই!—সময় ত আপনার দৈনিক কার্য্যগুলি করিতে করিতে সুখ দুঃখে অভিভূত লোকের চিত্তের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু নরেন্দ্রের সেই দারুণ ক্লেশের কিঞ্চিৎমাত্রও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিল কই!—তিনি সামান্য ঐহিক ঘটনায় কাতর হইয়া যে সমস্ত উচ্চ-বাসনা, আমোদ আহ্লাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা আবার সময়ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে ফিরিয়া আসিল কৈ?—লোকে বলে বটে, সময়গুণে কিছুই থাকে না—শোক দুঃখ মানবের নিকট অচিরস্থায়ী বস্তু—কিন্তু নরেন্দ্রের সেই মর্ম্মাহত-হৃদয়ে আমি ত কিছু শান্তির লক্ষণ দেখিতে পাই না—তিনি ত সেই পূর্ব্বেরই মত মনুষ্যমাত্রেরই সম্পর্কে আসিতে অসুখ বোধ করিতেন—সেই ত পূর্ব্বেরই মত নিশ্চেষ্ট হইয়া নতমস্তকে গভীর শোকে মগ্ন থাকিতেন—সেই ত পূর্ব্বেরই মত দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিতেন, "বিধাতার কি অবিচার! অমন নির্দ্দোষী সরলা বালিকার ভাগ্যে এত দুঃখ লিখিতে তিনি কি কষ্ট বোধ করেন নাই; তিনি কি নির্দ্দয়!"—ধর্ম্মভীরু হইয়াও সামান্য শোকে ভুলিয়া সেই দয়াময় ঈশ্বরের কার্য্যের উপর দোষারোপ করিতেন।—কই, সে সকল ভাবের ত কিছুই লাঘব দেখিতে পাই না।

একদিন নরেন্দ্রনাথ সেইরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া চিন্তায় অভিভূত আছেন, এমন সময়ে উচ্চ হাসির সহিত এক উচ্চ রব তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; এক সুন্দর যুবা সামান্য অথচ পরিষ্কার পোশাকে সজ্জিত হইয়া—

"শৌরীন্দ্র বাবু যে, কপাল ভাল—ভাল সময়েই তোমার সঙ্গে দেখা হলো—কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু তোমার সঙ্গে আমাকে আলাপ কর্‌তে বলেছেন—মিলেছে ভাল, আমার নাম ব্রজেন্দ্র আর তোমার নাম শৌরীন্দ্র; না হবে কেন? 'যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ'—ভাবটা বড় জাঁকিয়ে হবে—আলাপ আর নূতন কিছুই কর্‌তে হবে না, অনেক দিনের পর দেখা হলো এই চের—আমাকে চিন্‌তে পারেন ত? পারেন্ বই কি!—তবে বেড়াতে যাবেন বোধ হয়" বলিতে বলিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

নরেন্দ্র তখন বাহিরের সমস্ত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া সরলার বিষয় ভাবিতেছিলেন—তাহার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া চক্ষু-জলে বস্ত্র আর্দ্র করিতেছিলেন; সহসা এরূপ উচ্চ চীৎকার শব্দে তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইল—তিনি বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোন কথা কহিলেন না।

যাহার প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তিনি একটী অষ্টবিংশতি-বর্ষীয় যুবাপুরুষ—অবস্থায় সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। তিনি যদিও সঙ্গীত কি লেখাপড়ায় কি অন্য কোন বিষয়ে অসাধারণ ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন না, তত্রাচ তাঁহার এমন এক ক্ষমতা [illegible] তে [illegible] নাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া [illegible] করে; তিনি মানব-চরিত্র বি[illegible] বুঝিতে পারিতেন—কোন্ লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিলে সে সন্তুষ্ট হয়—কোন্ সময়ে কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে সে বশে আইসে—তাহা তিনি ভালরূপে জানিতেন। বাক্যছটায়, আমোদজনক উপহাসে তিনি লোককে মোহিত করিতে পারিতেন—উপস্থিত-বুদ্ধিও তাঁহার বিলক্ষণ ছিল। সকল কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন, কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলেও সহজে হতাশ হইবার লোক ছিলেন না; ফলতঃ তাঁহার এরূপ কতিপয় গুণ ছিল, যাহাতে তিনি অতি সহজেই লোকের প্রিয়পাত্র হইতে পারিতেন। যদিও তাদৃশ বিদ্বান ছিলেন না, তথাপি সকল প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারেরই নাম তিনি অবগত ছিলেন এবং তাহাদের কথা উঠিলেই, অনায়াসে তাহাদের বিষয়ে এমন দুই চারিটী কথা কহিতে পারিতেন, যাহাতে সকলে মনে করিত, 'ইনি

একজন বহুদর্শী লোক, বহু পুস্তকপাঠে বহু সময় অতিবাহিত করিয়াছেন।' কিন্তু এ সকল গুণ সত্ত্বেও তাঁহার অনেক দোষ ছিল—যে সকল দোষ সহজে মার্জ্জনীয় নহে; তিনি কি আত্মজন কি পরজন সকলেরই প্রতি মায়ামমতাশূন্য ছিলেন; পাপ পুণ্যের বড় বিচার রাখিতেন না, ঈশ্বরের নামে হাসিয়া উঠিতেন, বলিতেন, 'ও সব কথায় মাথা খারাপ করা উচিত নয়, খাও দাও, আমোদ আহ্লাদ কর' এই বাক্যই তাঁহার মুখে সর্ব্বদা শুনা যাইত—কিন্তু উদারপ্রকৃতির গুণে এবং অকপট-ব্যবহারে তাঁহার এ সকল গুরুতর দোষ লোকে বড় ধরিত না।

"মহাশয়, ক্ষমা করিবেন, আমার কাজ আছে" এই বলিয়া যুবক সেই গৃহ হইতে চলিয়া গিয়া অপর এক গৃহে আসিয়া বসিলেন।

ব্রজেন্দ্র তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "ভাল, ভাল, এত ব্যস্তই যদি আপনি, আপনাকে আমি বিরক্ত কর্‌তে চাই না—একখানা চিঠি লিখ্‌ব লিখ্‌ব মনে কর্‌চি, তা আর লেখা হয়ে উঠে না।"—এই বলিয়া নিকট হইতে কাগজ কলম ও দোয়াত লইয়া লিখিতে বসি-[illegible]লোককে বলে [illegible] যেন কতই আবশ্যকীয় পত্র—তাই [illegible] লেখনী চলিতে লাগিল—দে[illegible]দেখিতে চারিখানি পত্র লেখা হইল—কিন্তু সে লেখা এপর্য্যন্ত কেহই পড়িতে পারে নাই।

"এমন অসভ্য বানর ত কোথাও দেখি নাই" এই কথা অস্পষ্ট-ভাবে বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রের আকৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—কিন্তু তাহার সেই উন্নত ললাট, সেই উজ্জ্বল চক্ষু-দ্বয়, সেই সুস্থ ও সবল শরীর, সেই সহাস্য মুখভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে, তিনি সেই অপরিচিত লোকটীকে যে মিষ্ট-সম্ভাষণে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সেই বানরের আকার-গত কোন লক্ষণই তাহার শরীরে নাই।

নরেন্দ্র যখন তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, তখন সে চতুর্থ পত্রটী সমাপ্ত করিয়া (যে সময়ে অন্য লোক এক পৃষ্ঠাও লিখিতে পারে কি না সন্দেহ)—কলম রাখিয়া নরেন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়াছিল—নরেন্দ্র তাহার প্রফুল্ল নয়নে সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি, মুখের সেই আশ্চর্য্য-ভাব দেখিয়া অতি

কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলেন—অনেক দিন কেহ তাঁহাকে হাসিতে দেখে-নাই। "বেশ, বেশ" সেই গৃহের এক পার্শ্বে একটা টেবিলের উপর রাশীকৃত পুস্তক দেখিয়া ব্রজেন্দ্র বলিল, "বেশ, বেশ, পড়াশুনা খুব ভাল বটে, তাতে সময় খুব্ সহজে কাটে; কিন্তু যেমন টাকা পুঁজি করিয়া রাখিলে কোন ফল হয় না, তাহা সৎব্যবহারে খরচ করিলে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে খাটাইলে তবে আমাদের বিশেষ উপকারে আইসে—সেই রকম পড়াশুনাও জানিবে, খালি পড়ে কি হবে—তা থেকে নীতি শিক্ষা করা উচিত, জ্ঞান-লাভ করিতে হয়, নতুবা সে পড়ার কোন ফল নাই—কার্য্য, কার্য্য, শৌরীন্দ্র, কেবল কার্য্য—আর কিছুই নহে; পৃথিবীতে আসিয়া কেবল কার্য্য করিবে—মানুষের সুখ দুঃখ ত আছেই, কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিবে না—সুখ দুঃখ ত সকলেই ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হইয়া কে আপনার কার্য্য ভুলে।"

কথাগুলি নরেন্দ্রের মনে লাগিল, তিনি কহিলেন, "যা বলিলেন মহাশয়—"

"ঐত, আবার মহাশয়! মহাশয় কি? মহাশয়, তবে আমাকে তুমি বন্ধু বলে বিবেচনা করনা—তা হবেনা, মহাশয় কথাটী তোমাকে ছাড়তে হবে—এবার থেকে তুমি গিয়ে আমরা তুই মুই করে কথা বল্‌বো—এখন এসো বেড়াতে যাই—খুব্ খিদে হবে—খুব্ খেতে পার্‌ব—কোন কষ্ট কি মনে রাখ্‌তে আছে—যে আহাম্মক, সেই নিষ্ফল ভাবনা ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে—খাওদাও আমোদ আহ্লাদ কর—এস বেড়াতে যাই!"

"মাপ্ কর, আমার আজ বেড়াতে ইচ্ছা নাই।"

"ইচ্ছা—ইচ্ছা আবার কি?—জামা গায়ে দাও, চাদর নাও, আপনি ইচ্ছা আস্‌বে—চল!"

"শরীর খারাপ, ক্ষমা কর।"

ঐত! একটা না একটা ছুতো আছেই—ক্ষমা কর্‌তে আমি পার্‌ব না—তাহ'লে মরে যাব!"

এই বলিয়া আনূলা হইতে এক খানা চাদর টানিয়া লইয়া ব্রজেন্দ্র-কুমার নরেন্দ্রনাথের গায়ে দিয়া বলিলেন, 'চল।'

নরেন্দ্রনাথ ব্রজেন্দ্রের সরল ব্যবহারে, তাঁহার কথাবার্ত্তায় এরূপ মোহিত হইয়া গেলেন যে, সেরূপ ভাব কখন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই—তিনি অনিচ্ছা-সত্তেও উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অনিচ্ছা-সত্তেও ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; তখন উভয়ে কতদূর অবধি সন্ধ্যার শীতল সমীরণে শরীর স্নিগ্ধ করিয়া কত রাজপথ, কত কর্ষিত-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সহস্র উপদেশে, সহস্র সান্ত্বনা-বাক্যে যাহা হয় নাই, ব্রজেন্দ্রের সহিত একদিন আলাপে, এক দিনের কথাবার্ত্তায়, নরেন্দ্রের সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল—তিনি চিরকালই অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন, কখনও অপরকে আপনার উপর প্রভুত্ব খাটাইতে দিতেন না—কিন্তু ব্রজেন্দ্রের সেই কতিপয় মুহূর্ত্তের অমায়িক ভাব ও সুন্দর বাক্যগুলি তাঁহার সেইরূপ স্বভাবের উপরেও প্রাধান্য খাটাইয়াছিল—আবার সেই দিন হইতে তাঁহার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

ঈশ্বর-প্রেম পুনরায় তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল; একরাত্রি তিনি নির্জ্জনে নেত্রজল ফেলিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রভো! দয়াময়! তোমার ইচ্ছা কি বুঝিব! সামান্য পার্থিব-দুঃখে অভিভূত হইয়া আমি তোমার পবিত্র নামে কত কলঙ্ক দিয়াছি, তোমার প্রতি কত কর্কশ-বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। ইচ্ছাময়! তোমার কার্য্য এ অধম কি বুঝিবে! যাহা মহা মহা যোগীগণ বুঝিতে পারেন নাই, মায়া-মোহ-বদ্ধ অন্ধ মানব তাহা কি বুঝিতে পারে! যেমন মানব-হস্তনির্ম্মিত বস্তু তাহার নির্ম্মাতার মর্ম্ম বুঝে না—তেমনই তোমারই সৃজিত মানব তাহার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য সেই তোমার অনন্ত মহিমা কি জানিবে! তুমি শান্তিময়, জীবের সুখের নিমিত্ত যাহা করিতেছ, ভ্রান্ত নর, মোহাচ্ছন্ন-নেত্রে তাহা দেখিতে না পাইয়া—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেই সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হৃদয়ে সে মাহাত্ম্যের ধারণা করিতে না পারিয়া, তোমার মঙ্গলের কার্য্যকে অহিতকর বলে—তোমাকে অবিচারক ও নির্দ্দয় নামে অভিহিত করে। তোমার করুণা সমস্ত জগতে কীর্ত্তিত হউক—সমস্ত জগৎবাসী সমস্বরে

তোমার জয় ঘোষণা করুক; আমার হিতের জন্য যাহা করিতেছেন, তাহাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি! —সকলের প্রতি তোমার অসীম কৃপা ভাবিয়া যেন তাহাতেই আমি সুখী হইতে চেষ্টা করি! আর যেন এ পাপ-মুখ কখন তোমার নিন্দাবাদ না করে —আর যেন এ রসনা তোমার পবিত্র নামে দোষারোপ করিয়া কলঙ্কিত না হয়। নাথ! কৃপা করিয়া তোমার এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা কর।”

অতি অল্পদিনের মধ্যেই সেই অমায়িক ব্রজেন্দ্রকুমার নরেন্দ্রনাথের একমাত্র হৃদয়ের বন্ধু রূপে পরিগণিত হইলেন।

ত্রয়োদশ স্তবক।

মুঙ্গের।

“নানা স্থানে বেড়ান, নানা দেশ দেখা, নানা লোকের সহিত পরিচিত হওয়া,—প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া চিত্ত প্রফুল্ল করিবার ইচ্ছা,” বাল্যকাল হইতেই ব্রজেন্দ্রকুমারের হৃদয়ে পোষিত ছিল; কিন্তু অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না বলিয়া, এতদিন অবধি সে ইচ্ছা সফল হয় নাই। বিধাতা যদি এত দিনের পর সদয় হইলেন —যদি তিনি নরেন্দ্রনাথের ন্যায় একজন ধনাঢ্য লোকের সাহায্য পাইলেন, তবে কেন আর সে সুবিধা ত্যাগ করিবেন। একদিন মধ্যাহ্নে যখন উভয়ে একটী নির্জ্জন গৃহে বসিয়া নানারূপ কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন, ব্রজেন্দ্রকুমার কথায় কথায় বলিলেন, “এরূপে একস্থানে থাকিয়া জীবনের সারাংশ বৃথা নষ্ট করা উচিত হয় না। এখন আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের সময়, নানাদেশের নানারূপ ঘটনা দেখিয়া শিক্ষা করা উচিত। আমরা পৃথিবীর বিষয় কিছুই দেখি নাই এবং কিছুই বুঝি না; তাই বলিতেছি, কল্য আপাততঃ মুঙ্গেরে যাওয়া যাক্; সেখানে দেখিবার অনেক বস্তু আছে—পীরপাহাড় আছে, সীতাকুণ্ড আছে। দেখিয়া শুনিয়া অনেক নূতন বিষয় শিখিতে পারিবে—স্বভাবের নূতন নূতন পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক সন্তোষ লাভ করিবে।”

একে নরেন্দ্রনাথ চিত্তের শান্তির নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই স্থান পরিবর্ত্তনে ইচ্ছুক ছিলেন, তাহাতে আবার ব্রজেন্দ্রকুমার সেই বিষয়ে অনুমোদন করিলেন; সেই কারণ, তিনি অবিলম্বে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এক্ষণে কেবল কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুর সম্মতির অপেক্ষা—তা তাঁহাকে বলিবামাত্রই তিনি কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহাদিগের যাত্রা-বিষয়ে উদ্যোগী হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু জানিতেন, যদি এ কথায় তিনি সম্মত না হন, তাহা হইলে নির্জ্জনে থাকিয়া শৌরীন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস আবার ফিরিয়া আসিতে পারে। যাইবার দিন স্থির হইল—পুরোহিত মহাশয় আসিয়া যাত্রার জন্য শুভ লগ্ন দেখিয়া দিলেন। উভয়ে সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী এবং রামচরণ নামক এক পুরাতন ভৃত্য সহিতে মুঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

মুঙ্গের কলিকাতার মত আজ কালের সহর নহে; বহুকাল অবধি মুঙ্গের প্রসিদ্ধ। মুসলমানদের পতনের সময়ে ইহা একটী বিখ্যাত সহর ছিল—যখন বাঙ্গালার নবাব মীরকাসেম মুরশিদাবাদ হইতে এই নগরে রাজধানী উঠাইয়া আনেন, তখন যে ইহা একটী সমৃদ্ধি সম্পন্ন নগর ছিল, তাহা বলা কেবল বাহুল্য মাত্র! তখন ধনকুবের প্রসিদ্ধ জগৎশেঠের বংশ এই সহরে বন্দীভাবে বাস করিতেন—অনেক ধনাঢ্য লোকে এই নগর তখন পরিপুরিত ছিল; তবে এখন ততদূর উন্নত অবস্থা থাকুক বা না থাকুক, মুঙ্গেরের অবস্থা এখনও নিতান্ত হীন নহে। মুঙ্গেরের দুর্গ এবং যেখানে মীরকাসেমের প্রসিদ্ধ আর্ম্মাণীয় সেনাপতি গুরগণ খাঁর গোলাগুলির কারখানা ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে; মুঙ্গেরের দেশী বন্দুক এখনও সর্ব্বত্র বিখ্যাত। মুঙ্গেরের পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার উত্তর পার্শ্ব দিয়া স্রোতস্বতী গঙ্গা বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া কল কল নিনাদে প্রবাহিত হইতেছে—উপরে কত সুন্দর সুন্দর জলযান গুলি ভাসিয়া যাইতেছে। তীরে নদীর কূল-সমীপে কত সুন্দর সুন্দর সৌধমালা—নদীর ধারে ধারে অন্তর অন্তর কত অবতরণ-ঘাট স্নানার্থে নির্ম্মিত রহিয়াছে। বাস্তবিকই মুঙ্গের একটী রমণীয় স্থলের মধ্যে গণ্য—যদিও এখানে দেখিয়া মোহিত হইবার

বস্তু তেমন কিছুই নাই, তত্রাচ স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং তাহার মনোহারী শোভাতে সকলেরই মন সহজে আকৃষ্ট হয়। তবে তাই বলিয়াই কি, মুঙ্গেরে ক্রমাগত সুধাধৌত গৃহের সারি, তাহা নহে; কলিকাতার মত এখানে সকল প্রকারেরই ঘর দেখিতে পাওয়া যায়; একদিকে যেমন দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা শ্রেণী, অপর দিকে তেমনই অপরিষ্কার ও জঘন্য খড়ের বা খোলার ঘরের সারি—দিনান্তে পরিশ্রমের পর দীন দরিদ্র শ্রমজীবি লোকেরা সেই গৃহে আসিয়া রাজার ন্যায় সুখে বিশ্রাম করে।

ব্রজদুর্ল্লভ বাবু একজন উচ্চমনা লোক; তিনি যদিও রীতিমত কোন সমাজভুক্ত ছিলেন না, তথাপি স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনা যাইত—তিনি ঐ সকল বিষয়ের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের যদিও প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, তথাপি আপনার দ্বিতীয়-পক্ষের যোড়শবর্ষীয়া রূপবতী ও গুণবতী সহধর্ম্মিণী বসন্তকুমারীকে জন-সমাজে বাহির করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বলিতেন, "ধর্ম্মবল একটা স্বতন্ত্র বস্তু; ইহা যাহার আছে, সে সহস্র প্রলোভন, সহস্র বিপদ্ নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইতে পারে। যাহার ইহা নাই—যে, ধর্ম্মকে, সতীত্বকে তুচ্ছ পদার্থ বলিয়া ভাবে, তাহাকে যতই কেন অবরোধে রাখ না, সে তাহারই ভিতর হইতে আপনার পাপ-অভিলাষ পূর্ণ করিবে।"—সেইজন্য তিনি অবরোধ-প্রথার বড়ই বিরোধী ছিলেন; এবং সেই জন্যই আপনার স্ত্রীকে যথেচ্ছা স্বাধীন ভাবে বেড়াইতে নিষেধ করিতেন না; কিন্তু তাই বলিয়াই কি, তাঁহার হৃদয় একেবারে ঈর্ষা বা সন্দেহ শূন্য ছিল!—তাহা নহে।

একটী সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা—তাহার চারিধারে নানা দেশের নানারূপ ফল ফুলের গাছে পরিপূর্ণ সুন্দর উদ্যান;—তাহাই ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বসত বাটী। পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ী কোথায় ছিল, জানি না; কিন্তু এক্ষণে আপনার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি লইয়া এখানে বাস করিতেছেন। বিধাতার ইচ্ছায় তিনি সর্ব্বগুণে ভূষিতা রমণী-রত্ন পাইয়াছেন; যেমন হীরকের মধ্যে কহিনুর, তেমনই রমণীকুলের মধ্যে বসন্তকুমারীও একটী উজ্জ্বল রত্ন।

তাঁহার স্বামী যদিও তাঁহা অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় এবং দেখিতে অত্যন্ত কুৎসিত, তথাপি তিনি কখন তাঁহাকে একদিনের জন্য অনাদর করেন নাই। মানব জাতির স্বাভাবিক দুর্ব্বল হৃদয় যে তাঁহার ছিল না, এমন কথা আমি বলি না; কিন্তু যখনই তাঁহার মন কোন কুপথের দিকে যাইত, প্রভূত অমানুষিক ক্ষমতা বলে তিনি তাহার বেগ ফিরাইয়া আনিতে পারিতেন। তিনি ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদা আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়কে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেন, এবং বিধাতা ও তাঁহার সেই প্রার্থনাটী পূরণ করিয়াছিলেন। এরূপ সুন্দরী রমণী এবং গুরূপ অতুল সম্পত্তি থাকিলে পৃথিবীতে কেনা আপনাকে সুখী বিবেচনা করে—তাই ব্রজদুর্ল্লভ বাবুও আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিতেন।

আজ ব্রজদুর্ল্লভ বাবুর বাড়ীতে মহা সমারোহ; প্রায় প্রতি মাসেই বসন্তকুমারী একবার না একবার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত একত্রিত হইয়া আমোদপ্রমোদ করিতেন। আজ ও তাহারাই একদিন; মুঙ্গেরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—তাঁহারা একে একে সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। বসন্তকুমারী সকলেরই সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছেন; কেহই বলিতে পারেন না যে, আমাকে উপেক্ষা করা হইল। তাঁহাদের মধ্যে দেওয়ান শিউশরণ লাল—একজন করদ রাজার প্রধান কর্ম্মচারী, বড় বাঙ্গালী ঘেঁষালোক; তিনি এবং ভবশঙ্কর বাবু (যিনি বহু দিবস হইল, স্বাস্থ্যের অনুরোধে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে বাস করিতেছেন), ইঁহারাই প্রধান।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ব্রজদুর্ল্লভ বাবু ইহাতে যোগ দেন নাই; একে তাঁহার শরীর অসুস্থ, তাহাতে আবার এ সকল দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার মনে ঈর্ষার উদয় হয়—কাজেই এ সকল তিনি চক্ষে দেখিতে অসহ্য বোধ করিতেন।

"আপনার স্বামীর যে পীড়ার কথা শুনিয়াছিলাম; তিনি কেমন আছেন?—তাঁহাকে যে দেখিতে পাইতেছি না," ভবশঙ্কর বাবু এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"এখানকার ডাক্তার বাবু বলিয়াছেন যে, প্রাতে ও অপরাহ্নে ক্রোশ দুই তিন করিয়া বেড়াইলে তবে এ পীড়ার শান্তি হইতে পারে—কেবল বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু এবং অঙ্গ-চালনার অভাবেই উনি আপনার শরীর এরূপ অসুস্থ করিয়া তুলিয়াছেন।" বলিলে ত শুনেন না, আজ মোটে একবার ও বেড়াইতে যান নাই।"

"না না, সে ভাল নহে ; অঙ্গ চালনা যতই অধিক করা যায়, ততই শরীরের স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। এবার হইতে আপনি না হয় ব্রজ বাবুকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইতে যাইবেন," দেওয়ান শিউশরণ লাল এই উত্তর দিলেন।

"অবশ্য, সে বিষয়ে আমার যত্নের কোন ত্রুটী হইবে না—কিন্তু উনি কে?—যিনি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।"

দ্বারের নিকটে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিয়া ভবশঙ্কর বাবু বলিলেন, "উঁহাকে আপনি চিনেন না, উনি সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। দিনকয়েক হইল, উঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতি অমায়িক লোক—যেমন দেখিতে সুন্দর, গুণেও তেমনই। বাড়ী শিয়ালদহে—একজন সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য জমীদারের একমাত্র সন্তান। বোধ হয়, আপনাদের নাম শুনিয়া আলাপ করিতে আসিয়াছেন। অপরিচিত লোক নাকি, তাই সাহস করিয়া আসিতে পারিতেছেন না।"

"ঠিক্ বলিয়াছেন ভবশঙ্কর বাবু! আহা ও মুখে প্রতিভার চিহ্ন জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, ওরূপ গম্ভীর সতেজ মুখ আমি কখন দেখি নাই।"—

ভবশঙ্কর বাবু উঠিয়া গিয়া অর্দ্ধ-লজ্জিত নরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিলেন, "ইঁহার বাড়ীর অতি নিকটেই আমার বাড়ী—ইঁহার পিতার সহিত আমার কথঞ্চিৎ আলাপ পরিচয় ছিল; তিনি সম্প্রতি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, ইনি এখন অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন—ইঁহার নাম শৌরীন্দ্রমোহন,"—এই বলিয়া ভবশঙ্কর বাবু বসন্তকুমারীর নিকটে তাঁহাকে পরিচিত করিলেন।

"ভাল, ভাল, কেহই একেবারে সকলের সহিত পরিচিত হয় না—আপনি দাঁড়াইয়া কেন? বসুন না।"

নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইলে, বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, আপনি কত কাল ধরিয়া এরূপ দেশে দেশে বেড়াইতেছেন।"

"কত কাল আর কি! প্রায় চারি পাঁচ বৎসর হইবে; বহুদেশ বহুস্থান দেখিয়াছি।"

"তবে আপনি নাগা সন্ন্যাসীদের মত অনেক জায়গায় বেড়িয়েছেন। সত্য কথা বলিতে কি, আপনার এত বেড়ান শুনে আমার হিংসা হচ্চে।"

"নাগা সন্ন্যাসীরা বেড়ায় বটে—এমন তীর্থস্থান নাই, এমন সহর নাই, যেখানে তারা যায় না, কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই ভিক্ষাই উদ্দেশ্য। শুধু দেশ দেখে আপনার মন সন্তুষ্ট করিয়া আর কি হইতে পারে! তাহা হইতে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই জ্ঞান পৃথিবীর উপকারে আনা উচিত।"

ইতিমধ্যে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা কেহ বিদায় লইয়া বাড়ী গেলেন; কেহ বা সেই সুন্দর উদ্যানে পুষ্প-সৌরভে আমোদিত হইতে লাগিলেন; কেহ কেহ বা দুই তিন জনে মিলিয়া বাহিরে অনাবৃত স্থলে দাঁড়াইয়া নানা বাজে কথায় মনোনিবেশ করিলেন। ভবশঙ্করও শিউশরণ লাল, নরেন্দ্রনাথের সহিত বসন্তকুমারী পরিচিত হইবার অব্যবহিত পরেই চলিয়া গিয়াছিলেন।

এমন সময়, "উঁ-হু ভাল কথা নয়, নির্জ্জনে দুজনে একলা, ভাল কথা নয়—সন্দেহ হয়—বড়ই সন্দেহ হয়," এই কথা সহসা নরেন্দ্রনাথের পশ্চাদ্দেশে জোরে উচ্চারিত হওয়ায়, তিনি চমকিত হইয়া উঠিলেন।

বসন্তকুমারী চারিধারে চাহিয়া অবশেষে হাসিয়া বলিলেন, "উনি অপর কেহই নহেন, আমার স্বামী; আসুন, উঁহার সহিত আপনাকে পরিচিত করিয়া দিই।"

সৌরীন্দ্রমোহন সত্বরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্রজদুর্ল্লভ বাবুকে অভিবাদন করিলেন।

"আপনার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম—কতদিন হইল মুঙ্গেরে আসিয়াছেন?"

"বেশী দিন নয়, এই দশ বার দিন হইবে?"

"হুঁ-হুঁ, সন্দেহের কথা বটে; রাত্রি অধিক হইয়াছে—আপনার আর অধিক ক্লেশের প্রয়োজন নাই—আর একদিন যেন দেখা হয়—সন্দেহ হতেই পারে।"

নরেন্দ্রনাথ, ব্রজদুর্লভ বাবুর আলাপেই একেবারে অবাক্—এমন নূতনতর আলাপ ত তাঁহার সহিত কেহ কখন আর করে নাই। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া আপনার বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। আসিবার সময় বসন্তকুমারী বলিলেন, "আপনি মুঙ্গেরের কিছুই দেখেন নাই, আগামী রবিবারে আসিবেন, পীরপাহাড় ও সীতাকুণ্ড দেখিয়া আসিব।"

চতুর্দ্দশ স্তবক।

পীরপাহাড়—সীতাকুণ্ড।

রবিবার আসিল। ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথ একবার ব্রজদুর্লভ বাবুর বাড়ী গিয়া ব্রজেন্দ্রের সঙ্গে বসন্তকুমারী এবং তাঁহার স্বামীকে পরিচিত করিয়াছিলেন; কাজেই পুনরায় বসন্তকুমারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আপনারা উভয়েই রবিবারে প্রাতে আমার এখানে উপস্থিত হইবেন; পীরপাহাড়ের দিকে বেড়াইতে যাইব।'

দুইটী সজ্জিত অশ্ব এবং একখানি একাগাড়ী আসিয়া ব্রজদুর্লভ বাবুর দ্বারের নিকট রবিবার প্রাতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। অশ্ব দুইটী নরেন্দ্রনাথ ও ব্রজেন্দ্রকুমারের এবং একাখানি বসন্তকুমারীর জন্য; বাঙ্গালীর মেয়ে কাজেই তিনি ত আর অশ্ব বিদ্যায় পারদর্শী নহেন যে, ইংরাজ বিবীদিগের মত বায়ুভরে গিরিনদী অতিক্রম করিয়া যাইবেন। বেড়াইতে যাইবার সময় ব্রজদুর্লভ বাবুকে ও অনেক জিদ্ করা হইল, তিনি পীড়ার ভাণ করিয়া বাড়ীতে রহিলেন।

মুঙ্গেরের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে সীতাকুণ্ড; সেই দীর্ঘপথের অধিকাংশই পতিত ভূমির উপর দিয়া—রেল একটী যে সুন্দর সমতল পাকারাস্তা, তাহা তখন ছিল না। সেই পথ ধরিয়া তাঁহারা চলিলেন। সর্ব্ব প্রথমে এক্কাগাড়ী খানি এক প্রকার অশ্রুতপূর্ব্ব ঝন্ ঝন্ শব্দ উৎপাদন করিয়া এক অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত কঙ্কালাবশিষ্ট ঘোটকের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ধীর-গমনে চলিতে লাগিল—কাজেই নরেন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রকুমারকে প্রায় সংযত-রশ্মিতে ধীর-মন্থর-গমনে বসন্তকুমারীর পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতে হইল। অতদূর পথ নিঃশব্দে একটী ও কথা না কহিয়া যাওয়া বড় কষ্ট-সাধ্য; তাহাতে আবার চারিধারে প্রকৃতি হাসিতেছে—নানা ধরণের, স্বভাবের নানা সুন্দর ছবি দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, "আচ্ছা ব্রজেন্দ্র, চারিধারে স্বভাবের এই সুন্দর সুন্দর খেলাগুলি দেখিয়া তোমার ভাব-সমুদ্র উথলিয়া উঠে কি না?"

"না ভাই, মাপ্ কর—আমার ক্ষুদ্র উদরে ভাবের সমুদ্রকে কোথায় স্থান দিব; খাজা গজা হ'ত না হয় কোন মতে উদরসাৎ করা যাইত।"

"না হে, তামাসা নহে; বাস্তবিকই কি তোমার কখন কবিতা-রচনা আইসে না?"

সেই শয়ানমান এক্কাখানির অভ্যন্তর হইতে বসন্তকুমারী বলিলেন, "আসিবে না কেন? বিলক্ষণ আসে; এই সেদিন ব্রজেন্দ্র বাবু আমাকে যে দুইটী কবিতা শুনান, তাহা অতি মধুর। শুনিয়াছি, সে দুইটী না কি উনি নিজে রচনা করিয়াছেন; দুর্ভাগ্যক্রমে মনে পড়িতেছে না; মনে পড়িলে আমি এখনই বলিয়া দিতাম।"

"এ আপনার মিথ্যা কথা; এরূপ উপহাসে একজন ভদ্র-সন্তানকে একেবারে মাটী ক'রে দেওয়া কি ভাল! তবে হাঁ, ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি যে, কিছু কিছু আসে বটে; দোহাই বলিতেছি, যখন আমি আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে থাকি, তখন হাতে বাড়ি, ঢেঁকি বক্তী, যাচ্ছেন বাবু গুড়ি গুড়ি সঙ্গে চলেছে মামা, ক'রে মাথায় মামা—এমন কত কবিতা লিখিতে পারি।"

"বাঃ! বাঃ! তবেত তোমার পদ্য-রচনায় বেশ একটী ক্ষমতা আছে," এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমারী উচ্চহাসি হাসিয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রায় মধ্যাহ্নের তপন মাথায় করিয়া, একা-চালক একাখানিকে সশরীরে পাহাড়ের পদতলে আনিয়া উপস্থিত করিল।

দূর হইতে পাহাড় পর্ব্বতের শোভা বড়ই সুন্দর। বহুদূর হইতে দেখ, দেখিবে, যেন একখানি অস্পষ্ট নীল মেঘখণ্ড গগণ-প্রান্তে পৃথিবী-তল হইতে উপরে উঠিয়াছে; ক্রমে যতই নিকটে যাইবে, ততই তাহা ক্ষীণ নীল হইতে গাঢ়তর ধারণ করিবে, এবং ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ আকারে পরিণত হইবে; আর ও অগ্রসর হও, সেই পর্ব্বতের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড তাহাদিগের উপর-জাত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বৃক্ষ গুল্মাদির সহিত তোমার দৃষ্টি-পথের পথিক হইবে। পরিশেষে দেখিবে যে, অসংখ্য প্রস্তর-স্তূপ উপরি উপরি রাশীকৃত ভাবে স্থাপিত হইয়া, কেহ বা একেবারে কেহ বা থাকে থাকে গগণকে উপহাস করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

মুঙ্গের হইতে পূর্ব্বভাগে যে একখানি ক্ষীণ মেঘ-ছায়া গগণ-প্রান্তে শোভা পায়, সেই স্থির মেঘখানি লক্ষ্য করিয়া যাও, অবশেষে পীর-পাহাড়ের তলদেশে আসিয়া উপস্থিত হইবে। উপরে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মলতার ঝোপ; আরও উপরে ঘন নিবিড় জঙ্গল---দরিদ্র লোকেরা সেই সকল বন কাটিয়া আপনাদের জ্বালানিকাষ্ঠ এবং জীবিকা নির্ব্বাহ করে। নীচে গভীর পরিখা; কিন্তু উচ্চে একখণ্ড পরিষ্কৃত ভূমি— তাহারই উপর সীতাকুণ্ড নামক প্রস্রবণ; চারিধার প্রস্তরে বাঁধান, প্রায় তিন হস্ত উচ্চ—নিয়ত জলরাশি ফুটিতেছে—তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র-পথে সলিলরাশি পাহাড়ের গাত্রবাহী খাল দিয়া সেই পরিখায় আসিয়া পড়িতেছে। প্রবাদ আছে, এইখানে রামচন্দ্রের আনন্দদায়িনী সীতা-দেবী এই কুণ্ডের জলে স্নান করিয়াছিলেন, সেইজন্য সেই অবধি ইহা একটী তীর্থরূপে পরিগণিত; সেই কুণ্ডের চারি পার্শ্বে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ও উপরে নীচে অসংখ্য গুহা—সেই সকল স্থানে নিরাশ্রয় সন্ন্যাসীরা বাস করে। সীতাকুণ্ড হইতে কিয়দ্দূরে ঐ পাহাড়ের

উপরে এক পীরের মন্দির (যাহা হইতে ঐ পাহাড়ের নাম পীরপাহাড়) আছে, সেখানে অসংখ্য ফকীরের বাস; নিয়ত নাগারার বাদ্যে কাণ পাতা ভার। ফলে, বৎসর বৎসর অনেক হিন্দু মুসলমান যাত্রী আপনাপন পুণ্য-স্থান মনে করিয়া পীড়পাহাড় দেখিতে আইসে। যেমন কালীঘাটে, তেমনই সীতাকুণ্ডে কাঙ্গালীর অভাব নাই; 'বাবা একঠো পয়সা—বাবা একঠো পয়সা' বলিয়া অসংখ্য লোক যাত্রীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

সীতাকুণ্ডের দেখাদেখি রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, আদি অসংখ্য কৃত্রিম কুণ্ড, পয়সা পাইবার উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছে। যাইবার পথে, পাহাড়-তল হইতে কিয়দ্দূরে কতকগুলি চটী ও একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে, সেখানে ফুল, ফুলের মালা, আরও অন্যান্য অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়। প্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ঐ পাহাড়ের উপরে ইংরাজী-ধরণে একখানি দ্বিতল গৃহ নির্ম্মাণ করেন—তাহার চারিধার, প্রাচীর ও খালে বেষ্টিত; সেই খালের উপর সাঁকো—মধ্যে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফলবৃক্ষের সারি; অনেক ভদ্রলোক সময়ে সময়ে আসিয়া এখানে বাস করেন।

তাঁহারা তিনজনে যেই, সেই পাহাড়ের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিলেন, অমনি চারিধারে তাঁহাদিগকে তীর্থযাত্রী মনে করিয়া পাণ্ডারা ঘেরিল; অতি কষ্টে তাহাদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া তাঁহারা সেই পর্ব্বত-গাত্রবাহী একটী ক্ষুদ্র পথ দিয়া উঠিতে লাগিলেন। বলিতে হইবে না যে, অশ্ব-রক্ষকেরা সঙ্গে গিয়াছিল, তাহারা অশ্বের রক্ষণে নিযুক্ত রহিল; এক্কা-চালক অশ্বকে মাঠে ঘাস খাইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া, তাড়িখানার সন্ধানে গেল। উঁহারাও তিনজনে ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ের গা দিয়া উঠিতে লাগিলেন—সীতাকুণ্ডের জল পরীক্ষা করিয়া আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন; চারি-ধারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজী-মধ্যে সেই ক্ষুদ্র পথ; তাঁহারা তিনজনে দৃঢ়পদে সেই পথ দিয়া উঠিতে লাগিলেন; ব্রজেন্দ্র ব্যস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন—বসন্তকুমারী ও নরেন্দ্রনাথ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন।

তখন দুইজনের নানাবিধ গল্প চলিতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতবর্ষের কথা পাড়িলেন—তখনকার রাজারা কি ভাবে রাজ্য-

শাসন করিতেন, প্রজাদিগের উপর কেমন স্নেহ মমতা করিতেন, কেমন তাহাদের সুখ সমৃদ্ধির উপর দৃষ্টিপাত করিতেন। রামচন্দ্রের ন্যায় কত রাজা, প্রজার সুখের জন্য আপনার রাজ্য এমন কি পত্নী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—সেই সকল কথা বলিতে বলিতে চলিলেন; অবশেষে বলিলেন, "তখনকার অপেক্ষা এখনকার সমাজের অবস্থা অনেক বিভিন্ন।"

বসন্তকুমারী বলিলেন, "কোন্ কোন্ বিষয়ে এখনকার সমাজের আপনি অবনতি বিবেচনা করেন!"

"কেন! এই দেখুন না, বিবাহ; কাণা হউক, খোঁড়া হউক, বৃদ্ধ হউক বা কুৎসিত হউক—কন্যা বহু অর্থের অধিকারিণী হইবে, এই লোভে কত-লোক আপনার মেয়েকে চিরজীবন অসুখী করিতেছে।"

"তা বটে, কিন্তু আমাদের দেশে এমন বয়সে বালিকাদের বিবাহ হয় যে, সে বয়সে তাহাদের পতি মনোনীত করিবার ক্ষমতা থাকে না; সেই জন্যই তাহাদের পিতামাতার দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়।"

"কিন্তু পিতামাতার ত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে তাঁহারা তাহাদের কন্যাকে কতদূর অবধি অসুখী করিলেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে এক প্রকার ভাল ছিল, তখন কন্যা বয়স্থা হইলেই স্বয়ম্বরা হইত—কাজেই মনোমত স্বামী পাইতে তাহাদের কোন কষ্ট হইত না।"

"কিন্তু যাই বলুন, এত বিঘ্নস্বত্বেও আমাদের দেশের মত সতী স্ত্রী কোন দেশেই নাই; এই দেখুন না, কত অসংখ্য অসংখ্য রমণী স্বামীর মৃত্যু বা কোন বিপদ্‌পাতে অনায়াসে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে উপহাস করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে।—সহমরণ প্রথাও ত আপনি জানেন!"

"আমি অবশ্য স্বীকার করিতেছি যে, এ সকল প্রতিবন্ধকের জন্য এদেশে সতী স্ত্রী যে একেবারে বিরল, তাহা নহে; তবে আপনি যে সহমরণের কথা বলিলেন—তা কয়জন স্বইচ্ছায় জলন্ত চিতায় পুড়িয়া মরিয়াছে; তখনকার সকল আত্মীয় কুটুম্বই—এমন কি পিতামাতা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেই বিষয়ের জন্য উত্তেজিত করিত।"

"সত্য বটে! আপনি যা বলিলেন, সকলই সত্য বটে; কিন্তু সে অসন্তোষের জন্য কি চিরজীবন পাপপঙ্কে মগ্ন করা উচিত; বিধাতা আমাদিগকে ধৈর্য্যগুণ দিয়াছেন, তাহারই বলে সকল ক্লেশ সহ্য করিব—ভবিষ্যত্যের লিখন বলিয়া তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। মনের অভিলাষ কি এ সংসারে সকলেরই পূরণ হয়—কিন্তু তাহাতে অসুখী হইয়া কোন ফল নাই।"—তখন নরেন্দ্রনাথের সেই সুন্দর মুখখানি তাঁহার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্র চমকিত হইয়া বসন্তকুমারীর প্রতি চাহিলেন; আর বসন্ত কুমারী, আপনার অর্দ্ধবয়স্ক, অসামাজিক, শীর্ণকায় স্বামীর সহিত সেই পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দর, মিষ্টভাষী, সুস্থশরীর যুবকের বৈষম্য দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ব্রজেন্দ্রকুমার তখন উপরে একখানি শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া তাঁহাদের অপেক্ষায় ছিলেন; তাঁহারা উভয়ে নীরবে তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলে, বলিলেন, "তবু ভাল, যে আসা হ'ল; আমার মনে হয়েছিল, বুঝি আমায় ফেলে অমনি অমনি পালালেন।"

বসন্তকুমারী হাসিয়া বলিলেন, "তাও কি কখন হতে পারে। আর দেখুন, ব্রজেন্দ্রবাবু! নরেন্ বাবু, আমাদের সে কালের স্বয়ম্বর-প্রথার বড় পক্ষপাতী—পথে সে বিষয়ের অনেক কথা হচ্ছিল।"

"হবেই ত! নিজে আইবড় কার্ত্তিক—এতটা বয়স হ'ল, এখন ও বিয়ে হ'ল না—কাজেই সে প্রথাটা যদি আজ কাল চলিত থাকৃত, তা হ'লে চাই কি কপালে একটা জুটলে ও জুটতে পারত।"

"আর আপনি—আপনার ও ত বিবাহ হয় নি," মৃদুহাস্যের সহিত বসন্তকুমারী এই উত্তর দিলেন।

"হয় নি—প্রত্যাশা ও রাখিনি। কপালে যা কখন ঘটবে না, তা আর ঘটায় কে! 'কুআশা নৈব কর্ত্তব্যা'—জানেনই ত।"

তখন সকলে একটা ঘন-পল্লব বৃক্ষতলে বসিয়া কত কথাই কহিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ স্তবক।

মনোমালিন্য।

বিষম সমস্যার কথা; ব্রজদুর্লভ বাবুর বাড়ীতে আজ বড় বাক্‌যুদ্ধের ধূম লাগিয়াছে। যেমন নিয়ম, তেমনই এমাসে ও বন্ধুবান্ধবেরা নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ একি? কোন কারণ নাই, তবু শিউশরণ বাবুর আজ বঙ্গ-সমাজের প্রতি এত ভীষণ আক্রমণ কেন?—ব্রজেন্দ্র ও ছোড়্‌নেওলা নয়, তাঁহার সহিত কোমর বাঁধিয়া তর্কে মাতিয়াছে।

শিউশরণ লাল বলিলেন, "ছি! ছি! বড় লজ্জার কথা; আপনাদের সমাজ অতি জঘন্য; আপনাদের স্ত্রীলোকদের একটু ও লজ্জা নাই—বড়ই স্বাধীনতা-প্রয়াসী। আর যে সকল কুৎসিত কাণ্ড আপনাদের জাতের মধ্যে ঘটে—তা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়—ছি! ছি!"

ব্রজেন্দ্রকুমার বলিলেন, "বটেই ত! আমাদের সব খারাপ, আর আপনাদের সব ভাল, না! কেন আর জ্বালান্! আমাদের জাতের দোষ এই—যে দোষী হয়, তাকে শাসনে রাখ্‌তে চায়; আপনাদের তা নয়, হচ্চে হতে দাও—ঢাক্‌বার চেষ্টা কর, কাজেই ততটা বাইরে যেতে পায় না। আর স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা যদি বলেন, তা দিলে সবাই রাজী।"

শিউশরণ বাবু রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, "কি বলিলেন! যে বংশে পদ্মিনীর মত কত অসংখ্য সাধ্বী স্ত্রীলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে—সেই জাতিকে আপনি অসতী বলিয়া নিন্দা করিলেন। বঙ্গীয় রমণী আবার কোন্ কালে সতীত্বের জন্য বিখ্যাত!"

"বঙ্গে তেমন কোন ভয়ানক কাল আসে নাই বলিয়া—যদি আসিত, তাহা হইলে বঙ্গীয় রমণীরা ও দেখাইতে পারিত; পূর্ব্বে ও কত স্ত্রীলোক হাসিতে হাসিতে সহমরণে গিয়াছে; আর পদ্মিনী প্রভৃতিরা ও আপনার জাতীয়া নহেন—তাঁহারা রাজপুতানী ছিলেন; তা সেই রাজপুতনাই কি এখন আর পূর্ব্বের রাজপুতনা আছে!"

"আপনার বঙ্গীয় রমণীর সতীত্বের প্রমাণ আপনারই সম্মুখে—আর বঙ্গীয় পুরুষের নির্ম্মল চরিত্রের প্রমাণ আপনারা," এই বলিয়া শিউশরণ লাল সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন—তখন রাগে তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

"আরে চটেন কেন?" বলিতে বলিতে ব্রজেন্দ্র ও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

শিউশরণ লাল যখন বঙ্গসমাজের এবং আপনার নিমন্ত্রণ-কর্ত্রীর উপর সেই তীব্র শ্লেষোক্তি করিয়া চলিয়া গেলেন, তখন নরেন্দ্রনাথ ও বসন্তকুমারী বিষণ্ণ-বদনে নীরবে একটী মুক্ত বাতায়নের নিকট বসিয়াছিলেন। উভয়েরই হৃদয় মন-কষ্টে পীড়িত; সেই অল্প দিনের মিশামিশিতেই উভয়েরই অন্তরে কেমন এক বিকৃত ভাব জন্মিয়াছে—উভয়ের অজ্ঞাতসারে দুই জনের অন্তরে কেমন একটু পরস্পরের প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছিল—উভয়ে কেমন একটুকু পাপপথের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এতদিন তাঁহারা জানিয়া ও বুঝিতে পারেন নাই; আজ যেন সহসা তাঁহাদের চমক ভাঙ্গিল—আজ যেন সহসা তাঁহারা এরূপ নির্জ্জনে বসিয়া পরস্পরের নিকট হইতে চিরবিদায়ের জন্য প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু কেহ সাহস করিয়া আগে বলিতে পারিতেছেন না।

অনেকক্ষণ নীরবে থাকিবার পর নরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বলিলেন, "ঈশ্বর, আপনার হৃদয় ধর্ম্মজ্যোতিতে পরিপূর্ণ করুন্; ধর্ম্মই লোকের একমাত্র সম্বল, ধর্ম্মই লোকের একমাত্র শান্তিদাতা; দুশ্চরিত্র লোকেদের মন নিয়ত আত্ম-গ্লানিতে পরিপূর্ণ; আমরা সেরূপ কণ্টকময় অসুখের জীবন চাহিনা। বিধাতা করুন্, যেন কখন পাপে আমাদিগের কাহার ও মতি না যায়। আমাদের আলাপ আর বেশী দিন রাখা উচিত নহে; হয়ত, ইহাতে উভয়েরই সর্ব্বনাশ হইতে পারে; হয়ত, ইহাতে আমাদের ভবিষ্য-জীবন নরক-যন্ত্রণায় যাইতে পারে। তাই বলিতেছি, আমাকে বিদায় দিউন্।"

মৃদু অথচ গম্ভীর স্বরে বসন্তকুমারী উত্তর দিলেন, "বিধাতা জানেন, আপনাকে বিদায় দিতে আমার কত কষ্ট বোধ হইতেছে—বিধাতা জানেন;"

আমি আমার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-স্বত্বেও আপনাকে কতদূর ভাল বাসিয়াছি। কিন্তু কি করিব! স্ত্রীলোকের সতীত্বই একমাত্র ধর্ম্ম—পতিপরায়ণতাই স্ত্রীলোকের একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য; যে তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিল, সেই আপন জীবন বিষময় করিয়া তুলিল—সেই আপনার সমস্ত সুখ চিরকালের মত খোয়াইল—সেই আপনার জন্য পরকালে ভীষণ নরক আবাস-স্থল করিল। আমার স্বামী কুৎসিতই হউন, আর বৃদ্ধই হউন, যেন তাঁহাতে আমি চিরকালই তদ্গতচিত্ত থাকি! যেন কখন আমি তাঁহার বিশ্বাস না হারাই! যে দিন আমার, তাঁহার উপর অনুরাগের হ্রাস হইবে, বিধাতা করুন, সেই দিনই যেন আমার মৃত্যু হয়।”

এই বলিয়া বসন্তকুমারী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা তাঁহাদের পশ্চাৎ হইতে ব্রজদুর্লভ বাবুর আওয়াজ পাওয়া গেল—“হুঁ-হুঁ, ঠিক বলিয়াছ! দোষ সব আমারই—আমিই তোমাকে এরূপ স্বাধীনতাপ্রিয় করিয়াছি। ভাগ্যে তোমার ন্যায় গুণবতী ভার্য্যা পাইয়াছিলাম, নহিলে কোন দিন আমার কি কলঙ্ক ঘটিত, কে বলিতে পারে! এখন বুঝিলাম, স্ত্রীস্বাধীনতা দাও, তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; কিন্তু স্ত্রীকে অপর পুরুষের সন্নিধানে আসিতে দিতে নাই, তাহাতে অনেক কুফল ফলিতে পারে।”

বসন্তকুমারী বলিলেন, “আর কখন ও স্বাধীন হইতে প্রয়াসী হইব না—আর কখন কাহার ও সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিব না; মানুষের হৃদয় একে তরল—সহজে পাপদিকে যায়; চাই কি, এমন ও অবস্থা ঘটিতে পারে, যে সময়ে ধর্ম্ম-রজ্জুতেও চিত্ত দমন করা দুষ্কর হয়।”

“তবে চলিলাম—এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ,” এই বলিয়া রুদ্ধবাষ্প-কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ ব্রজদুর্লভ বাবুর বাটী চিরকালের মত ত্যাগ করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ আপনার বাসায় ফিরিয়া আসিবার সময় মনে করিলেন, আর মুঙ্গেরে থাকিবেন না, কল্যই অপর কোন স্থানে চলিয়া যাইবেন। মধ্যে বাড়ী যাইবার জন্য কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু পত্র লিখিয়াছিলেন—অপর কোন স্থানে বেড়াইয়া বাড়ীতেই ফিরিবেন। সেইজন্য বাসায় আসিয়াই রামচরণকে বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কী বাঁধিতে বলিলেন।

রামচরণ তাঁহার বাড়ীর পুরাতন ভৃত্য; অল্পবয়সে যখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়, তখন সে তাঁহাকে নিয়ত আপনার নিকটে ভুলাইয়া রাখিত—তাঁহার মন ভুলাইবার জন্য কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলিত; তিনি বাল্যকালে নিয়ত তাহার নিকট থাকিতেন—তাই সে, যুবকের পিতার মৃত্যুর পর আর একদণ্ড ও তাঁহার কাছ ছাড়া হইতে ভাল বাসিত না; আর যুবক ও তাহাকে সাধারণ ভৃত্যের মত দেখিতেন না।

শুনিয়াই রামচরণ বলিল, "এরি মধ্যে! এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"এত শীঘ্র কেন?—আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই—কল্যই অন্যত্র রওনা হইব—তুমি সঙ্গে যাইবে, আর ব্রজেন্দ্র ইচ্ছা করে ত সেও যাইবে।"

রামচরণ আর কথা কহিল না, আদেশমত কার্য্য করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ব্রজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত; সে শিউশরণ লালের সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আর বাড়ী আইসে নাই—পথের এধার ওধার ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

রামচরণকে জিনিসপত্র বাঁধিতে দেখিয়া সে মহা চটিয়া উঠিল, বলিল, "এ কিরে? এ কি হচ্চে—এ আবার কি!"

"বাবু আর এখানে থাকবেন না—কালই অন্য জায়গায় যাবেন; আমি সঙ্গে যাব, আপনি যাবেন ত!"

ক্রোধে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া, নরেন্দ্রের শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া, ব্রজেন্দ্র বলিলেন, "একি ভাই! এই কি উচিত; আমি তোমার ভরসায় এতদূর আসিলাম, আর তুমি কি না আমাকে পথে বসাইয়া চলিলে। এক একজন লোক এমনই স্বার্থপর যে, পরের উপর তাদের একটুও দৃষ্টি থাকে না।"

"কেন!—তুমিও চল না; তোমাকে ত আমি যাইতে নিষেধ করিতেছি না; আমি আর এখানে থাকিব না।"

"কেন গো! এত বৈরাগ্য কেন? এত তাড়াতাড়ি পলায়ন—ব্যাপারটা কি! বসন্তকুমারীকে হাতিয়েছ না কি! তাকে নিয়ে চম্পট লাগাবার চেষ্টা বুঝি!—হাঁ! হা! হা! তাইত! তা বেশ ত; কিন্তু আমার উপরও ত একটু

নজর রাখিতে হয়—আমার এখনও মুঙ্গের দেখে সখ মেটে নি। আমার নিজের হাতে একটীও পয়সা নাই; তুমি গেলে আমায় উপায় কি হবে, বল দেখি! ছি! ছি! এই কি উচিত কাজ হ'লো!"

"ও কথা মুখে আনিওনা; বসন্তকুমারীর নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে ওরূপ জঘন্য দোষারোপ করিও না। তুমি জান, একজন সতী স্ত্রীলোকের উপর ও প্রকার জঘন্য দোষারোপে কত পাপ। আর তুমি যে বলিলে, তোমাকে নিঃসম্বলে রাখিয়া যাইব, তাহা মনে করিও না; আমি এরূপ স্বার্থপর নহি, এরূপ নিষ্ঠুরও নহি যে, একজন লোককে সঙ্গে আনিয়া তাহাকে বিপদে ফেলিয়া যাইব। তোমাকে এবাটী ত্যাগ করিতে হইবে না, তুমি যদি একান্তই আমার সঙ্গে না যাও, এখনও এখানে স্বচ্ছন্দে আরও তিনমাস থাকিতে পারিবে; জান বোধ হয়, আমি একেবারে ছয় মাসের ভাড়া চুকাইয়া দিয়াছি; আরও তোমার যাহা যাহা আবশ্যক, সকলই দিয়া যাইব।"

"আমি তোমার একটী তাঁবার পয়সারও প্রত্যাশা রাখিনি," এই বলিয়া ব্রজেন্দ্রকুমার সবেগে সেই গৃহ হইতে বাহির হইলেন; তখন তিনি বড়ই বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

ষোড়শ স্তবক।

John Cuthbert যুগলকিশোর।

মুন্সী যুগলকিশোর, ওরফে John Cuthbert যুগলকিশোরের ভাগলপুরে বাড়ী—একজন ইংরাজ-অনুকরণ-প্রিয় লোক; যদিও বয়সে প্রাচীন (প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর হইবে), তত্রাচ তখনকার নব্য বাবুদিগের চাল-চলন গুলির বিলক্ষণ নকল করিয়াছিলেন—এমন কি, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক পারদর্শীও হইয়াছিলেন; কারণ এই যে, তিনি যৌবনের চরম সীমায় একবার কোন কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় গিয়া, সেখানে সাহেববিবীদের সুন্দর পোষাক আর এক সঙ্গে

সাধারণ স্থলে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে দেখিয়া, তিনি বড় খুসী হইয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রৌঢ়া স্ত্রীর (১) ঈশ্বরেচ্ছায় ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হইলেই (২), আপনার মনের মত এক সুশিক্ষিতা, সুরসিকা, নির্লজ্জা, পূর্ণযৌবনা রমণীকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে স্বাধীনতা দিয়া, উভয়ে সাহেব বিবী সাজিয়া, পথে পথে কাঁধ ধরাধরি করিয়া বেড়াইয়া, দুর্লভ মানব জনম সার্থক করিবেন।

লোকে যেটী আন্তরিক কামনা করে, সেটী প্রায়ই সফল হইতে দেখা যায়। পাঁচ বৎসর ফিরিতে না ফিরিতেই তাঁহার মনের আশা পূর্ণ হইল—প্রথম পক্ষের স্ত্রী স্বর্গধামে গমন করিলেন, আর অমনি মুন্সীজী মনের মত একটী রমণী-রত্ন বাছিয়া লইলেন। জানকী, তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—তাঁহার রূপ বর্ণনা আর কি করিব! যাঁহারা ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপের কথা পড়িয়াছেন (৩), তাঁহারাই আমাদের এ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন—সেই 'বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর বিনায়' আদি সমস্ত সৌন্দর্য্যই জানকী বাইয়ের শরীরে আছে। আর যদি গুণের কথা, স্বভাব চরিত্রের কথা বলেন, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, 'রূপের কি দিব সীমা গুণ ততোধিক'—অর্থাৎ রূপের চেয়ে গুণের ভাগটা কিছু অধিক—আরও এ বিষয়ের এক প্রমাণ এই যে, যখন একবার তাঁহার স্বামীকে কোন কারণে কিছু দিনের জন্য মালদহে যাইতে হইয়াছিল, তখন তিনি জানকীকে তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু গুণের জানকী, 'শুনিয়াছি, সে দেশের কেঁই মেই কথা; হায় বিধি, সে কি দেশ, গঙ্গা নাই যথা।'—গোচ দুই

---

(১) কেননা, কুড়ি পার হইলেই বুড়ী।

(২) কেননা, সে স্ত্রী হইতে ত আর মনের অভিলাষ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না; সে বড় লাজুক।

(৩) অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'কেন আমি ওরূপ অশ্লীল লোকের পুস্তক হইতে উপমা লইলাম'—তাহাতে আমার উত্তর এই যে, 'অশ্লীলতা-নিবারণী সভা একেবারে সমগ্র পুস্তক পুড়াইতে অনুরোধ করেন নাই।'

চারিটী কথা বলিয়া স্বামীকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এদিকে বাঙ্গালায়, হিন্দীতে এবং ইংরাজীতেও জানকীর কিছু কিছু দখল ছিল—গীতবাদ্যেরও বিলক্ষণ আলোচনা ছিল।

যখন যুগলকিশোর মনের মত স্ত্রী পাইলেন, তখন তিনি মনে করিলেন, নামটাও ইংরাজী চাই—কিন্তু পোড়া লোকে তাঁহাকে যুগলকিশোর বলিয়াই ডাকিত; তাই ক্রোধে ও ঘৃণায় তিনি আপনার নামটী সম্পূর্ণরূপে বদলাইতে না পারিয়া, তাহার পূর্ব্বে John Cuthbert যোগ করিয়া আর গুণনিধি ভার্য্যার নামের পূর্ব্বে Lucia Margaret বসাইয়া মন্দ লোকের উপর ভালরূপে প্রতিশোধ লইয়াছিলেন; শুনিয়াছি, যখন তিনি মালদহে ছিলেন, লোকে নাম জিজ্ঞাসা করিলেই ঐ সুদীর্ঘ নামের পরে 'de ভাগলপুর' বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর ও পরিচয় দিতেন (১)। কিন্তু এ সকলের জন্য তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না; এদেশে এমন অনেক গুণবান্ পুরুষ আছেন, যাঁহারা লোকের কাছে ইংরাজ বলিয়া পরিচিত হইবার অভিলাষে যোগেন্দ্র মিত্রের স্থানে J. Motter, দ্বারিকানাথ সেনের স্থলে Dwarkinson বলিয়া লিখেন—আর দুই চারি পাত ইংরাজী পড়িয়াই ধুতি চাদর পরিত্যাগ করেন।

সূর্য্যদেব পাটে বসিয়াছেন—শরতের সুন্দর সুন্দর মেঘগুলি নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানের নানা ঘটনার চিত্র দেখাইতেছে—কোথায় বা, উন্নত গিরি; কোথায় বা, গগণ-স্পর্শী মন্দির; কোথায় বা, সিংহ এক মেষশাবককে আক্রমণ করিয়াছে, আর সে প্রাণের ভয়ে চেঁচাইতেছে; কোথায় বা, ভীষণাকার দৈত্য এক রমণীকে লইয়া পলাইতেছে—এইরূপ নানাবিধ চিত্র আকাশ-পটে দেখা দিতেছে; অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের সেই হেমাভ কিরণ গুলি গঙ্গার প্রশস্ত স্থির-বক্ষে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতেছে—মৃদু সমীর-স্পর্শে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি ধীরে ধীরে কাঁপিতেছে—আর দূরে

(১) 'De' একটী ফরাসী কথা, ইহার ঠিক বাঙ্গালা-'র'। 'de ভাগলপুর' বলিলে 'ভাগলপুরের' বুঝিতে হইবে।

সেই সকল ক্ষুদ্র বীচিমালা ভেদ করিয়া একখানি সুন্দর নৌকা দ্রুতগমনে আসিতেছে—দেশী সুরায় উন্মত্ত দাঁড়িমাঝীরা সজোরে দাঁড় ফেলিয়া গলা ছাড়িয়া অশ্রাব্য সঙ্গীত গাহিতেছে। তীরে একটী প্রস্তর-বিনির্ম্মিত স্নানঘাটের চত্বরে দাঁড়াইয়া সাহেবপোষাকপরিহিত John Cuthbert যুগলকিশোর, তাঁহার বিবীপোষাকপরিহিতা বিংশতি-বর্ষীয়া সুরূপা Lucia Margaret জানকীর হাত ধরিয়া তাহাই দেখিতেছেন।

হয় ত, অনেক পাঠিকা পড়িয়া বলিবেন, 'মরণ আর কি! ষাট বৎসরের বুড় হইতে চলিলেন, মরিতে যান এখন ও এত সখ যায়;' কিন্তু যদি তাঁহারা আজ কালকার, ষাট কি! সত্তর পঁচাত্তর বর্ষীয় কলপরঞ্জিত পক্ককেশ, সূক্ষ্ম কালাপেড়ে কাপড় ও ইংরাজী বার্ণিস করা জুতা-পরিহিত বৃদ্ধকে দেখিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের কাছে আমার মিনতি এই যে, তাঁহারা যেন অমন করিয়া গালি দিয়া আমার যুগলকিশোরের অকল্যাণ না করেন।

ক্রমে নৌকাখানি আসিয়া ঘাটে লাগিল; নৌকারোহী দুইজন, নামিয়া আসিয়া; নৌকার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সোপান-শ্রেণী আরোহণ করিতে লাগিলেন। যুগল কিশোরই কি, আর জানকীই কি, বাঙ্গালীদের কিছু ভাল বাসিতেন।—যুগলকিশোর ত একেবারেই স্বজাতীয় লোকেদের দেখিতে পারিতেন না—কি সুমুখ মাথা কামান, মাথায় একটা লম্বা টিকী, মাল্‌-কোচা করে কাপড় পরা, হাতকাটা জামা গায়ে, নাগরা জুতা পায়ে তার উপর আবার মাথায় একটা বিশ্রী পাগ্‌ড়ী তা কি তাঁর ভাল লাগে—যাহা হউক, বাবু, বাঙ্গালীরা তবু একটু সভ্যভব্য; মাথায় টেরী কাটে, ইংরাজীজুতা পায়ে দেয়, মাটি অবধি কোঁচা ঝুলাইয়া যায় (১); তার উপর আবার তিনি বাঙ্গাল দেশে অনেক দিন ছিলেন, বাঙ্গালা কথা

(১) যুগলকিশোর বোধ হয়, আমাদের দেশের নেড়ামাথা, খুব লম্বা টিকীওয়ালা, কোমরে গামছা জড়ান, শুধু পা বৈষ্ণব বাবাজীদিগকে দেখেন নাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বাঙ্গালীজাতির উপর মহা চটিয়া যাইতেন।

কহিতে ভাল বাসিতেন (১), কাজেই যখন সেই বাঙ্গালী দুইটী নৌকা হইতে নামিলেন, তখন তাহাদের মধ্যে যেটী পূর্ণযৌবন, সুশ্রী ও সুন্দর পোষাক-পরিহিত, আমাদের সাহেব বিবী আসিয়া তাঁহারই সহিত আলাপ পরিচয় আরম্ভ করিলেন।

জানকী বাই কহিলেন, "মহাশয়ের নিবাস!"

"শিয়ালদহে—কলিকাতার নিকট; দেশ-ভ্রমণই আমার উদ্দেশ্য—সম্প্রতি মুঙ্গের দেখিয়া আসিতেছি।"

"নাম কি?—জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই, তবে যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন, তাহা হইলে বাধিত হইব।"

"শৌরীন্দ্রমোহন রায়, জাতিতে কায়স্থ।—আপনার নাম কি! শুনিতে পাইনা—আর উনি! ঐ যে আপনার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; উনিই বা আপনার কে হন, ভাবেত পিতা বলিয়াই বোধ হয়—আপনারা কি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী!"

রসনা দংশন করিয়া মৃদু হাসিয়া জানকী বলিলেন, "অমন কথা বলিতে আছে কি! স্বামী গুরুজন; সম্পর্ক বিরুদ্ধ করেন কেন?—আর যে জাতির কথা বলিলেন, আমরা ও হিন্দু-কায়স্থ; তবে প্রভেদ এই যে, আপনি বঙ্গদেশীয় আর আমরা বেহারী; আমার নাম **Lucia Margaret** জানকী, আর আমার স্বামীর নাম **John Cuthbert** যুগলকিশোর। ভাল, আপনি আমাদের খৃষ্টান মনে করিলেন, কিসে?"

"খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীরাই নাকি এরূপ পোষাক পরে আর এরূপ স্বাধীন ভাবে বেড়ায়, সেই জন্য ঐরূপ মনে করিয়া ছিলাম, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আপনাদের নামগুলি বড় নূতনতর; এরূপ হিন্দীইংরাজীবিমিশ্রিত নাম কখন শুনি নাই—তবে হাঁ, উপাধির পূর্ব্বে ইংরাজী নাম দুই একজন দেশীয় খৃষ্টানের আছে বটে! কিন্তু ওরূপ নামের পূর্ব্বে নাম কখন শুনি নাই।"

মৃদু হাসিয়া শৌরীন্দ্রের উপর এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া,

---

(১) ইংরাজী অপেক্ষা নহে।

জানকীবাই বলিলেন, "হুঁ হুঁ; দেখিলেন ত, কেমন নূতনতর নাম; 'নূতনে মজে মন, পুরাতনে অযতন,' এ কথাটী চিরকালই আছে; নূতন নহিলে কেহই সন্তুষ্ট হয় না—পুরাতনের আদর নাই; দেখিলেন ত! এই দেখুন না, আমি যদি কেবল বলিতাম, আমার নাম জানকী আর আমার স্বামীর নাম যুগোলকিশোর—তাহা হইলে কি আপনি আশ্চর্য্য হইতেন!"

"না, তা বোধ হয় হইতাম না, তবে আসি," এই বলিয়া নরেন্দ্রনাথ গমনোন্মুখ হইলেন।

যুগলকিশোর বাবু বলিলেন, "সে কি! কোথায় যাইবেন—বিদেশে একলা; ভাল বাসা এরই মধ্যে মেলা দুর্ঘট; ভদ্রলোকের ছেলে, কখন কষ্ট সহ্য করা অভ্যাস নাই; আমার বাড়ী চলুন না—কোন কষ্টই হইবে না; এবিষয়ে বোধ হয়, আপনার কি উঁহার কোন আপত্তি নাই।"

"আমার সম্মতি হইলেই উহার ও হইবে—ও আমার ভৃত্য, নাম রামচরণ।"

"তবে আপনি আমার কথায় কি বলেন!"

"যা বলিলেন, সত্য বটে; কিন্তু শুদ্ধ এই রাত্রির জন্য, কল্য অন্য কোন বাসা সন্ধান করিব; মিছা মিছি ভদ্রলোককে কষ্ট দিতে আমি ইচ্ছুক নহি; তবে না কি, আপনি অনুরোধ করিলেন, পাছে না গেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন, সেই জন্যই যাওয়া।"

"কেন?—আমার বাড়ীও যা, আপনার বাড়ীও তা; আপনার যতদিন ইচ্ছা, আমার ওখানে থাকিতে পারেন—আপনার কোন বিষয়ে লজ্জিত হইবার আবশ্যক নাই—আমি বাঙ্গালীদের সংসর্গ বড় ভাল বাসি।"

"আমিও!—এখন চলুন, অন্ধকার হইয়া আসিল", জানকী যেন উৎকণ্ঠিতা হইয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

তখন তাঁহারা চারি জনেই গৃহাভিমুখী হইলেন। যুগলকিশোর বাবুর বাড়ী গঙ্গার অতি নিকটেই ছিল, কাজেই বড় বেশীদূর আর যাইতে হইল না—শীঘ্রই আসিয়া পৌছিলেন।

জানকী বাই দেখিল যে, শৌরীন্দ্রমোহন একজন অতি সুশ্রী পুরুষ

—তাঁহার বর্ণ চম্পক-নিন্দিত; নাসিকা সরল ও উন্নত; দন্তগুলি মুক্তার মত সাদা ও ছোট ছোট; চক্ষু আয়ত আর তার উপর ধনুকের মত নিবিড় ভ্রূযুগল; আর, মরি! মরি! সেই মনোহর ললাটের উপর সেই কুঞ্চিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি মৃদু বায়ু-হিল্লোলে কি সুন্দর ক্রীড়াই করিতেছে! আবার তাহার উপর পূর্ণযৌবনের আভা সর্ব্বাঙ্গে শোভমান্—সোণায় সোহাগা আর কি!—জানকী আপনার রূপের সহিত যুবকের রূপের তুলনা করিয়া দেখিল যে, সেই-ই যথার্থই তাহার যোগ্য পাত্র; আর স্বামী! আঃ খেলেষা! আবার ও কথা—ওত একটা কালো, বুড়ো, তোব্ড়া গাল, তার উপর আবার দুই চারিটী দন্ত মুখ-বিবর হইতে চিরদিনের মত বিদায় লইয়াছে; আমরি! তাতেই কি রক্ষা, আবার তার উপর যেমন আমার পোড়া কপাল—'পাকা গোঁফ পাকা দাড়ী, ঠিক্ যেন শণের নুড়ী'—ওত পা বাড়িয়েই আছে, চিত্রগুপ্তের বুঝি, খাতা দেখিতে ভুল হইয়াছে, তা না হ'লে এতদিনে বোধ হয় গঙ্গাযাত্রা করতে হ'ত; ওত আমার চাকরের ও অধম! এতদিন যে ওকে অনুগ্রহ করিয়াছি, তাই ও আপনার কপালের জোর বলিয়া ভাবুক্!—জানকী বাই অন্যমনস্কা হইল—সে এত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল যে, তাহার স্বামীরও নরেন্দ্রনাথের অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল; তখন সে মৃদুমন্দ ঝঙ্কার দিয়া পরের অশ্রাব্য স্বরে আপনার মনে মনে গায়িতে লাগিল—

'যারে বিদেশীবঁধু, আমি তোরে চাই নে।
যখন তোরে মনে করি, তখন তোরে পাই নে (১)॥'

---

(১) এই গীতটী জানকীবাই কোথা হইতে পাইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।—কিন্তু গীতটী অতি সুন্দর; বোধ হয় কোন সুরসিক কবি জানকীবাইয়ের মন বুঝিয়া উহা রচিত করিয়া থাকিবেন।

সপ্তদশ স্তবক।

কবি হরনারায়ণ (১)।

হরনারায়ণ জানকীর আপনার সহোদর ভাই। জানকীর পিতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিলনা; জানকীর সহিত যুগলকিশোরের বিবাহের মাস দুই পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়—মৃত্যুকালে তিনি যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাই যদি হরনারায়ণ বুঝিয়া সুঝিয়া চলিত, তাহা হইলে আর তাহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইত না এবং অন্নের জন্য পরের দ্বারস্থও হইতে হইত না। একটা প্রাণী, কতই খরচ! যদি বুঝিয়া চলিত, বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিত। কিন্তু মূর্খের নানা দোষ; একে গণ্ডমূর্খ, তাহাতে আবার কবি হইতে সাধ, কিছুই চাহিয়া ও দেখিত না, কাজেই যে যাহা পারিত, সে তাহাই সরাইত। তাহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, সে তাহা দেখিয়া ও দেখিত না; কেবল একাকী নির্জ্জনে বসিয়া কি ছাই-ভস্ম মাথামুণ্ড পদ্য রচনা করিয়া আপনার মনে মনে পড়িত, আর ঈষৎ হাসিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িত। স্ত্রীলোক ত চুলায় যাক্, সে পুরুষের পর্য্যন্ত ও সম্পর্কে আসিতে লজ্জা বোধ করিত; যেমন বুড়ো বুড়ো হুড়্কো মেয়েরা স্বামীর কাছে আসা দূরে থাকুক, 'ঐ আসিতেছে' বলিলে সভয়ে দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ আমাদের হরনারায়ণও কাহারও সম্পর্কে আসিতে বড় ভয়ও লজ্জা পাইতেন। অবস্থা খারাপ হওয়া অবধি, তিনি যুগলকিশোর বাবুর বাড়ীতে থাকেন বটে, কিন্তু

---

(১) হরনারায়ণ কবি ছিলেন কি না, তাহা বলিতে পারি না। তবে কিনা, মাঝে মাঝে তাঁহাকে নির্জ্জনে গুণ গুণ করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে গারিতে দেখিয়া, আমরা আগে তাঁহাকে কবি বলিয়াই ঠাওরাইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আমরা ঐরূপ উপাধি দিয়া ফেলিয়াছি। যাহা হইয়াছে, তাহার ত আর উপায় নাই, এখন আপনারা ঐ কথার আগে 'কু কি সু' যাহা ইচ্ছা, একটা বসাইয়া লইবেন।

বাড়ীর চাকর দাসী, এমন কি তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি পর্য্যন্ত কথন কথন সন্দেহ করিতেন যে, তাঁহারা ভিন্ন এবাড়ীতে অপর কেহই থাকে না। ভিতর বাটীর একটী ঘরের চারিধার বন্ধ করিয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন, কেবল যা আহারের সময়ে লোকে, আগেকার রাজ-দর্শনের মত একবার করিয়া (১) তাঁহার দর্শন পাইত।

প্রায় একমাস হইতে চলিল, নরেন্দ্রনাথ ও রামচরণ যুগলকিশোরের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহার বাড়ীতে আছেন—মধ্যে তিনি কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে একখানি চিঠি লিখেন, তাহারই উত্তরে যুবকের অভিভাবক লিখিয়াছিলেন, 'শীঘ্র আসিবে—আর বৃথা বিলম্ব করিও না, তোমার আসা বড় আবশ্যক'—সেই জন্য তিনি, মনে মনে আজই যুগলকিশোর বাবুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া, শীঘ্রই কলিকাতা যাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন; Mr. John Cuthbert যুগলকিশোর যে ধরণেরই লোক হউন না কেন—নরেন্দ্রনাথের তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবার কোন কারণই ছিলনা—তিনি কোন বিষয়েরই অভাব জানিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই দীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি কখন হরনারায়ণ মহাশয়কে দেখেন নাই—অনেক বার তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে তাঁহার ভয়ে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ঘরে খিল দিয়া থাকিত—কাজেই প্রায় সে সুবিধা ঘটিত না (২)। তিনি বসিয়া আছেন—একাকী নহেন, কাছে

---

(১) কেন না, পাছে অধিক সময় নষ্ট হয়, এই ভয়ে একবার মাত্র আহার করিতেন।

(২) কেবলমাত্র, একবার যখন তিনি হরনারায়ণের গৃহের নিকট দিয়া আসিতেছিলেন, তখন ভিতর হইতে গুণগুণ স্বরে গীত এই কবিতাটী শুনিতে পাইয়াছিলেন—

'কাঁহাঁ-জা চলত মেরা ফুলকুআঁ-আঁরী, না কহয়ে-রে, কছু বা-আত।
তু-উ হামা-আঁরি সরবস ধন, হাম বা-আগা তেরি সা-আত॥'*

* ফুলকুমারী কে?—কাহার কন্যা, তাহা আমরা জানিনা, অনেক অনুসন্ধান করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই তাহার কোন নিশ্চিত খবর দিতে পারে নাই।

Mr. যুগলকিশোর (১) বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে জানকী তাহার লজ্জিত ভ্রাতার হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া সেইখানে টানিয়া আনিল।

যেমন কোন ভদ্র-মহিলা পথে হঠাৎ পরপুরুষের সম্মুখে পড়িলে, লজ্জায় মাথার কাপড় টানিয়া দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া পাশ কাটিয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ আমাদের হরনারায়ণও সহসা নরেন্দ্রনাথকে সম্মুখে দেখিয়া, অধোবদনে চক্ষু বুজিয়া রহিলেন—মাথায় কাপড় নাই, থাকিলে বোধ হয় তাহাও টানিয়া দিতেন।

"ওকি ও! অমন করে রইলে কেন?—ভদ্রলোকের সঙ্গে এখনও আলাপ কর্‌তে শিখ্‌লে না!—উনি ত আর তোমার ভাশুর নন্, যে ওঁকে দেখ্‌লে তোমার লজ্জা করে!"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "ইনিই আপনার ভাই!—মহাশয়ের নাম!"

লজ্জাবনতমুখী নববিবাহিতা বালিকা তাহার স্বামীর প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের উত্তরে যেমন হাঁ হাঁ করিয়া কথা কহিতে যায়, কিন্তু লজ্জায় পারে না, হরনারায়ণও সেইরূপ বার পাঁচ ছয় হাঁ করিয়া চুপ করিলেন।

জানকীবাই বলিলেন, "বল না, বল্‌তে যাচ্ছিলে, আবার থাম্‌লে কেন!"

অনেক কষ্টে বার আষ্টেক ঢোঁক গিলিয়া হরনারায়ণ বলিলেন, "আ-মা-র না-ম—হ-র-না-রা-য়-ণ—ম-হা-শ-য়ে-র—"

"আমার নাম শৌরীন্দ্রমোহন; শুনিয়াছি, মহাশয়ের নাকি বেশ কবিতা রচনার ক্ষমতা আছে—বেশ, এক কর্ম্ম করিবেন, যা যা লিখিয়াছেন, আমায় দিবেন, কলিকাতা হইতে ছাপাইয়া আনিব!"

এ কথা শুনিয়াই হরনারায়ণের মুখে আর হাসি ধরিল না, সে যেন

---

(১) কেননা, ইংরাজ-প্রিয় লোকেরা আপনাদের নামের পূর্ব্বে Mr. বসাইতেই ভাল বাসেন, বাবু কথা তাঁহাদের দুই চক্ষের বিষ।

হঠাৎ প্রভূত সাহস পাইয়া বলিল, "বেশত ! বেশত ! আমি এখনই আনিয়া দিতেছি। আপনি নিজের টাকা খরচ করিয়া ছাপাইবেন ; লাভ সমস্তই আপনার, আমি কেবল নাম চাহি," এই বলিয়া সে দ্রুতগতি ভিতরে গেল।

যুগলকিশোর হাসিয়া বলিলেন, "আমার সম্বন্ধী একটী যে সে লোক নন—কোন দিন বা তুলসীদাসের পদ কাড়িয়া লন।"

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুনিয়াছি, ঊনপঞ্চাশ রকম বাই আছে, এও বোধ হয় তাদেরই একটা।"

এমন সময়ে দ্রুতপদে এক তাড়া কাগজ-হস্তে আসিয়া হরনারায়ণ বলিল, "এই নিন্—এতে সব লেখা আছে ; আপনার কাছে রেখে দিন, যে দিন যাবেন, সেই দিন নিয়ে যাবেন। একটু তৎপর হ'য়ে ছাপিয়ে ফেল্‌বেন—আর ছাপা হ'লেই একখানি বই আমায় পাঠিয়ে দেবেন—অতি অবশ্য পাঠিয়ে দিতে চান—ভুলিবেন না !"

কথাও সমাপ্ত হইল, সে আবার দৌড়াইয়া গিয়া আপনার গৃহে খিল দিয়া, অনন্যমনে ভাবী কবিযশের কল্পনার ছবি আঁকিতে লাগিল।

সে চলিয়া যাইলে পর, যুগলকিশোর বাবুও আপনার কোন বিশেষ আবশ্যকীয় কার্য্যের অনুরোধে বাহিরে গেলেন—তখন সেই গৃহে নরেন্দ্রনাথ ও জানকী একাকী হইলেন।

"এত দিন জিজ্ঞাসা করিব, করিব, মনে করিতেছি, তা রোজই ভুলিয়া যাই, আপনার বিবাহ হইয়াছে কি !"—নরেন্দ্রনাথের অতি নিকটে বসিয়াই জানকী বাইয়ের এই প্রশ্ন।

যুবক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারি ফোঁটা নেত্রজলও দেখা দিল—তখন সরলার রূপের ও গুণের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে আসিয়াছিল।

"ওরূপ বিমনা হইলেন যে !" জানকী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বিবাহও হইয়াছিল, ভালবাসিবার লোকও ছিল ! কিন্তু এখন আমাকে ভালবাসিবার কেহই নাই—ঈশ্বর জানেন, সে বাঁচিয়া আছে

কি মরিয়াছে—কিন্তু তাহার সেরূপ অকপট প্রণয় কখন ভুলিতে পারিব না।"

"সেই কি কেবল তোমাকে ভালবাসিয়াছিল, আর কি কেহ ভালবাসিতে পারে না," এই বলিয়া জানকী মুহূর্ত্তমাত্র সেই সুন্দর মুখপানে চাহিয়া যুবকের গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িবার উপক্রম করিল—তখন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল; বহুদিন অবধি সে নরেন্দ্রনাথকে ভালবাসিয়াছিল, বহুদিন অবধি তাহা প্রকাশ করে নাই, অথবা প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই; আজ নির্জ্জনে পাইয়া মনের অভিলাষ খুলিয়া বলিল।

যেমন লোকে সম্মুখে সর্প দেখিলে ভয়ে চমকিয়া দূরে সরিয়া যায়, সেইরূপ নরেন্দ্রনাথও জানকীর কথায় এবং কার্য্যে ভীত ও চমকিত হইয়া দূরে সরিয়া গিয়া বলিলেন, "ওকি! ও কি রকম কথা তোমার, তুমি অমন করিয়া গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছিলে কেন! ছিঃ! ছিঃ! যুগলকিশোর বাবু দেখিলে কি মনে করিতেন, বল দেখি!"

"মনে করে আর আমার কর্‌বে কি! তুমি যদি আমায় ভালবাস তা হ'লে আমি কোন বিপদকে ভয় করি না। একবার বল, তুমি আমায় ভালবাস!"

"আঃ তুমি উন্মাদ হলে না কি! তুমি পরস্ত্রী, তোমাকে আমি ভালবাস্‌তে পার্‌ব কি করে! তোমার মতন ত আর ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নহি যে, তোমাকে ভালবাসিয়া পাপে মজিব!"

অসৎ চরিত্র স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অসীম। লোকে কথায় কথায় 'ছিনাল মেয়ের বুদ্ধি পাও', বলিয়া যে আশীর্ব্বাদ করে, তা যোগ্য আশীর্ব্বাদ। কেন না, যখন জানকী বাই (আমাদের Lucia Margaret জানকী) দেখিল যে, নরেন্দ্রনাথ সেরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক নহেন, অমনি কথা উল্টাইয়া বলিল, "তুমি ত ভারি বদ্ লোক! যার খাও, তারি সর্ব্বনাশ কর্‌তে চাও; রসো, তিনি এলে পরেই এ কথা বলে দিচ্চি; ভালবাসা যে অনেক রকম আছে; তুমি অনেক দিন এখানে আছ, তাই তোমার ওপর একটু ভালবাসা জন্মেছে, তাই যেমন বোন্ ভাইকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসার কথা

বল্‌ছিলেম ; তা অমনি সেটাকে ফু'করে নিয়ে আমার মন পরীক্ষা কচ্ছিলে ! যদি জোটে ভালই ত ! তা এ আর তেমন মেয়ে পাওনি ! আমি সতী সাধ্বী পতিব্রতা।”

নরেন্দ্রনাথ দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ ; তিনি যদিও জানিতেন, যুগলকিশোর বাবুর তাঁহার চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, কিন্তু স্ত্রীর উপরও ত তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ! কি জানি যদি এ কথা শুনেন, তাহা হইলে চাই কি তাঁহার একটা ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হইতে পারে ; সেইজন্য তিনি আর ও কথার উত্তর না দিয়া যুগলকিশোর বাবুর বসিবার ঘরে এই মর্ম্মে একখানি চিঠী রাখিয়া দিলেন—

'আমি চলিলাম—বড় আবশ্যক আছে বলিয়া আজই বাড়ী চলিলাম ; আপনার জন্য আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না—বেলা হইয়াছে, পাছে গাড়ী না পাওয়া যায়, সেই ভয়ে এত শীঘ্র যাইতেছি। আর একটী শেষ কথা, আপনার স্ত্রীকে কখন বিশ্বাস করিবেন না, ও একটী সাক্ষাৎ সর্পিণী।'

পরে রামচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, “সব জিনিষ পত্র বাঁধ।”

রামচরণ বলিল, “কেন !”

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আজই বাড়ী যাব।”

অষ্টাদশ স্তবক।

সরলা।

আইস পাঠক, ধীরে ধীরে নিঃশব্দে আমার অনুগামী হও—দেখিও যেন সামান্য পদশব্দ পর্য্যন্ত না হয় ; দেখিও যেন তোমার মৃদু এমন কি অতি মৃদু শ্বাসেও বায়ুরাশি কম্পিত হইয়া অস্পষ্ট শব্দ পর্য্যন্ত না করে ; দেখিও,

অতি সাবধানে আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিও—সতর্কতার সহিত চারিধার চাহিতে চাহিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস। যে ভীষণ স্থলে আমাদিগকে এখন যাইতে হইবে—যে ভয়ানক নরঘাতী লোকেদের সহিত আমাদের এখন ব্যবহার করিতে হইবে, তাহারা যদি ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে যে, আমরা তাহাদের পিছু পিছু যাইতেছি, তাহা হইলে আর আমাদের কাহারও নিস্তার নাই।

রামমদক ও ভোলাসদ্দার সরলাকে লইয়া সেই গভীর ত্রিযামা রজনীর গাঢ় অন্ধকারে গা ঢাকিয়া, প্রান্তরে প্রান্তরে আসিয়া, অবশেষে এক লোকালয়-বিহীন ক্ষেত্র-বিহীন অনুর্ব্বর মাঠের উপর থামিয়া দাঁড়াইল; এত দ্রুতপদে তাহারা চলিয়াছিল যে, বোধ হয় সেই তিনক্রোশ পথ আসিতে তাহাদের এক ঘণ্টারও অধিক লাগে নাই। সেই মাঠের উপর এক প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষ, আর তাহার সহিত দ্বিবলদ-বাহিত একখানি শকট রজ্জু দ্বারা দৃঢ়-বদ্ধ। ভোলাসদ্দার গাড়ীখানি খুলিয়া আনিল, আর রামমদক সরলাকে ধীরে ধীরে তাহার উপর রাখিল। পরে দুইজনে গাড়ীতে উঠিলে, রামমদক গাড়ী হাঁকাইয়া দ্রুতবেগে সেই মাঠের উপর দিয়া চলিল।

সরলা এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিল—এতদূর ভীত হইয়াছিল যে, বোধ হয়, সেই মূর্চ্ছাতে তাহার শরীরের আভ্যন্তরীণ কার্য্যগুলি অনেকক্ষণের জন্য স্থগিত ছিল। যখন গাড়ীর বেগেই হউক কিম্বা রাত্রির সেই স্নিগ্ধ সমীর স্পর্শেই হউক, তাহার চেতনা হইল, তখন সে চাহিয়া দেখিল এক অনন্ত মাঠের উপর দিয়া সে একখানি শকটে শুইয়া যাইতেছে—চারিধারে নানাবিধ ছোট বড় গাছগুলি সেই অন্ধকারে মিশিয়া মিশিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখ দিয়া যাইতেছে—আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র তাহার প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে—বৃহৎ বৃহৎ অসংখ্য বারিভারাক্রান্ত কাল মেঘগুলি অন্ধকারের ভীষণতা আরও ভীষণ করিয়া তাহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে; পদতলের নিকট চাহিয়া দেখিল যে, কে একজন—তখন তাহার অতীত ঘটনাগুলি মনে পড়িল, তখন সে চিনিল যে, ভোলাসদ্দার তাহার পায়ের কাছে শুইয়া নাক ডাকাইয়া, তাহার

শ্রম-জনিত ক্লান্তির (১) লাঘব করিতেছে; আর কি দেখিল! আর দেখিল যে, তাহার পিতা রামমদক নিরীহ বৃষগুলিকে বিলক্ষণ প্রহার করিয়া এবং অতি সুসভ্য ভাষায় তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া, বকিতে বকিতে যাইতেছে।

ক্রমে ক্রমে সেই জলবাহী মেঘগুলি আসিয়া আকাশের গায়ে একত্র হইতে লাগিল; ক্রমে সমীরণ ভীষণবেগে আসিয়া বৃক্ষ লতা দোলাইয়া, চারিধারের ধূলি রাশি উড়াইয়া সেই মেঘরাশির সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল—সেই আক্রমণে মেঘগুলি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল বটে, কিন্তু বারিপাত কোন মতে নিবারিত হইল না। 'টপ্-টপ্-টপ্' বৃষ্টির জল আসিয়া রামমদকের মস্তকে পড়িল। আ-মলো-যা, পোড়া বৃষ্টির কি একটুকুও আক্কেল নাই! একে হতভাগা গরুগুলো চল্‌তে পারেনা; প্রায় ভোর হতে গেল, এখনও এই ছোট খাট মাঠটা (২) পার হতে পারচে না, তার ওপর আবার পোড়া জল এলো! এলি ত এলি বাবু, কোন্ দুষণ্টা পরে এলি! তাহা হইলে ত আমাদের রামমদক চটিত না—তাহা হইলে ত আমাদের সুবোধ রামমদক তোকে একটীও গালি দিত না; কাজেই রামমদক মেঘ বৃষ্টিকে উল্লেখ করিয়া, সেই জড় বস্তুকে গালি দিতে দিতে পশ্চাতে চাহিল—চাহিয়া দেখিল যে, সরলা নিঃশব্দে শুইয়া চাহিয়া আছে—তখন সে মধুবর্ষণকারী কথাগুলি ছাড়িয়া দিয়া আহ্লাদে সেই ভীষণ দন্ত বিকাশ করিয়া (৩) বলিল—

"হা! হা! হা! ঘুম ভাঙ্গলো—হা! হা! হা!' বেশ ইয়ারকি হচ্ছিল, পোড়া বাপ গিয়ে তাতে বাগ্‌ড়া দিলে, না!—হা! হা! হা! তা বেশ্‌ত! ইয়ারকি দিবিনি কেন! বয়স কালে ইয়ারকি দিতে সবাই চায়, মনে ফুর্ত্তি কার না আছে। তা যা হোক্, এত পীরিত কর্‌তেই যদি তোর সখ হয়েছিল, তা আমায় কোন্ বলেছিলি! আমি তা'হলে তোর মনের মতন একটী নাগর

(১) কেননা, সে চুরী ডাকাতির চেষ্টায় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিল।

(২) সাত আট ক্রোশের কম নহে।

(৩) সে দন্ত কেহই দেখিতে পাইত না—সরলাও পায় নাই, বিশেষতঃ তখন গাঢ় অন্ধকার (২ পৃষ্ঠা-১২ পংক্তি হইতে পড়িয়া যাও)।

জুটিয়ে দিতেম! তোরও মজা হ'ত আমিও কিছু পেতেম। দেখ্‌চিস্ যে, বুড়ো বাপ খেটে খেতে আর পারে না, তাকে কি অমন ক'রে ফাঁকি দিতে হয়; ভাগ্যে তোকে আবার ফিরে পেলুম, তা না হ'লে আমার দশা কি হ'ত, সরী! বোধ হয়, না খেতে পেয়ে মর্‌তে হ'ত। আমার বড় জোর কপাল, না! তা নইলে তোকে আবার ফিরে পাই; এবার গিয়ে তোর মনের মত আর একটীকে জুটিয়ে দেব; খুব পীরিত করিস্!—হা! হা! হা!"—এই বলিয়া বৃদ্ধ আহ্লাদে গড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

সরলা, তাহার কথার ভাবে আরও ভীতা হইল—একে তাহার শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, তাহাতে আবার মনের কষ্টে তাহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল—সে আর শুনিতে পারিল না, দৃঢ়রূপে গায়ের চাদরখানি টানিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিল।

সেই উচ্চ-চীৎকারে ভোলাসদ্দারের অমন যে গাধার ঘুম, তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল—সে বিরক্ত হইয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল।

"কিগো বাবু, ওঠা হ'ল! তোরই খুব মজা; আমি শালা সমস্ত রাত্রি গরু তাড়াব না কি!" কুটিল-কটাক্ষে ভোলাসদ্দারের প্রতি চাহিয়া রামমদকের এই প্রশ্ন।

"ওঠা হ'ল!" দাঁত খিঁচাইয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ভোলাসদ্দার বলিল, "ওঠা হ'ল!—উঠ্‌বোনা! সাধ্ ক'রে উঠেছি! যে তোর ষাঁড়ের মতন ডাক, তাতে আর কার না ঘুম ভাঙ্গে; গরু তাড়াবি, কি না তাড়াবি, তা আমি কি জানি!"—এই বলিয়া সে 'পপাত ধরণীতলে' (১) হইয়া আবার নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করিল।

"আর ঘুমোয় না! দেখ্‌চিস্ এখন আমাদের এই বিপদ! প্রাণ নিয়ে টানাটানি! এখন কি ঘুমোবার সময়! তোর কি একটুও বুদ্ধি নাই—জানিস্

---

(১) 'পপাত ধরণীতলে' পড়িয়া কেহ যেন মনে করেন না যে, ভোলাসদ্দার গাড়ী হইতে উল্টাইয়া মাটীতে পড়িয়াছিল। এখানে 'পপাত ধরণীতলের' অর্থ গরুর গাড়ীর উপর

যে, ধর্‌তে পাল্লেই ফাঁসি!—এখন বাঁচ্‌বার উপায় কর!"—বৃদ্ধ রামমদক যেন উৎকণ্ঠিত-ভাবে এই কথা বলিল।

"বাঁচ্‌তে হয় বাঁচ্‌গে যা! মর্‌তে হয় মর্‌গে যা! ফাঁসী যাওয়া না যাওয়া তোর ইচ্ছে; তা তুই যাবি যা, আমি ত ফাঁসী যাচ্ছি নি!—আমি কার কি করেছি! আমি ত আর কারুর একচালায় ঘর করিনে যে, আমায় ধ'রে ফাঁসী দেবে!"

"আরে! এত আর উড়িয়ে দেবার কথা নয়! এখন ত এই বিপদ উপস্থিত, কি করা যায় বল্‌ দেখি!"

তখন দুইজনে উৎকট শপথ ও মাঝে মাঝে ভীষণ চীৎকারের সহিত আপনাদের ভবিষ্যতে রক্ষার উপায়ের কল্পনা করিতে লাগিল—আর সরলা সেই চাদরের ভিতর থাকিয়া উৎকর্ণ হইয়া (যদি ইহারা এমন কোন কথা বলে, যাহাতে তাহার পলায়নের সুবিধা হইতে পারে, ভাবিয়া) তাহাদের কথা শুনিতে লাগিল। কিন্তু তাহারা এমন পরের অশ্রাব্য স্বরে কথা কহিতেছিল, যে সরলা তাহাদের কথা হইতে এই মাত্র বুঝিতে পারিল যে, তাহারা এখান হইতে বহুদূরে পলাইয়া যাইবে।

শ্রাবণের প্রারম্ভ; দামোদর নদীর জল কাণায় কাণায়, একে বর্ষাকাল তাহাতে আবার পূর্ব্ব দিনকয়েক অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইয়াছিল, কাজেই পাহাড়ের ঢল নামিয়া আসিয়া দামোদর নদীর আকৃতি বড় ভয়ানক করিয়াছিল—তাহার একুল ওকুল নজর হয় না—শীতকালে যেমন প্রশান্ত মূর্ত্তি (গ্রীষ্মের সময় ত প্রায় একেবারে শুষ্ক), বর্ষায় তেমনই ভীষণাকার ধারণ করে; একে একটানা, তাহাতে ভীষণবেগ, মধ্যে মধ্যে আবর্ত্ত, কাজেই বৃহৎ বৃহৎ নৌকায় যাইতেও প্রাণ-সঙ্কট ভাবিতে হয়। তীরে দুইপার্শ্বে অবিশ্রান্ত মাঠ, আর মধ্যে সেই ভীষণ দামোদর নদী, এমন সময়ে অল্প অল্প অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সেই গাড়ীখানি আসিয়া নদী-কূলের নিকট থামিল; সেখানে চারিপাঁচ জন বিশ্রীকালো হাঁটুর উপর ছোট ছোট ছেঁড়া কাপড়পরা লোক, একহাতে ক্ষুদ্র কেটো হুঁকায় দাকাটা তামাকু খাইতে খাইতে একখানি বৃহৎ নৌকার কাছি ধরিয়া

টানিয়া রহিয়াছে—নৌকাখানি বৃহদাকৃতি, বহু-পুরাতন—তাহার কাষ্ঠ সকল পচিয়া গিয়াছে; উপরে ছতরী নাই, পচা পচা বাঁশের পাটা—সেখানি জলের বেগে টলমল করিতেছে। গরুর গাড়ীখানি পৌঁছিবামাত্রই তাহারা মহা হল্লা করিয়া উঠিল।

"আরে বাপু! অমন ক'রে চেঁচাস কেন?—তোদের ভাগ!—তা ত তোরা পাবিই! কিন্তু বাবা, এবার বেশী না! সব নিয়ে থুয়ে পাঁচ সাতশ টাকা বই হবে না!—আর জানিস্ত! এই সুন্দর মেয়েটী বাড়ার ভাগ।"

সহযোগীদিগকে এই কথা বলিয়া, রামমদক ও ভোলাসদ্দার গাড়ী হইতে নামিয়া সরলাকে ঠেলিয়া বলিল, "আর ঘুমিয়ে কাজ নেই—ঢের ঘুম হ'য়েছে। এখন ওঠ্—গয়না খুল দে, আরও কাপড়খান ছাড়্—তোর গরীব বাপ্—অত দামী কাপড়্ কোথেকে যোগাবে!"

সরলা, তাহার পিতার স্বভাব জানিত, সে ভয়ে ভয়ে শকট হইতে নামিয়া আসিল; তখন বৃদ্ধ এক জনের কাঁধ হইতে এক খানা মলিন ছিন্নবস্ত্র লইয়া বলিল, "এই নে, এ খানা প'রে ও খানা ছেড়ে দে।"

সরলা ভয়ে ভয়ে তাহাই করিল।

একজন দস্যু (নৌকার কাছী-ধারীদিগের মধ্যে একজন) সেই কাপড় খানি ও সরলার সেই গাত্রাবরক চাদরখানি একখানা ময়লা কাপড়ে বাঁধিয়া সেই গরুর গাড়ীতে চড়িয়া 'কি মজা করিলু কাল সাঁজের বেলায় রে! নাগোর বল্‌ব কি তোরে!'—গায়িতে গায়িতে একদিকে হাঁকাইয়া চলিয়া গেল।

তার পর সরলাকে জোর করিয়া সেই নৌকায় চড়াইয়া, বৃদ্ধ রামমদক, ভোলাসদ্দার ও অন্যান্য দস্যুরা নৌকা ছাড়িয়া দিল—দেখিতে দেখিতে নৌকাখানি পরপারে আসিয়া ঠেকিল; এই সকল কার্য্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়াছিল যে, তত শীঘ্র আমি ইহা লিখিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ!

ঊনবিংশ স্তবক।

হৃদয় ভাঙ্গিল।

উপরের ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হইয়াছে ; ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের সেই বর্দ্ধমানের বাড়ীখানি অপর একজন লোক কিনিয়াছিলেন ; তাঁহার ধনের অভাব ছিল না—পূর্ব্বে ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ; তিনি সেই বাড়ী খানিকে নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন—সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলির স্থান খড়খড়ি অধিকার করিয়াছিল—আগে ঘরগুলি ছোট ছোট ছিল, সে গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বেশ প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল—ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী একখানি বৃহৎ ত্রিতল গৃহে পরিণত হইল ;—তাহার চারি ধারে লোহের রেল বসান—সম্মুখে বৃহৎ ফটক—সেই বাগানটী কেয়ারি করা; কত নূতন নূতন পাতার গাছ, ফুলের গাছে পরিপূর্ণ—মধ্যে একটী শ্বেত প্রস্তরের স্ত্রীমূর্ত্তি, একটী চারকোণা পাথরের থামের উপর দাঁড়ান—তাহার ভাব ঈষৎ লজ্জিত—বক্ষের কাপড় সরিয়া গিয়াছে—কোমরের বস্ত্র শিথিল হইয়া আসিয়াছে, আর সে দুই হাতে নীবি-বন্ধন দুইটী ধরিয়া বক্ষের পানে চাহিয়া, অধোবদনে লজ্জায় দাঁড়াইয়া আছে। বলিতে কি ! যে কখন এখানে সেরূপ নীচু ছাতওলা ইট বারকরা ছোট খাট বাড়ীটী দেখে নাই, সে মনে ধারণাই করিতে পারিবে না যে, এখানে এককালে এমন একটী ছোট খাট বাড়ী ছিল। বাড়ীর অধিকারীর নাম রামকুমার সোম—তাঁহার স্ত্রীর নাম কৃষ্ণরঙ্গিণী আর তাঁহাদের প্রিয়লাল বলিয়া এক পুত্র এবং অম্বুজবালা নামে এক কন্যা ছিল—এছাড়া দাসদাসী ত আছেই !

এদিকে বর্দ্ধমান হইতে বহুদূরে একটী নির্জ্জন প্রান্তরে দুইখানি পাতালতার ঘর বাঁধিয়া রামমদক, ভোলাসদ্দার ও সরলা বাস করিতে

লাগিল। মাস দুই একের মধ্যে অতিরিক্ত মদ্যপান ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়ায় তাহাদের সমস্ত সঞ্চিত ধনের ক্ষয় হইল (১) (সরলার অঙ্গের মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি অতি সামান্য দরে বিক্রীত হইয়াছিল—যাহারা কিনিয়াছিল, তাহারা আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিল—চোরাই মাল হউক আর যাহাই হউক, তাহারা ত আশাতিরিক্ত লাভ করিল, তা হ'লেই হ'ল! তত খবর লইবার আর তাহাদের আবশ্যক কি!)—কাজেই চুরী এবং দস্যুবৃত্তি ভিন্ন তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের আর অন্য কোন উপায় ছিল না।

রাত্রিকালে এমন কি কখন কখন দিনের বেলায় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে গিয়া এমন সাবধানের সহিত চুরী করিত, যে কেহই তাহা ধরিতে পারিত না—দস্যুবৃত্তি করিতে তাহাদের সাহস হইত না—তখন আপনাদের চিরকেলে গ্রামে ছিল, সুতরাং অনেক বদমায়েস লোকের সহিত আলাপ ছিল, তাহাদের সহিত বেশ বনিবনাও হইয়াছিল, তাহাদের সহায়তাতেই একরূপে কার্য্যোদ্ধার করিত--এখানে ত তাহা হইবার যো ছিলনা, কেননা তাহারা তাহাদের যোগ্যলোক এখন ও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই—কাজেই চুরি ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় ছিল না—যখন আপনাদের গৃহে থাকিত, তখন যদি দৈবাৎ কখন কোন লোক সেই মাঠের উপর তাহাদের ঘরের নিকট দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে সেরূপ ভয়ানক প্রকৃতির লোক বলিয়া জানিতে পারিত না।—যেন কত নিরীহ ভাল মানুষ! 'গরিব লোক খাটিয়া খুটিয়া খায়,' ইহাই মনে করিত।

দুইজন লোক একরূপ জঘন্য প্রকৃতির হইলে, তাহাদের সে আলাপ বড় বেশী দিন থাকে না। রামমদকের ও ভোলাসদ্দারের প্রণয়েরও দিন দিন লাঘব হইতে লাগিল—তার পর উভয়ে একদিন মনের সাধে বিলক্ষণ মারামারি করিল,—ভোলাসদ্দার 'আচ্ছা শালা, তুই থাক্, তোকে

---

(১) অসৎ উপায়ে উপার্জ্জিত ধন কাহারও থাকে না—চোর ডাকাতেরাও কখন পাপ উপায়ে অর্জ্জিত ধন বহুদিন ভোগ করিতে পারে না।

দেখ্‌ব,' বলিয়া চলিয়া গেল; তখন রামমদক ও সরলা সেই জঘন্য কুটীর দ্বয়ের একমাত্র অধিকারী রহিল—সরলা সেইখানে থাকিয়া দিবা-নিশি আপনার পলায়নের উপায়-চিন্তা করিতে লাগিল। একদিন রামমদক অতিরিক্ত ধান্যেশ্বরী-সেবনে চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিল; তখন প্রভাত হইয়াছিল—বেলা প্রায় ছয়টা; সূর্য্যের মৃদুকিরণ সেইমাত্র ভূমি স্পর্শ করিয়াছে—সরলা ভাবিল যে, সেই পলায়নের প্রশস্ত সময়—সে জানিত যে পলাইলে ও পথে পদে পদে তাহার বিপদের সম্ভাবনা; তত্রাচ সে ইহা ও জানিত যে, তাহার সেই কদাচারী পিতার নিকট থাকিলে তাহা অপেক্ষা ও ভয়ানক অবস্থা তাহার ঘটিতে পারে। সে মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য যেন কি ভাবিয়া লইয়া—তড়িৎবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল—দ্রুতপদে বাহিরে আসিল—দ্রুতবেগে দৌড়াইবার উপক্রম করিল। রামমদক তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া (কেননা বদ্‌মায়েস লোকে যত শীঘ্র মনের ভাব বুঝিতে পারে. তত শীঘ্র কেহই পারে না) গালি দিতে দিতে কোন মতে টলিতে টলিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিল—কিন্তু পারিবে কেন?—একে শরীর অবশ, তাহাতে মাথা ঘুরিতেছে; পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল—অবশেষে সে চীৎপাত হইয়া মাটীর উপর পড়িয়া গেল—সরলা দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, দেখিতে দেখিতে সে রামমদকের দৃষ্টি-পথের বাহির হইয়া পড়িল। তখন রামমদক কখন প্রলোভন-বাক্যে ভুলাইয়া কখন জঘন্য কদর্য্য ভাষায় গালি দিয়া, কখন বা ভয় দেখাইয়া সরলাকে ডাকিতে লাগিল—কিন্তু সরলা আর ফিরিল না; সে সেই পূর্ব্বের বাড়ীখানি—যেখানে সে তাহার নরেন্দ্রনাথের সহিত বাস করিত—সেইখানে নরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য বর্দ্ধমান-উদ্দেশে ভিক্ষা করিতে করিতে চলিল।

'কিন্তু ইহা করিবই করিব' এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যদি কাহার ও থাকে, সে কখন সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে অপারক হয় না; ক্রমে সরলা ও বর্দ্ধমানে আসিল; যে খানে তাহার সেই প্রিয় বাড়ীখানি ছিল, সেখানে আসিয়া পৌঁছিল—কিন্তু সে, বাড়ী দেখিয়া জানিতে পারিল যে,

তাহার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; সে তাহার পরিচারিকা কি পাচিকা কাহাকেও দেখিতে পাইল না (তাহারা তখন কোথায় গিয়াছে, বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, তারই বা ঠিক্ কি!)—কিন্তু সে জানিতে পারিল যে, এই সেই বাড়ী না হউক, সেই জায়গায় আছে বটে! আহা! নির্ব্বোধ বালিকা মনে করিয়াছিল যে, তাহার নরেন্দ্রনাথ তাহার অপেক্ষায় সেই বাড়ীতে হা-প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে!—তখন সে বাহির হইতে ডাকিল 'নরেন্দ্র!'—সে নরেন্দ্রনাথকে নাম ধরিয়াই ডাকিত।

আহা, অবোধ বালিকা! কোথায় তোমার নরেন্দ্রনাথ! যে তোমার কথার উত্তর দিবে!

বালিকার মন বুঝিল না। সে আবার আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল, "নরেন্দ্র! নরেন্দ্র! নরেন্দ্র!"

স্বর গৃহের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিল, সেই প্রভাতের ক্রীড়া ছাড়িয়া, বালক প্রিয়লাল এবং বালিকা অম্বুজ-বালা আসিয়া সেখানে পৌঁছিল—"হ্যাগা, তুমি কেগা!"—আধ আধ স্বরে অম্বুজ-বালা এই কথা জিজ্ঞাসা করিল।

"এখানে নরেন্দ্রনাথ বলিয়া যে লোকটী থাকিত—সে কোথায়?—তাহাকে একবার ডাকিয়া দিবে কি!"

"নলন্দনাথ! নলন্দনাথ কেগা! তাকে ত আমলা দানি নি"—আধ আধ স্বরে বালিকার এই উত্তর।

সরলা হতাশ হইয়া গমনোন্মুখী হইলে, প্রিয়লাল কহিল, "হ্যাগা, তোমার কি খাওয়া দাওয়া হয় নি! এসনা! আমাদের বাড়ীতে এসনা; এখানে খাবে দাবে এখন! তোমায় দেখে বোধ হয়, তোমাকে খেতে দেবার কেউ নেই।"

"ছিল!—কিন্তু বিধাতা কাড়িয়া লইয়াছেন!"—এই বলিয়া সাশ্রুনয়নে সরলা আবার যাইবার উপক্রম করিল।

"না! তুমি দেওনা—আমি বাবাকে দেকে আনি! মাকে দেকে আনি!" এই বলিয়া বালিকা অম্বুজ-বালা "বাবা দ্যাকো! মা দ্যাকো! কেমন একতি

"আণ্ডা মেয়ে তোমাদের ছেয়ে ও আণ্ডা, একতি তোতো আণ্ডা মেয়েকে* কোলে কোয়ে এত্তেতে" বলিতে বলিতে বাড়ীর ভিতর চলিল—প্রিয়লাল ও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

কিন্তু সরলা আর সেই বালক বালিকাদের কথায় দাঁড়াইল না—সে মনের আবেগে একদিকে চলিয়া গেল। যখন সে কিছুদূর গিয়াছে, রামকুমার বাবু তাহাকে উচ্চরবে ডাকিতে লাগিলেন—সে একবার মুখ ফিরাইয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই যেন কি ভাবিয়া আপন মনে চলিল। আহা! বালিকার বোধ হয় কাল সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে।

বিংশতি স্তবক।

আশ্রয় লাভ।

ফিরাও, বিধাতঃ, ফিরাও!—জনম-দুঃখিনী সরলার কঠোর ভাগ্যলিপির পরিবর্ত্তন কর!—আহা, দেখ দেখি! এক সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা অনাথিনী এক শিশুসন্তান লইয়া কি অকূল সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল! আহা! বালিকা অনাথা, আশ্রয় নাই! আমার বলিবার লোক নাই! হৃদয়ের

---

* পূর্ব্বে যুবকের সহবাসে সরলা গর্ভবতী হইয়াছিল; যখন সে তাহার দুর্ব্বৃত্ত পিতার গৃহত্যাগ করে তখন সে পূর্ণগর্ভা। পথে যখন তাহার অত্যন্ত গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছিল, এক কৃষক তাহাকে অনুগ্রহ করিয়া আপনার গৃহে স্থান দেয়। সময়ে, সে একটী কন্যারত্ন প্রসব করিয়াছিল। কিন্তু সদ্যজাত বালিকা পথ ক্লেশে বাঁচিবে না, বলিয়া সরলা অনিচ্ছায় সেই কৃষক-কুটীরে প্রায় দেড় বৎসর অতিবাহিত করে। কৃষক নিঃসন্তান ছিল—সে সরলাকে ও তাহার শিশুসন্তানকে অত্যন্ত যত্ন করিত, সরলাকে পারৎপক্ষে তাহারা স্ত্রী পুরুষে বাটীর বাহির হইতে দিতনা—কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে দেখিবার ইচ্ছা, তাহাকে এত অধিক ব্যাকুল করিয়াছিল, যে সন্তানটি একটু বড় হইলেই সে একদিন রাত্রিযোগে কৃষক কিম্বা তাহার পত্নীকে কিছুই না বলিয়া পলাইয়া আইসে।

জ্বালা জুড়াইবার স্থল নাই! —আহা! বড়ই আশা করিয়া আসিয়াছিল যে, নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইবে—প্রিয়জনের সহিত মিলিত হইয়া আবার সুখ-সাগরে ভাসিবে! তা তুমিত তাহাকে সে আশা ভরসায় বঞ্চিত করিলে!—দেখ! দেখ! বালিকা যাইতেছে; শোকের আবেগে শরীর অবশ, চলিতে চলিতে বার বার পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে—মাঝে মাঝে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার হৃদয়ের সে বিষম শোকের গুরুভারের পরিচয় দিতেছে!—আহা! জলভারে তাহার চক্ষু দুইটী পরিপূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু ভীষণ শোকাবেগে তাহা বাহির হইতে পারিতেছে না। আহা! বালিকা অনাথা! সে কোথায় যাইবে, কি করিবে জানে না; একে বহুদিন প্রায় অনাহারে কাটাইয়াছে, তাহার উপর আবার অবোধ শিশু খাইবার জন্য বার বার মাতাকে উত্যক্ত করিতেছে, আর মাতা হতাশ হইয়া, নিরুপায় হইয়া, ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—শোকের আবেগ আরও দ্বিগুণতর হইতেছে। আহা! করুণাময়! সে ত মরিতে পারে—যখন তাহার পৃথিবীর সমস্ত আশাভরসা মিটিয়া গিয়াছে, তখন ত সে মরিলেই যন্ত্রণার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়—কিন্তু তাহা হইলে তাহার এ অনাথা শিশুটীকে কে দেখিবে! তাই সে মরিতে চাহে না। একবার বালিকার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে চাও! যদি সুখ সম্পত্তি একান্তই তাহাকে না দিলে, তবে একটী আশ্রয়-স্থলও না হয় জুটাইয়া দাও! কৃপানিধি! কতদিন সরলা আর ওরূপ ভিক্ষা করিয়া অর্দ্ধাহারে দিন কাটাইবে! কয়দিন আর ওরূপ শীত বর্ষার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বৃক্ষতলে শুইয়া রাত্রি যাপন করিবে!—হায়! এককালে তুমি তাহাকে ত সকলই দিয়াছিলে, আবার সেই নির্দ্দোষ বালিকার কোন দোষ দেখিয়া সকলই কাড়িয়া লইলে!

জলদগম্ভীরস্বরে সহসা কে যেন বলিল—"অজ্ঞান তুমি! বিধাতার মহিমা কি বুঝিবে!—তাঁহার অপার লীলা তোমার ও ক্ষুদ্র মনে কি ধারণা করিবে!—তাঁহার সৃষ্ট এ জগৎরাজ্যে কেহই নিরাশ্রয়ে থাকে না, কেহই অনাহারে মরে না! সক্ষম অক্ষমকে প্রতিপালনের নিমিত্তই মনুষ্য-হৃদয়ে তিনি দয়ার সৃষ্টি করিয়াছেন—সেই দয়ার বলে সমস্ত জগৎ চলিতেছে—

সরলাও সে দয়া হইতে বঞ্চিত হইবে না!"—পথে এক বৃদ্ধার সহিত সরলার সাক্ষাৎ হইল।

বৃদ্ধার নাম মাতঙ্গিনী (১); বয়স পঞ্চাশের উপর; অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্দলোকে বহু আয়াসে ও তাঁহার চরিত্রগত কোন দোষ বাহির করিতে পারে নাই। স্বভাব আশুবিশ্বাসী—নিজে নাকি, সরলচিত্ত, তাই সকলকেই বিশ্বাস করিতেন, পরের চাতুরী কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস ছিল—আর সেই ধর্ম্মের বলেই অরক্ষক অবস্থায় থাকিয়াও নানা প্রলোভন, নানা বিপদ্ অতিক্রম করিয়া আপনার সতীত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যে কতদূর পর্য্যন্ত ধর্ম্মের ভাণ করিতে পারে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন না—নিজের ধর্ম্মে মতি ছিল বলিয়া, তিনি যাহাকে দুইটা ধর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেন, তাহাকেই ধার্ম্মিক বলিয়া মনে করিতেন। শরীরে দয়াও বিলক্ষণ ছিল; স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি এক সামান্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন; একজন নিকট সম্পর্কের জ্ঞাতি সেই সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতেন—তাহাতে প্রায় মাসিক দুই শত টাকা আয় ছিল; সেই আয়ের অধিকাংশই তিনি দীনদুঃখীর ভরণপোষণে আর আপনার ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিতেন। সরলাকে দেখিতে পাইয়াই তিনি অনাথিনী বলিয়া মনে করিলেন।

"আহা! বাছা! কোথায় যাইতেছ!"—বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কোথায় আর যাইব—দাঁড়াইবার স্থল নাই—আমার বলিবার লোক নাই—কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় নাই।"—সরলা উত্তর দিল।

মাতঙ্গিনী চমকিত হইলেন—কিছুক্ষণ সরলার মুখপানে চাহিয়া পরে বলিলেন, "কেন?—তোমার কি বিবাহ হয় নাই—তোমার কি স্বামী নাই!—এরূপ সুন্দরী তুমি, এত রূপত দরিদ্র-গৃহে সম্ভবে না।"—এই বলিয়া সরলার চরিত্রের বিষয়ে যেন সন্দিহান হইয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "ভাল, ঐ যে সুন্দর মেয়েটী তুমি কোলে করিয়া রহিয়াছ, উটী কি তোমার!"

(১) চরিত্র নির্ম্মল এবং পবিত্র ছিল বলিয়া, এবং নিয়ত হরিভজনা করিতেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে বৈষ্ণবী বলিয়াই ডাকিত।

"এমেয়েটী আমার—যাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, আর যিনি, আমাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, এটী তাঁহারই কন্যা।—হায়! এককালে আমার সকল সুখই ছিল, কিন্তু এক্ষণে আমি পথের ভিখারী।" —এই বলিয়া সরলা মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—দর দর অশ্রুধারে তাহার সমস্ত বসন ভিজিয়া গেল।

মাতঙ্গিনীর হৃদয় সরলার দুঃখে গলিয়া যাইল—যে ব্যক্তি যথার্থই দয়ালু, সে পরের কান্না দেখিয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না; বৃদ্ধারও চক্ষে দুই চারি ফোঁটা অশ্রুজল দেখা দিল; তিনি বলিলেন, "ভাল! তোমার স্বামী কি জীবিত নাই—আর যদি মৃতই হইয়া থাকেন, তোমাকে কি একেবারে নিঃসম্বলে রাখিয়া গিয়াছেন।"

"ঈশ্বর করুন্, তাঁহার যেন কোন সামান্য অসুখও না হয়; সে অনেক কথা; আপনি আর এ দুঃখিনীর সে দুঃখকাহিনী শুনিয়া কি করিবেন।" —এই বলিয়া সরলা নিস্তব্ধ হইল।

মাতঙ্গিনীর কৌতূহল আরও বৃদ্ধি পাইল—সরলার আখ্যায়িকা শুনিবার জন্য তিনি বড় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "কেন!—তিনি কি তোমাকে নিরাশ্রয় করিয়া, অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া পলাইয়াছেন!"

"না, না, অমন কথা বলিবেন না; তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন—প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসিতেন। ঈশ্বর করুন্, আমি যতদিন বাঁচিব, ততদিন যেন তাঁহার প্রতি আমার অটল ভক্তি থাকে—তিনি দেবতুল্য; পরলোকেও যেন তাঁহারই পদসেবা করিতে পাই; যদি একান্তই ইহজীবনে তাঁহার সহিত মিলন আর না হয়, তবে যেন তাঁহাকেই মনে করিয়া এ অবস্থায় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারি—তাঁহাকেই ভাবিয়া যেন সকল বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে পারি। সে রূপ, সে গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। আপনি যখন আমাকে এত দয়া করিয়াছেন—যখন আমার দুঃখের কথা শুনিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়াছেন—তখন অবশ্যই আমি বলিব।"—এই বলিয়া যতদূর মনে পড়িল, সরলা বৃদ্ধার নিকট আপনার জীবনের কথাগুলি বিবৃত করিল।

শুনিয়া মাতঙ্গিনী বলিলেন, "তুমি একটী বড় অন্যায় কার্য্য করিয়াছ; মনের মিলই যথার্থ বিবাহ বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে সামাজিক বিবাহ কহিয়া থাকি, তাহাতে দম্পতীযুগলকে, বিশেষতঃ স্বামীকে একটু ভয় করিয়া চলিতে হয়; কেননা, সকলে জানিতে পারে, এ বিবাহিতা স্ত্রী আর ও বিবাহিত স্বামী; কাজেই ভবিষ্যতে মনের অমিল হইলেও কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না; বিশেষতঃ, পরের অজানিত অবস্থায় যদি কোন স্ত্রীলোক কোন লোকের প্রণয়ে পড়ে, আর তাহার সহবাসে সেই স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হয়, আর সে ব্যক্তি তাহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া পলায়, তাহা হইলে সে স্ত্রীকে সমাজঘৃণিতা হইয়া বাস করিতে হয়, আর তাহার সন্তানদিগকে লোকে জারজ বলিয়া ঘৃণা করে। এই মনে কর, তুমি একজন দরিদ্রলোকের কন্যা, পরের অজ্ঞাতে একজনকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, তাহার সহিত তোমার যদি কখন সাক্ষাৎ না হয়, আর যদি হয় এবং সে তোমাকে পত্নী বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে বল দেখি! তুমি দরিদ্রের কন্যা, আর সে অতুল সম্পত্তির অধিকারী—তোমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে!"

সরলা মহা চটিয়া উঠিল, বলিল, "আপনি তাঁহাকে যেরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক মনে করিতেছেন, তিনি সেরূপ নন। ওরূপ ঘৃণিত কথা তাঁহার ন্যায় উদার চরিত্রের লোকের মনে কোন মতে স্থান পাইতে পারে না। যে তাঁহার নিন্দা করে, আমি তাহার নিকট সামান্য দয়ারও আকাঙ্ক্ষা রাখি না। অনাহারে মরিব, সেও স্বীকার, তবুও আপনার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিব না।"—এই বলিয়া সরলা বৃদ্ধার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

মাতঙ্গিনী অবাক্ হইলেন—সরলার হস্ত ধরিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া আদর করিতে করিতে বলিলেন, "পাগল না কি! আমি কি তোমার স্বামীকে ওরূপ নীচপ্রবৃত্তির লোক বলিলাম; একটী উদাহরণ দিয়া সাধারণ মানবচরিত্রের কথা তোমাকে বুঝাইয়া দিলাম। তুমি তাঁহার বিষয়ে যেরূপ বলিলে, তাহাতে তাঁহাকে খুব ভাল লোক বলিয়াই বোধ হইল; রাগ করিও

না। তোমার ন্যায় সুরূপা স্ত্রীলোকের এরূপ অসহায় অবস্থায় থাকা কোন মতেই উচিত হইতে পারে না। গত কথাগুলিকে আর মনে স্থান দিওনা। আজি হইতে আমি তোমার মাতৃস্থানীয়া হইলাম—মাতার ন্যায় যত্ন ও স্নেহ করিব, কোনরূপ ক্লেশ জানিতে পারিবে না। আইস, আমার সহিত আইস”—এই বলিয়া সরলাকে লইয়া মাতঙ্গিনী গৃহাভিমুখে চলিলেন।

একবিংশ স্তবক।

পরমহংস পূর্ণানন্দ।

যদি পৃথিবী পুণ্যের আকর হইত—যদি সকল লোকের ধর্ম্মে মতি থাকিত, তাহা হইলে আর এ পৃথিবী শোক তাপের নিদারুণ হাহাকারে পরিপূরিত হইত না। মানবহৃদয় স্বতই তরল, সহজেই পাপদিকে ধায়—সে বেগ অতি অল্প লোকেই থামাইতে পারে। পৃথিবীতে অনেক লোকেই ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বেড়ায়; গায়ে ভস্মমাখা, মাথায় কৃত্রিম বা অকৃত্রিম জটাভার, কৌপীন-পরিহিত অসংখ্য যোগী বা সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচিত লোক নিত্য নিত্য তুমি দেখিতে পাইবে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়জন ধর্ম্মের নিমিত্ত সংসার-ত্যাগী; কয়জন সেই সনাতন, জ্ঞানের অগোচর পরমেশ্বরের জন্য লালায়িত।—বিশেষ অনুসন্ধান কর, দেখিতে পাইবে, হয় ত কেহ উদরের জ্বালায় সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, না হয় ত পুলিসের ভয়ে চুরী ডাকাতি করিতে না পারিয়া, ঐরূপে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়া আপনার উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। যদি তাহাদের মধ্যে কাহাকে বাড়ী লইয়া আইস, উত্তম আহার ও উত্তম শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দাও সে কোন মতে তোমার বাড়ী ছাড়িতে চাহিবে না—সংসারত্যাগী যোগী বা সন্ন্যাসীর আবার ভোগস্পৃহা কোথায়! যে যথার্থ যোগী হইবে, সে লোকালয়ে থাকিবে কেন!—নিবিড় অরণ্য বা মানবসমাগমশূন্য গিরি

গুহায় বাস করিয়া সেই পরমব্রহ্মের আরাধনা করিবে; বন্য ফলমূলই তাহার ভোজ্যস্পৃহা নিবারণ করিবে, কঠিন মৃত্তিকায় শুইয়া সে শয়ন-সুখ অনুভব করিবে। তোমার সহস্র প্রলোভনে সহস্র অনুরোধেও সে তোমার প্রতি কখন ফিরিয়া চাহিবে না—যদি চাহে, তবে তোমার সহিত কখন লোকালয়ে আসিবে না। বস্তুতঃ পথে পথে যে সকল সন্ন্যাসী সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহাদের অধিকাংশই সাধারণ লোকের ন্যায় ভোগবিলাসী এবং স্বার্থপর—বাড়ার ভাগ এই যে, সুবিধা পাইলে তোমার আমার কোন দ্রব্য অপহরণ করিতে সে কিছু-মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। ফলতঃ ঠগী-নিবারণের সময় অনেক নরঘাতী লোক প্রাণের ভয়ে ঐরূপ সন্ন্যাসী সাজিয়াছিল—তাহাদিগকে পবিত্রচেতা সাধুপুরুষ বলিয়া যত্ন করিতে গিয়া অনেক লোক ধনে প্রাণে মারা পড়িয়া-ছিল।

আর এক কথা; লোকে কথায় কথায় বলে, ইনি একজন পরমহংস, মহা সাধুপুরুষ। কিন্তু পরমহংস হওয়া কথার কথা নহে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর চিনিয়াছেন—পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্ক হইতে পৃথক থাকিয়া, 'আমি'ও 'আমার' এইকথা দুইটী পরিত্যাগ করিয়াছেন; যিনি দূর হইতে মায়ামুগ্ধ মানবের ক্ষণে ক্ষণে সুখদুঃখে চিত্তের প্রফুল্ল ও বিকৃতভাব দেখিয়া হাসেন—যাহার মনে কোনরূপ দ্বিধা নাই—যিনি অতি হেয় পদার্থ এবং সুখসেব্য দ্রব্যকে সমচক্ষে দেখেন—যিনি পার্থিব কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখেন না—যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ষড় রিপুকে জয় করিয়াছেন—যাঁহার হৃদয়ে পাপের লেশমাত্র ও নাই, তিনিই যথার্থ পরমহংস (১); তিনিই যথার্থ ভক্তির ও পূজার পাত্র—তিনি চণ্ডাল হইলেও পরম পূজনীয়। ক্ষণে ক্ষণে ঈশ্বরের নামে মোহিত হইয়া ভূতলে পড়িলে, আমরা তাহাকে পরমহংস বলি না—নাট্যশালার একজন সুদক্ষ অভিনেতাও সেরূপ অভিনয় দেখাইতে পারে।

(১) লালাবাবুকে আমরা একজন পরমহংস বলিলেও বলিতে পারি, কারণ তিনি অনায়াসে অতুল সম্পত্তি তৃণবৎ ভাবিয়া সামান্যবেশে সামান্য লোকের ন্যায় শ্রীবৃন্দাবনে অসাধারণ ভাবে থাকিতেন।

ই চারিটা জ্ঞানের কথা বলিলে, আমরা তাহাকে পরমজ্ঞানী বলিতে পারিনা—রাশীকৃত ধর্ম্মপুস্তক পড়িলে, একজন সামান্য লোক ও সেইরূপ সহস্র জ্ঞানোপদেশ দিইতে পারে।

পরমহংস একেবারে কেহই হইতে পারে না—অনেক চেষ্টা, অনেক সাধনার পর লোকে কতক পরিমাণে সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে কি না সন্দেহ!—একজন সংসারী মায়ামুগ্ধনর কিরূপে একেবারে অতদূর উচ্চদরের লোক হইতে পারে!—অগ্রে তাহাকে পঞ্চভূত আত্মাকে বশে আনিতে হইবে; ষড়রিপুকে জয় করিতে হইবে, সমস্ত স্পৃহা ত্যাগ করিতে হইবে; সুখদুঃখের সকল অবস্থাতেই আত্মাকে দৃঢ় করিতে হইবে; সংসারে থাকিয়া ও কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিবে না, নিয়ত ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে হইবে। যে ব্যক্তি মহাজ্ঞানী হইয়াও সংসার-মায়ায় মুগ্ধ, যে সামান্য অর্থের মান্যের বা যশের লালসা রাখে, তাহার জ্ঞান কোথায়! যে পরমহংস বলিয়া পরিচিত হইয়া ও সমস্ত পার্থিব আকাঙ্ক্ষাই রাখিল, তবে তাহার সহিত একজন সাধারণ লোকের প্রভেদ কি! তাই বলিতেছি, এ পৃথিবীতে যথার্থ ঈশ্বরজ্ঞ লোক অতি বিরল; যদি তোমার আমার ন্যায় সকলেই মহাজ্ঞানী হইত, তাহা হইলে আর এ পৃথিবীতে শোক দুঃখ কিছুই থাকিত না—মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গধামে পরিণত হইত। আমরা যে পরমহংসের কথা বলিব, তাঁহার নাম পূর্ণানন্দ; তিনি আসল কি নকল পাঠকবর্গ তাঁহার আচরণে তাহা বুঝিয়া লইবেন।

পূর্ণানন্দের বাড়ী নিজ বর্দ্ধমানে; বাহ্যিক আকৃতি দেখিলে ভক্তি হয়; তপ্তকাঞ্চন-নিভ গৌরবর্ণ; মুখখানি সুন্দরও তাহার উপরে সুদীর্ঘ শ্মশ্রু এবং স্থূল গুম্ফ; সরল দীর্ঘাকার; বেশ হৃষ্টপুষ্ট; বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বিবাহ করেন নাই, বিবাহে বড়ই বৈরাগ্য—বাল্য হইতেই বিবাহের পক্ষপাতী নহেন, মাতাপিতা অনেক চেষ্টায় ও তাঁহাকে বিবাহিত করাইতে পারেন নাই। এখন জনকজননী উভয়েই গত হইয়াছেন; তাঁহাদের মৃত্যুতে অনেক সম্পত্তি এবং বেশ একখানি উদ্যান-বেষ্টিত সুন্দর দোতালা বাড়ীর অধিকারী হইয়াছেন। যৌবনের সঞ্চার হইতেই তিনি সকলকে ধর্ম্ম-

বিষয়ে উপদেশ দিতেন, বলিতেন, "পৃথিবীতে মায়া বাড়াইবার দুইটী প্রধান বস্তু, কামিনীও কাঞ্চন ; প্রথম স্ত্রীলোক, তাহাতে যদি আবার সে সুরূপা হয়, তাহা হইলে ত মহাবিপদ ; আর দ্বিতীয়, অর্থ। এই দুইটীর লোভ যে সামলাইতে পারিল, সে সংসারের অনেক মায়া কাটাইল। স্ত্রী হইতে সংসারের মায়া বাড়ে ; অর্থ হইতে পাপস্পৃহাও ভোগ সুখের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়"—কিন্তু তিনি নিজে কতদূর সে মায়া কাটাইয়াছিলেন, বলিতে পারি না। ভাল বস্ত্রের এবং শয্যার সুখটা বিলক্ষণ উপভোগ করিতেন এবং স্ত্রীলোক বিষয়ে ও অনেকে তাঁহার অনেক অখ্যাতি করিত ; যাহা হউক বাহিরের আড়ম্বরে গ্রামের অনেক লোকেই ভুলিয়াছিল ; মুখে নিয়ত ঈশ্বরের নাম ; সর্ব্বদা বেদান্ত, উপনিষৎ আদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন, লোককে সর্ব্বদা উৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতেন, কাজেই গ্রামের জন কয়েক ব্যতীত সকলেই তাঁহাকে একজন পরম সাধুপুরুষ বলিয়া মনে করিত।—আমাদের মাতঙ্গিনীর তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস ছিল—তিনি মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট আসিয়া ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতেন।

সরলাকে লইয়া মাতঙ্গিনী বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। একে সে স্বভাব সুন্দরী, তাহাতে আবার পূর্ণযৌবন ; সর্ব্বশরীরে লাবণ্য চল চল করিতেছে—মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুল, আর তাহার চারি পার্শ্বে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাশি দুলিয়া দুলিয়া সে সৌন্দর্য্য আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে—যেন সাক্ষাৎ রতি শাপভ্রষ্টা হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বৃদ্ধা ভাবিল, "এ সৌন্দর্য্যে অনেক পাপ বৃদ্ধি করিতে পারে ; একবার এক বিপদে পড়িয়াছিল, কি জানি আবার কোন পাপ-পিশাচের চক্ষে পড়িয়া কোন নূতন বিপদে পড়ে ; জানি বটে, ইহার চরিত্র এখনও নির্ম্মল আছে ; পূর্ব্বে যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, এখনও তাহাকে আন্তরিক ভাল-বাসে ; তবুও বলা যায় কি, কখন কি ঘটে। যাহার ধর্ম্মে অচলা ভক্তি থাকে, তাহার মন কখন বিচলিত হয় না—পরমহংস মহাশয়ের কাছে ইহাকে লইয়া যাইয়া ধর্ম্মোপদেশ শুনাইব—তাহা হইলে ইহার চিত্ত-

সংযমের ক্ষমতা আরও দৃঢ় হইবে।”—এই ভাবিয়া মাতঙ্গিনী সরলাকে একদিন পূর্ণানন্দের কাছে লইয়া যাইবার জন্য মনস্থ করিলেন। বৃদ্ধা বাস্তবিক অন্তরের সহিত সরলার হিতকামনা করিতেন।

একদিন অপরাহ্ন সময়ে মৃদুমন্দ পবন বহিতেছে—পরমহংস মহাশয় আপনার উদ্যানের মধ্যে, পথের নিকটে একখানি মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া আছেন; সম্মুখে একখানি হাতে লেখা শাঙ্করভাষ্য রহিয়াছে—তিনি সেইখানি আপন মনে গুণ গুণ করিয়া পাঠ করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে রাস্তার দুইদিকে উৎকণ্ঠিত মনে চাহিয়া দেখিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ তিনি দূর হইতে সরলার সহিত মাতঙ্গিনীকে দেখিতে পাইলেন; অমনি পুঁথীখানি বাঁধিয়া একটী ঈশ্বর-স্তোত্র গায়িতে লাগিলেন—

“সেই সে পুরুষ (ভজ সেই পুরুষ) রসিক রমণীর মনোরঞ্জন।
তিলেক বিচ্ছেদে যার, এই দেহ শবাকার,
স্ত্রীপুত্র শ্রী নশ্বর, জেনে কি জাননা মন।
যে জন জেনেছে সার, তুচ্ছ ক’রে লোকাচার (তুচ্ছ ক’রে ত্রিসংসার)
ভজে তাঁরে অনিবার, ক’রে আত্মসমর্পণ॥”

স্তোত্রটী ও সমাপ্ত হইল, আর মাতঙ্গিনী আসিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সরলাকে দেখিয়া পূর্ণানন্দ মোহিত হইয়া গেলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন—মরি! মরি! কি সুন্দর মুখখানি! আমরি! মরি! কি লাবণ্য-ছটা! কি অঙ্গসৌষ্টব!—পূর্ণানন্দ সতৃষ্ণ নয়নে সরলাকে দেখিতে লাগিলেন—কোন কুচরিত্র লোক পথে কোন সুরূপা নারী দেখিলে, লোকলজ্জা-ভয়ে তাহাকে যেরূপ বক্র দৃষ্টিতে দেখে, আমাদের পরমহংস ও সরলাকে সেইরূপ আড় চক্ষে দেখিতেছিলেন।

বৈষ্ণবী বলিলেন, “প্রভো! এ একটী অনাথা বালিকা—এই বয়সে সকল সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; ইহার জীবন এখন অশান্তিময়, ইহাকে শান্তি দিতে হইবে, যাহাতে ইহার ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা হয়, সে চেষ্টা আপনাকে করিতে হইবে।”—এই বলিয়া মাতঙ্গিনী সরলার জীবনের ঘটনাগুলি আখ্যাত করিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

"কিন্তু অনেক ক্ষণ গেল, এখনও উত্তর দিলেন না কেন?" এই ভাবিয়া, বৈষ্ণবী পরমহংসের প্রতি চাহিলেন; দেখিলেন যে, তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে; তখন মনে করিলেন, "প্রভু এখন সমাধিতে আছেন—অন্তর্দৃষ্টিতে সেই পরমাত্মাকে দেখিতেছেন; সেই জন্য জড় জগতের কিছুই তিনি দেখিতে পাইতেছেন না—বাহিরের উচ্চ চীৎকারও এখন তাঁহার কর্ণে স্থান পাইতেছে না।"

পূর্ণানন্দ অনিমিষলোচনে সরলার রূপরাশি দেখিতেছিল, কিন্তু যখন সে অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে দেখিতে পাইল যে, বৈষ্ণবী তাহার প্রতি চাহিতেছে, তখন সে কতক ভয়ে কতক লজ্জায় সে তৃষ্ণার কতক পরি-তৃপ্তি করিয়া বৈষ্ণবীর দিকে চাহিয়া, যেন কিছুই জানে না, এই ভাবে বলিল, "কতক্ষণ আসা হইয়াছে।"

বৈষ্ণবী পুনরায় পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই অল্পক্ষণ হইল, আপনার চরণ দর্শন করিতে আসিয়াছি। আপনি তখন সমাধিতে ছিলেন বলিয়া, কিছুই জানিতে পারেন নাই; বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই আসা।"

আবার সরলার প্রতি পূর্ণানন্দের চক্ষু পড়িল—এবার বড় শক্ত কথা; সরলার সহিত চারি চক্ষের মিলন হইল—সেই সুন্দর চক্ষু দুইটী দেখিয়া সে সকলই ভুলিয়া গেল, বৈষ্ণবী যাহা বলিল, তাহার একটী কথাও সে বুঝিতে পারিল না; না পারিয়া অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

বৈষ্ণবী পুনরায় সরলার কথা বলিলেন; বলিয়া অবশেষে কহিলেন, "আমি সরলাকে আপনার আশ্রয়ে রাখিতে চাহি; আমি একে অজ্ঞান, তাহাতে আবার সামান্য স্ত্রীলোক—আমি ধর্ম্মের বিষয় কি বুঝি!—আপনার পদপ্রান্তে বসিয়া চিরজীবন ধর্ম্মকথা শুনিলেও কিছু শিখিতে পারি কিনা সন্দেহ!—তাই আমার একান্ত ইচ্ছা যে, সরলা আপনার নিকট ধর্ম্মোপ-দেশ শুনে।"

ভণ্ড যোগীর মুখ প্রফুল্ল হইল—যদি মাতঙ্গিনী মানব-চরিত্র বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে পূর্ণানন্দের মুখমণ্ডলের ভাব দেখিয়া অনায়াসেই

জানিতে পারিত যে, ইহার হৃদয়ে কোন কুঅভিপ্রায় আছে; কিন্তু বৃদ্ধা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।

প্রফুল্লমুখে একবার বৈষ্ণবীর মুখপানে চাহিয়া, তার পর সরলাকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে পূর্ণানন্দ বলিল, "বেশ! বেশ! আমি সরলাকে কায়মনোবাক্যে এরূপ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট উপদেশ দিব, যাহাতে সরলা শীঘ্রই একজন মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিবে।"

মাতঙ্গিনী পুনরায় প্রণাম করিয়া, বলিলেন, "কল্য আবার আমি আসিতেছি; কিন্তু এরূপ সুন্দরী যুবতীকে পথে লইয়া আসা বড় ভাল দেখায় না; আপনি মধ্যে মধ্যে যদি আমার বাড়ীতে অনুগ্রহ করিয়া পদধূলি দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।"

ঈষৎ হাসিয়া সরলাকে দেখিতে দেখিতে হৃষ্টচিত্তে পরমহংস বলিল, "যা বলিলে তাহা ঠিক; সরলার ন্যায় সুন্দরীকে পথে বাহির করা কোন-মতেই উচিত নহে; আমি প্রত্যহই তোমার বাড়ীতে যাইব।"

পূর্ণানন্দের এই উত্তরে মাতঙ্গিনী আপনাকে চরিতার্থ ভাবিয়া সরলাকে লইয়া বাড়ী আসিলেন।

তখন আমাদের রসিক চূড়ামণি পূর্ণানন্দ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "মূর্খ আমি! যদি এ সুবিধা ছাড়ি। এই বয়সে অনেক স্ত্রীলোক দেখিয়াছি, অনেকবার অনেককে লাভও করিয়াছি; কিন্তু এরূপ রূপত কখনও দেখি নাই। 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি,' একথা যখন শাস্ত্রকারেরাই বলিয়াছেন, তখন কেন আমি এরূপ সুন্দরী রমণী আয়ত্তে পাইয়া, তাঁহাদের বাক্যের সার্থকতা না করিব! তবে লোকলজ্জা, তা ব'য়েই গেল। লোকে দূষিবে, শত্রুপক্ষ টিটকারী দিবে, যাহারা আমাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছে, তাহারা লজ্জায় ও ঘৃণায় মরমে মরিয়া যাইবে, তা কি করা যাইবে; যতদিন পারিলাম, মনের সাধে দশজনের ভক্তিপূজা গ্রহণ করিলাম, সকলের চক্ষে ধূলি দিলাম; তাই বলিয়া, এখন আমি ইহার আশা কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিব না। কোন মতে যদি সরলার মন লওয়াইতে পারি—পারিব না কি! সে একজন সামান্য দরিদ্রের মেয়ে বইত নয়,

তার উপর আবার ওরূপ চরিত্র, একজনের সহিত সামান্য লোভে মজিয়া গিয়াছিল, সে আমার এত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কি ভুলিবে না!—কিন্তু একেবারে নয়, ক্রমে ক্রমে তাহার মন পাইতে হইবে; ভয় কি! নীলু খুড়ো ত সহায় আছে—আর তার মনের ভাব, তা গদার মাকে দিয়ে পাওয়া যাবে। লোকের তীব্র উপহাস আমি অনায়াসেই সহ্য করিতে পারি, কিন্তু সরলার আশা কোন মতেই ত্যাগ করিতে পারিব না—তেমন তেমন দেখি, না হয়, উহাকে লইয়া দেশত্যাগী হইব।”

এইরূপে পাপী আপনার ভবিষ্যৎ কার্য্যের পাপ কল্পনা করিতে লাগিল।

দ্বাবিংশ স্তবক।

আগন্তুকের ধর্ম্মোপদেশ।

সরলা, মাতঙ্গিনীর বাটীতেই রহিল—মাতঙ্গিনীকে সে মা বলিয়া ডাকিত; পরমহংস মহাশয় প্রায় প্রতিদিন আসিয়া সরলাকে উপদেশ দিতেন; ‘কাহাকে পাপ কহে, পুণ্য কি!—কিরূপে চিত্ত সংযম করা যায়, কিরূপে ষড়রিপুকে জয় করা যায়; কিরূপে জীবাত্মা সেই সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার স্বরূপত্ব জানিতে পারে,’ এই সকল বিষয় সরলাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু মনে তাহার সেই কুঅভিলাষ সর্ব্বদাই জাগরূক—মুখে অমৃত, উদরে গরল। সরলার রূপ সে সর্ব্বদাই ধ্যান করিত—সরলাকে আপন আয়ত্তে আনিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে মাতঙ্গিনীর অবর্ত্তমানে সেই বাড়ীতে আসিয়া সরলাকে ঐরূপ উপদেশ দিত, আর সরলার মুখপানে চাহিয়া হাসিত; হাসিয়া তাহার মন পরীক্ষা করিত। সরলা তাহাতে কিছুমাত্রও লজ্জা বা সঙ্কোচ করিত না, কারণ পূর্ণানন্দকে একজন মহাজ্ঞানী পরম সাধুপুরুষ বলিয়াই তাহার মনে ধারণা হইয়াছিল।

সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; উন্নত গিরিশীর্ষে সূর্য্যের সেই হেমাভ মুকু-

কিরণ আর পড়িয়া নাই। প্রকৃতি দিগম্বরীবেশে পৃথিবী আক্রমণ করিতে, আসিতেছে—সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া যেন সমস্ত জগৎবাসী ভয়ে নীরব ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে; তাহার মস্তকে হীরকখচিত মুকুট—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি তাহার সামান্য হীরকখণ্ড, আর চন্দ্র কহিনুর; পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে, যে তাহার সমকক্ষ হইতে পারে!

মাতঙ্গিনীর গৃহে আজ এ সময়ে অনেক লোক সমাগত হইয়াছে; আমাদের পরমহংস মহাশয় ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন—অনেক প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা রমণীতে বাড়ীটী ভরিয়া গিয়াছে; তাহারা দূরে বসিয়া আছে—সরলাও তাহাদের সহিত বসিয়াছিল। নিকটে দুই একটী ধর্ম্মভীরু লোক পূর্ণানন্দের নিকটে বসিয়া, তাঁহার সেই সুধামাখা কথাগুলি এক মনে শুনিতেছে—আর মাঝে মাঝে প্রেম-অশ্রুজলে প্লাবিত হইতেছে।

পরমহংসের ছিদ্রান্বেষী জন কয়েক কুচরিত্রের লোক বাড়ীর কিছু দূরে দাঁড়াইয়া পূর্ণানন্দের বিষয় লইয়া কি বলাবলি করিতেছে—

একজন বলিতেছে, "ওহে ভণ্ড পরমহংসের বিদ্যা বুদ্ধি ধরা পড়েছে।" আর একজন আগ্রহের সহিত বলিল, "কেন কি হইয়াছে!—সেত চিরকালই ভণ্ড; তার দোষের অভাব কি!—আবার কোন নূতন কাণ্ড করেছে নাকি।"

"না, এমন কিছু নয়," বলিয়া প্রথম ব্যক্তি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিক আগ্রহ সহকারে বলিল, "তবুও শুনিনা—কি বলিতে যাচ্ছিলে, বলনা।"

"না; এই হয়েছে কি! বেটা একটা মেয়ে যোগাড় করেছে—ছুঁড়ীটা দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনই বয়স কম, আমি তাকে দৈবাৎ দেখেছিলাম, কিন্তু অমন সুশ্রী মেয়ে কখন দেখি নাই।"

"বল কি!—সত্য নাকি!"

"আমি কি মিছা বল্‌ছি; ছুঁড়ীর মুখখানা যেন পূর্ণিমার চাঁদ হে!"

"তাইত হে! বেটা একলা একলা ভোগ করবে! সে থাকে কোথায়!"

"এই বৈষ্ণবীর বাড়ীতে; আমাদের যে ঢুকতে দেয় না, তা না হ'লে তোমাকে দেখাতেম; তেমন রূপ তুমি কখন জন্মে দেখনি।"

"জোর ক'রে ঢুক্‌লে হয় না।"

"না, জোরে কাজ নাই, শেষে এক করতে আর হবে ; যা হোক্ ও ভণ্ড বেটার ভণ্ডামিটা বার ক'রে দিতে হচ্চে।"

"তাইত হে, বেটার যে বড় জোর কপাল দেখ্‌চি," এই বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি হি-হি-হি করিয়া হাঁসিয়া উঠিল।

"বেটা আবার মেয়েটীকে ধর্ম্মের উপদেশ দেয়—তা বেশ ধর্ম্মই শেখাবে।"

তাহারা ঐরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল—আর চারিপার্শ্ব ঘেরিয়া তাহাদের মত লোক ঐ সকল কথা আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল।

আমাদের পূর্ণানন্দ উপদেশ দিতেছেন—

"যিনি ভক্তি সুখের অভিলাষ করিবেন, তাঁহাকে সকল সুখের আশা একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। ভুক্তি মুক্তি স্পৃহারূপ পিশাচীকে হৃদয়ে স্থান দিবে না ; যত দিন সে অন্তরে বলবান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই হৃদয়ে কিরূপে ভক্তি সুখের উদয় হইতে পারে ? আর যাঁহারা মোক্ষপদকে সামান্য জ্ঞান করিয়া তাহাতে বিশেষ অনিচ্ছা প্রদর্শন করেন, শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তি দ্বারা যে প্রেম জন্মে, সেই প্রেম, তাঁহাদের মন ও প্রাণ হরণ করিয়া থাকে।"—আর মাঝে মাঝে সরলার প্রতি এক একবার কটাক্ষে চাহিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছেন।

এমন সময়ে বাহিরের জনতার ভিতরে একজন ছিন্নবসনধারী মাথায় রুক্ষ জটাভার লোক প্রবেশ করিল ; যাহারা পূর্ণানন্দের কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তাহারা যেন ত্রস্ত হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল ; সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া হন্ হন্ করিয়া বৈষ্ণবীর গৃহে প্রবেশ করিল ; সকলে অবাক্ ও চকিত হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। সে কাহারও প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিল—

"শাস্ত্রকারদিগের অসীম উপদেশের অনুগামী হইয়া জ্ঞান সাধন করিলে, কেবল মাত্র বিশ্বাস জন্মে ; সেই বিশ্বাস হইতে সন্তোষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু উহা দ্বারা কোটী কোটী জন্মে ও কুণ্ডলিনী চেতনে আত্মার সাক্ষাৎকার

দুর্লভ। তোমরা মনে কর যে, জ্ঞানই দিব্য চক্ষু—জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে স্মরণ করিলে আত্ম-দর্শন হয়; ভ্রমান্ধ জীব, তাহা কথনই হইবার নহে। সদ্গুরুর কৃপা না হইলে দিব্য চক্ষু লাভ হইতে পারে না। সদ্গুরু যাহার শুভাদৃষ্ট ক্রমে লাভ হয়, সেই জানিতে পারে যে, দিব্য চক্ষু কি! এবং সেই-ই দিব্যচক্ষে সচ্চিদানন্দময় আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে। যাঁহারা হরি-ভক্তি পরায়ণ, অন্য দেবতাদিগের উপাসনা না করিয়া অনন্য মানসে শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণাদি নববিধ ভক্তির মধ্যে একটী দ্বারাও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজনা করেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সদ্গুরু হইয়া তাঁহাদিগকে ভবার্ণবে উদ্ধার করেন।”

এই বলিয়াই সে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া হরিগুণ গায়িতে লাগিল—

“হের নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী; শ্যাম নীলপদ্ম জিনি, রাই চম্পক বরণী।
উভয়ে মিলেছে যেন নবমেঘে সৌদামিনী।
শোভিছে বাঁপদে রতন পাঁজর ; ডান পদে শোভিতেছে হেম নূপুর-নাগিনী।
বাম অঙ্গ নীলাম্বরে কি শোভিছে হের মা ; ডান অঙ্গে পীতাম্বরের নাহিক তুলনা ;
উভয়ে মিলিয়া দাঁড়ায়ে সেখানে, বিতরিছে রূপ সুধা, নিস্তারিতে তাপিত প্রাণী।
আধ কটি বেড়া দেখ চন্দ্রহারেতে ; আধ কটি শোভিত পীতধড়াতে ;
আধই নটবর, আধই মনোহর ; আধে কাঁচরি শোভে, আধে চন্দনলেপনী।
ডান করে ধরিয়াছে মোহন বাঁশরী ; বাম করে শোভে নীল বলয় চুড়ী।
পদ্মপলাশলোচন একই ; অপর মৃগনয়ন, তাহে কাজর নিছনি।
হিরণ-কিরণ হয় আধ বরণ ; আধ অঙ্গ নীলমণি-জ্যোতিঃ সমান ;
যাহার নাহিক উপমা জগতে ; বনমালা আধে শোভে, আধে মতির গাঁথনি।
একই শ্রবণে দোলে মকর কুণ্ডল, অপর শ্রবণে হের রতন ছবি ;
আধ ভালে চাঁদ, আধ ভালে রবি ; আধ শিরে শিখিপুচ্ছ, আধে দোলে বেণী।”

এই বলিয়া সে উন্মত্তের মত নাচিতে নাচিতে বলিতে লাগিল, “ভাই সকল, তোমরা একবার সকলে মিলিয়া হরিধ্বনি কর, আর প্রেমনেত্রে রাধাকৃষ্ণের একদেহ একবার চাহিয়া দেখ।”

এই বলিয়া সে হরিগুণ গায়িতে গায়িতে, আর কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল ; তখন মহা হরিবোলের ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু সে কোথা হইতে আসিয়াছিল, কেহই তাহা জানিত না, এবং

কেহ তাহাকে কখন দেখেও নাই। শ্রোতৃবর্গ সকলেই তাহার উপদেশে ও সঙ্গীতে মোহিত হইয়া পড়িলেন—সরলা ও বৈষ্ণবী প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া গেল। আর আমাদের পরমহংস ভাবে বিভোর হইয়া নাচিতে নাচিতে অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন; সকলেই বলিতে লাগিল যে, 'প্রভুর প্রেম-বিকার হইয়াছে—প্রভুর ভাব লাগিয়াছে'—কিন্তু সকলই ভণ্ডামি, সকলই লোক দেখান। কিয়ৎক্ষণ নীরবে পড়িয়া থাকিয়া সে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় নাচিতে নাচিতে আপনার বাড়ী চলিয়া গেল। সকলে মনে করিল, 'যথার্থ ভক্ত বটে।'

ত্রয়োবিংশ স্তবক।

বৈষ্ণবী মাতঙ্গিনী।

"বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী, শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডামগ ডম্ফ, ডিমিকি ডিমি মাদল,
রুণু ঝুনু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি, বলয়া কনয়া মণি,
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব, মুরজ, স্বরমণ্ডল,
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি, মৃদঙ্গ গরজনি,
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥"

বৈষ্ণবী মাতঙ্গিনী বিদ্যাপতির উক্ত কবিতাটী বলিয়া সরলাকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিতে রাসবিহার বুঝাইয়া দিতেছেন।

মাতঙ্গিনী নিতান্ত মূর্খ ছিলেন না; বাঙ্গালা ভাষা বেশ শিখিয়াছিলেন, সহজ সহজ সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ ও তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন।

ধর্ম্মের সার মর্ম্মও তিনি কথঞ্চিৎ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি রাসলীলা-ছলে প্রাচীন কবিরা যে প্রকৃতি পুরুষের মিলন দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহারই বর্ণনা করিতে লাগিলেন—"বসন্তকাল; চারিধারে মধুর বসন্ত বায়ু বাহিত হইতেছে; কুঞ্জবনে রাশি রাশি সুগন্ধ কুসুম ফুটিয়াছে—চারিধারে গন্ধ-বহ সেই সকল প্রস্ফুটিত ফুলের সৌরভ লইয়া ছুটাছুটী করিতেছে—সখীগণ রাধাকৃষ্ণকে বেড়িয়া নাচিতেছে, গাইতেছে, বাজাইতেছে: রাধাকৃষ্ণের গলায় বনমালা, সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পাভরণ; তাঁহারা রাসলীলায় উন্মত্ত হইয়াছেন।"—এই সকল বলিয়া বৈষ্ণবী আবার বলিতে লাগিলেন—

"আজকাল অনেক ভণ্ড বৈষ্ণবেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে সামান্য মানবের ঐহিক পাপ-প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ভিন্ন আর কিছুই মনে করে না। আর সেই ধূয়া ধরিয়া, 'যখন দেবতারাই এই কাজ করিয়াছেন—তখন আমরা সামান্য মানব হইয়া কিরূপে তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে পারি। আমরা যাঁহাদের উপাসক, তাঁহারাই যখন এই কাজ করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাদের অনুগামী হইয়া কেন না তাঁহাদের ন্যায় কার্য্য করিব!'—এইরূপ কহিয়া তাহারা অনেক জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বাস্তবিকই আজকালকার অনেক ভেকধারী বৈষ্ণবেরা ঘৃণার বস্তুই বটে, তাহাদের জন্য যথার্থ ভক্ত বৈষ্ণবেরাও অনাদরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মে অনেক জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান প্রবেশ করাইয়া, তাহারা ওরূপ পবিত্র ধর্ম্মকে অপবিত্র করিয়া তুলিয়াছে।"

সরলা বলিল, "যথার্থ রাধাকৃষ্ণ কি?"

বৈষ্ণবী বলিলেন, "সরলা, তুমি আজ বড় কঠিন কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ; ও বিষয়ের বর্ণনা ব্রহ্মাদির ও সাধ্যাতীত, তবে আমি এতকাল সাধু-মুখে যাহা কিছু শুনিয়াছি, এবং তাঁহাদের গ্রন্থ পড়িয়া যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহাই আজ তোমাকে বলিব, তুমি একাগ্র চিত্তে শ্রবণ কর"—এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—

"শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণ তম, অর্থাৎ তাঁহার কিছুমাত্র অপূর্ণতা নাই; তিনি রাধাবল্লভ, তিনি সকলের অন্তরাত্মা; তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ সকল স্থানেই

তিনি বর্ত্তমান আছেন, আর যত সুরেন্দ্র, মুনীন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব অনন্ত ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলে মহানন্দে সেই ভক্তপ্রিয়, ভক্তনাথ, ভক্তানুগ্রাহক রাধার বক্ষঃস্থলবিহারী, রাসেশ্বর সুরসিক শ্যামসুন্দর হরিকে পরমানন্দে ভক্তিপূর্ব্বক বন্দনা করেন।

"যিনি পরমাত্মারূপী প্রকৃতি এবং পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হরির প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যিনি আপামর, সাধারণ সমস্ত রমণীগণের প্রিয়া ও সর্ব্বদা প্রার্থনীয়া, তাঁহারই নাম শ্রীরাধা।

"শ্রীরাধা, পরমাদ্যা শক্তি; শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর। ঈশ্বর যে শক্তিতে এই সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকেই ভক্তেরা রাধা নামে উক্ত করিয়া থাকেন। শক্তি ভিন্ন কিছুই হয় না, শক্তির বলেই সমস্ত জগৎ চলিতেছে, শক্তির বলেই তুমি অনেক কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ; যাঁহার যত অধিক শক্তি, সেই তত দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম। তোমার যতই সেই শক্তির লাঘব হইতে থাকিবে, ততই তুমি সামান্য হইতে অতি সামান্য শ্রমের কার্য্য পর্য্যন্তও করিতে অক্ষম হইবে; এবং অবশেষে যখন সেই শক্তি একেবারে তোমাকে ত্যাগ করিবে, তখন লোকে তোমাকে মৃত কহিবে। রাসলীলা আর কিছুই নহে, আদ্যাশক্তির সহিত পরমেশ্বরের মিলন—কাজেই সমস্ত জগৎ আনন্দময়।"

সরলা বলিল, "তবে আপনি রাধিকাকে পরমাশক্তি বলেন।"

বৈষ্ণবী বলিলেন, "হাঁ, রাধিকা পরমাশক্তি, আর শ্রীকৃষ্ণ পরম ঈশ্বর। সেইজন্য, যখনই রাধিকার সহিত বিরহ হইত, তখনই কৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া যাইতেন; শক্তি ভিন্ন তিনি কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, শক্তি ভিন্ন তিনি দুর্ব্বল। আবার শক্তি ও তাঁহার অভাবে মৃতপ্রায়—আদ্যাশক্তি তাঁহারই বস্তু; যেমন একটী ছোলার ভিতর, দুইটী ডাল থাকে, সেইরূপ রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন দেহ হইলেও একাত্মা। যখন রাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হইল—তখন রাধার মন নিয়ত তাঁহারই প্রতি নিরত; তাঁহারই রূপ ধ্যান করিয়া তিনি দিন কাটাইতেছিলেন; ভক্ত বিদ্যাপতি রাধিকার বিরহের কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, শুন—

"সজনি কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ পয়োধি, পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পতিয়াই।
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়নু,
খোয়নু এ তনুক আশা॥
বরিখ বরিখ করি, সময় গোঙায়নু,
খোয়নু জীবনক আশে।
হিমকর-কিরণ, নলিনী যদি জারব,
কি করিব মাধবী-মাসে॥"

--গায়িয়া বৈষ্ণবী আবার বলিতে লাগিলেন—

"দেখ, কতদূর ধৈর্য্য। এইরূপ ধৈর্য্য সকলেরই হওয়া উচিত। বাস্তবিক ইহ জগতে স্ত্রীর এক স্বামী এবং পুরুষের এক স্ত্রী ভিন্ন দুই হওয়া অসম্ভব। চিত্তে চিত্তে মিলিয়া যাহারা একচিত্ত হইল তাহারাই স্বামী ও স্ত্রী; উচ্চ কথায় প্রকৃতি পুরুষ। এই স্বামী স্ত্রীর কখন বিচ্ছেদে হয় না—মৃত্যু একটা দেহের রূপান্তর মাত্র। তাহাতে তাহাদের আত্মার মিলনের পার্থক্য ঘটাইতে পারে না। রাধা ও কৃষ্ণের বিচ্ছেদ একটা চাক্ষুষ ঘটনা মাত্র; অন্তরে অন্তরে, মনের মিল তাঁহাদের সমভাবেই ছিল। যখন ঈশ্বরের তিন প্রধান গুণ বলহীন হইয়া ত্রিমূর্ত্তিতে সমুদ্র-তীরে আসীন হইয়া, শক্তির আরাধনা করিতেছিলেন—তখন স্বয়ং আদ্যাশক্তি ও শক্তিহীন হইয়া তাঁহাদের দেহে আবির্ভূত হন। সেইজন্যই পুরাণে আদ্যাশক্তি শবরূপে বর্ণিত আছেন; সংহারে বা ভীষণ প্রলয় কালে শক্তির আধিক্য আবশ্যক হয় বলিয়া, লোকে মহাদেবকে শক্তির স্বামী বলিয়া উল্লেখ করে।"

এই বলিয়া বৈষ্ণবী বলিতে লাগিলেন, "গাও, সেই প্রভুর গুণ গাও—শত মুখে তাঁহার গুণগান কর।"

তখন বৈষ্ণবী উন্মত্তের মত হরি-গুণ গায়িতে লাগিলেন—

"শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল, ধৃতকুণ্ডল, কলিত ললিত বনমাল। জয় জয় দেব হরে।
দিনমণি মণ্ডন, ভবখণ্ডন, মুনিজন মানস হংস। জয় জয় দেব হরে।
কালিয় বিষধর গঞ্জন, জনরঞ্জন, যদুকুল, নলিন দিনেশ। জয় জয় দেব হরে।
মধু মুর নরক বিনাশন, গরুড়াসন, সুরকুল কেলি নিদান। জয় জয় দেব হরে।
অমল কমল দল লোচন, ভবমোচন, ত্রিভুবন ভবন নিধান। জয় জয় দেব হরে।
জনক ভবন সুতাকৃতভূষণ, জিতদূষণ, সমর শমিত দশকণ্ঠ। জয় জয় দেব হরে।
অভিনব জলধর সুন্দর, ধৃতনন্দন, শ্রীমুখচন্দ্রচকোর। জয় জয় দেব হরে।
তব চরণে প্রণতাবয়, মিতি ভাবয়, কুরুকুশলং প্রণতেষু। জয় জয় দেব হরে।"

বৈষ্ণবীর এরূপ প্রেমোন্মাদ অবস্থা দেখিয়াও তাহার মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া সরলা প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়িল—তাহার দুই চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; বৈষ্ণবীর উপদেশে কৃষ্ণ-প্রেম ক্রমে তাহার হৃদয়কে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়াছিল।

চতুর্বিংশ স্তবক।

গদার মার দৌত্যকার্য্য।

গদাধর দাসের মাকে লোকে সংক্ষেপে গদার মাই বলিয়া ডাকিত; গদাধর দাস, জাতিতে সূত্রধর; সে আপনার জাতীয় ব্যবসায়ে বিলক্ষণ পারদর্শী ছিল; অনেক ভাল ভাল কাঠের গড়ন সে গড়িতে পারিত—কলিকাতায় কোন জানিত কারখানায় সে ৩০৲ টাকা মাহিনায় চাকর ছিল। গদাধর বিবাহ করে নাই, যাহা রোজগার করিত, মদে ও বেশ্যায় তাহার সকলই উড়াইয়া দিত, হয় ত কখন কখন কোন মাসের খাই খরচ ও বাসা ভাড়ার জন্য তাহাকে টাকা ধার করিতে হইত। মাকে সে কখন এক পয়সাও দিয়াছিল কি না সন্দেহ!—সেই জন্য গদার মাকে বৃদ্ধ বয়সে ও খাটিয়া খাইতে হইত।

গদার মা পূর্ণানন্দের বড় বিশ্বাসী চাকরাণী; পূর্ণানন্দ তাহাকে সকল বিষয়ে বিশ্বাস করিত; তাহার চরিত্রের অনেক অপ্রকাশ্য ঘৃণিত কথা

পর্য্যন্তও সে জানিত—এমন কি অনেক বার সে সেই সকল বিষয়ে ভণ্ড পরমহংসের সহায়তা ও করিয়াছিল। গদাধরের মা এখন বৃদ্ধা, বয়স ষাট পঁয়ষট্টির উপর; যৌবনে তাহার চরিত্র কিরূপ ছিল, বলিতে পারি না—একে বালবিধবা, তাহাতে অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা, ধর্ম্মে তাদৃশ মতি থাকা সম্ভব নহে; সে প্রত্যহ স্নানের পর একখানি এক পয়সার টিনের আর্শিতে মুখ দেখিয়া নাকে তিলক কাটিত; তিলক মাটী গুলিয়া, সর্ব্বাঙ্গে "হরে-কৃষ্ণের" ছাপ পরিত—আর তাহার পর প্রায় এক আধ ঘণ্টা মালা ফিরাইয়া তবে জল খাইত; কখন বা কৃষ্ণলীলা গাহিতে গাহিতে উন্মত্ত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিত; লোকে বলিত, সৎসঙ্গে স্বর্গবাসের এই একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। যাহা হউক, এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখুন যে, পূর্ণানন্দ তাঁহার অত্যন্ত গোপনীয় ও দুঃসাধ্য কার্য্যের ভার তাহার ও কাণা নীলরতন নামে একজন প্রধান শিষ্যের উপর দিত—উভয়েই কে কিরূপ চরিত্রের লোক, পাঠকবর্গ তাহা ক্রমেই জানিতে পারিবেন। গদাধরের মার নাম কি, তাহা আমরা জানি না, তবে তাহার প্রভু ও অপরাপর পরিচিত লোকেরা তাহাকে "গদার মা" বলিয়াই ডাকিত, কাজেই অগত্যা আমাদিগকে ও উহাকে উক্ত নামেই অভিহিত করিতে হইল।

পূর্ণানন্দের মানস পূর্ণ হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিল—সে এক ঘটাইতে আর ঘটাইল—সরলাকে ধরিতে যাইল, জঘন্য কৃমিপূর্ণ নরকের কীট, হইয়া উঠিল স্বর্গের দেবতা। পূর্ণানন্দ চেষ্টার ক্রটী করে নাই—সে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের এক প্রকার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া, সরলাকে কুচরিত্রা করিবার চেষ্টায় ছিল। 'পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি থাকে না—পার্থিব প্রণয় ভিন্ন ঈশ্বর-প্রেম জন্মায় না,' এইরূপ নানামত ব্যর্থ কথা বলিয়া, মাতঙ্গিনীর অবর্ত্তমানে সরলার মন পরীক্ষা করিত; কিন্তু সরলা সেই সকল সুভাবে লইয়া দিনে দিনে আরও ধর্ম্মপরায়ণা হইতে লাগিল—তাহার উপর আবার মাতঙ্গিনীর উপদেশে তাহার চিত্ত আরও স্থির ও অটল হইয়া উঠিল।

নিষ্ফল প্রণয়-যন্ত্রণা ক্রমে পূর্ণানন্দের অসহ্য হইয়া উঠিল, সে ভাবিল, 'এওত বড় বিপদ—গড়িতে গেলাম ঠাকুর, হইয়া উঠিল, বানর' দরিদ্র গৃহেও

এমন রমণী জন্মে। আমি এই বয়সে অনেক কার্য্য করিয়াছি, অনেক স্ত্রীলোককে কুলে কালি দেওয়াইয়াছি; কই এত কষ্ট ত আমায় কখন পাইতে হয় নাই; দেখি, আমার দূতী এবিষয়ে কি পরামর্শ দেয়, এই ভাবিয়া সে একদিন গদার মাঁকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, "দেখ্ গদার মা, কি করা যায় বল্ দেখি!—একটা উপায় ঠাওরাইতে পারিস্।"

গদার মা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কি কর্‌তে হবে বল না—কোন মেয়ে টেয়ের দরকার না কি!—আর পারি নি বাবু, তোমার জন্যে ঘটকালি কর্‌তে কর্‌তে প্রাণটা গেল—কত জনেরই শাপমন্যি খেতে হ'ল।"

পূর্ণানন্দ বলিল, "দেখ্, সেই যে সেই ছুঁড়ীটা, যে মাতঙ্গিনীর বাড়ীতে থাকে, দিব্য সুন্দরী বয়স কাঁচা। তাকে যদি কোন মতে হাতে আনিতে পারিস্। আচ্ছা, তার মনের ভাবটা কিরূপ বুঝিস্, বল দেখি! যে রকম দেখিতে পাই, তাহাতে আমার পক্ষে কোন সুবিধা হইবে, বলিয়া ত বোধ হয় না—ছুঁড়ীটাকে দেখিয়া অবধি প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছি, এখন তুই যদি আমায় বাঁচাস্।"

—এই বলিয়া পূর্ণানন্দ বালকের মত গদার মার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গদার মা। রসো বাবু, আগে ঠাওরাই। ওঃ সেই ছুঁড়ীটার কথা বোল্‌চো—যাকে আমি দুই চারিবার বৈষ্ণবী দিদির বাড়ীতে দেখেছি, যার পটলচেরা চোখ, দিব্বি নাক, দিব্বি মুখ, টুক্ টুকে রং, যে দেখ্‌তে ঠিক্ সরস্বতী ঠাক্‌রুণের মত; তারই কথা তুমি বল্‌চ।

পূর্ণানন্দ। হাঁ, তারই কথা। তার জন্যে আমার প্রাণ যে কি কর্‌চে তা আর তোকে কি ব'লে জানাব।

গদার মা। তা বাবু, তাকে দেখে ত খারাপ বলে বোধ হয় না—তার সঙ্গে দু একবার কথা ক'য়ে ও দেখেছি। কোন কথার মারপেঁচ কি ফেরফার জানে ব'লে ত বোধ হয় না, কিন্তু বড় বুদ্ধিমান; তবে কি জান, চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

—এই বলিয়া গদার মা চক্ষু ঘুরাইয়া একটু হাসিল।

পূর্ণানন্দ বিষণ্ণ বদনে বলিল, "ওরে, সে বড় শক্ত মেয়ে—কি করিয়া যে তুই তাহাকে বশে আনিতে পারিবি, তাহা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

হাত নাড়িয়া, মুখ ঘুরাইয়া গদার মা বলিল, "আরে রেখে দেও সতীর সতীপনা—ঢের ঢের সতীর সতীত্ব জানা আছে; যদি পাই, তবে রাজার রাণীকে ও বার ক'রে আন্‌তে পারি। তুমি ত সবই জান, গদা যখন কোলে, তখন থেকে তোমার বাড়ীতে আছি, বল্‌তে গেলে তোমাকেই হাতে পিঠে মানুষ ক'রেছি; তোমার কোন্ কাজটা না ক'রে দিয়েছি, বল দেখি! হরি আছেন, অবিশ্যি সহায় হবেন্।"—এই বলিয়া পাপিয়সী এরূপ অসৎকার্য্যেও হরির দোহাই দিল।

পূর্ণানন্দ। ভাল, পারিলেই ভাল। তবে আজ থেকেই চেষ্টা দেখ; কিন্তু মাতঙ্গিনী থাকিলে ত কিছুই হইবে না।

"আঃ! থাকে ত, ফিকির ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে; তবে এখন চল্লেম, নারায়ণ, নারায়ণ", এই বলিয়া হরিনামের ঝুলি হস্তে লইয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে গদার মা আপনার পাপ দৌত্যকার্য্য সাধনের উদ্দেশে চলিল।

বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আসিয়া সে দেখিল যে, মাতঙ্গিনী ও সরলা এক সঙ্গে বসিয়া কি একখানি পুঁথী পড়িতেছে; তখন গদার মা বলিল, "ও বৈষ্ণবী দিদি, তোমাকে একবার প্রভু ডেকে পাঠিয়েচেন—বড্ড দরকার গো, বড্ড দরকার, শীগ্‌গির যাও।"

তখন মাতঙ্গিনী শশব্যস্তে উঠিয়া, 'তবে, আমি যত ক্ষণ না আসি, তুই এখানে ব'সে থাক', বলিয়া চলিয়া গেল।

"তা আর বল্‌তে হবে না, আমার কাজ আমি বেশ বুঝি"—এইরূপ দ্ব্যর্থসূচক কথা বলিয়া সে সরলার নিকট জাঁকিয়া বসিল।

সরলার হস্তের পুঁথী খানির এ পাতা ও পাতা উল্টাইয়া, গদার মা বলিল, "যখন বৈষ্ণবীকে আমি দিদী বলি, আর তাকে তুমি মা বল, তখন তুমি আমার মাসী। আজ থেকে আমি তোমাকে মাসী ব'লে ডাকব—এর

পর যেমন বুঝব, তাই ব'লে ডাকা যাবে। তা হাঁ গা মাসীমা, ওখানা কি পুঁথী গা।"

সরলা। চৈতন্যচরিতামৃত।

গদার মা। আহা, বেশ নামটী ত গা। আমরা মাসী মুখ্যু মানুষ; পড়্‌তে শুন্‌তে জানি নি। তোমরা কত পুণ্যই কর্‌চ। তবু একটু প'ড়ে শুনাও, কাণ দুটো জুড়ুক্।

সরলা। কোন খান্‌টা শুনিবে।

গদার মা। যে খানটা তোমার ইচ্ছে; ধর্ম্মের বই, সকল জায়গাই মিষ্টি লাগ্‌বে।

সরলা পড়িয়া শুনাইতে লাগিল—

"বামা এক গোপীগণ দক্ষিণা একগণ।
নানা ভাবে করায় কৃষ্ণের রস আস্বাদন॥
গোপীগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধা ঠাকুরাণী।
নির্ম্মল উজ্জ্বল রস প্রেমরত্ন খনি॥"

বাধা দিয়া গদার মা বলিল, "আহা বেশ; বেশ মিষ্টি ত; সে কেলে বৈষ্ণব মিন্সেরা এমন ভাল লিখ্‌তে পার্‌ত; আচ্ছা, মাসীমা! আর কোন বই টই কি পড় না।"

সরলা। পড়্‌ব না কেন? বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, রায়শেখর, গোবিন্দ-দাস আদি কত ভক্ত কৃষ্ণ প্রেম-বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাই পড়ি।

গদার মা হাসিয়া একটু নেকা স্বরে বলিল, "আমরা মাসী ঠাক্‌রুণ, মুখ্যু মানুষ, অত বুঝি সুঝিনি।—তাতে কি আছে গা।"

সরলা। তাহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিষয় বর্ণিত আছে—তাঁহাদের অনুরাগ, মিলন, বিরহ আদি তাঁহাদের সকল অবস্থাই লিখিত আছে।

গদার মা। দেখ মাসী ঠাক্‌রুণ, আমরা মুখ্যু লোক, কথার অত দোষ টোষ ধ'রো না, যা সাদা সিদে বুঝি তাই বলি। রাধাকেষ্ট খুব মজা ক'রে গেছেন। রাধা নইলে একা কেষ্টই বা কি করতেন, আর কেষ্ট নইলেই বা রাধিকা তত সুখ পেতেন কোথা! তারাই বাবু সার্থক দেবতা জন্মেছিল।

সরলা তাহার কথার ভাবে চমকিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিল, 'আ। মলো, মাগী বলে কি! মাগী ত বড় বদ লোক দেখ্‌ছি—মাগীর মতলব বড় ভাল নয়।'—যাহা হউক, সে গদার মাকে বলিল, "অমন কথা বলিও না—রাধাকৃষ্ণের প্রেমের ওরূপ জঘন্য বর্ণনা করিও না—তুমি সে প্রেমের বুঝিবে কি!—তাহার গূঢ়ার্থ তুমি জানিবে কি!"

"অত গুড় টুড় বুঝিনি বাবু—যা বুঝি তাই বল্লুম। পুরুষছাড়া মেয়েদের বেঁচে লাভ কি, আর মেয়ে ছাড়া পুরুষেরাই বা সুখ পাবে কোথায়!—মাসীমা, তোমার বুঝি কখন বিয়ে হয় নি গা।"

সরলা গদার মার কথার ভাবে বিস্মিতা ও ভীতা হইল, কিন্তু সাহসে ভর করিয়া বলিল, "কেন?—ও কথায় তোমার কাজ কি!"

গদার মা মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, এমন কিছু নয়, তবে তোমার কথার ভাবে বোধ হয়, তুমি এখন ও রসকসের কিছু ধার ধারো না। তা ত সব শেখা উচিত; বয়সও হয়েছে আর কবে শিখ্‌বে; যদি তুমি মনে কর, তা হ'লে একজন সুন্দর পুরুষ তোমাকে জুটিয়ে দিতে পারি। তার অনেক টাকা; খুব খাবে দাবে, মজায় থাক্‌বে—আহা সে তোমার জন্যে লালায়িত—তোমার জন্যে ভেবে ভেবে সে আদ্‌খানি হয়ে গেছে গো—তুমি যদি তাকে দেখ, তবে দয়া না করে থাক্‌তে পার্‌বে না।"

এতক্ষণে গদার মার আসিবার যথার্থ উদ্দেশ্য সরলা জানিতে পারিল। সে বুঝিল যে, আমাকে নির্জ্জনে পাইবার জন্যই এ কৌশলে মাকে তাড়াইয়াছে। সরলা জানিত যে, সে পূর্ণানন্দের পরিচারিকা, কিন্তু সে যে, পূর্ণানন্দের কথাই বলিতেছে, এ কথা তাহার মনে স্থান পাইল না। অমন ধার্ম্মিক লোকের কখন কি এমন ঘৃণিত ইচ্ছা জন্মিতে পারে! যাহা হউক, লোকটা কে, জানিতে হইতেছে। রাগিয়া উঠিলে এ তাহার নাম প্রকাশ করিবে না, কৌশলে জানিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য সরলা বাস্তবিক গদার মার কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ও নম্র এবং প্রসন্নভাবে বলিল, "তা বেশ ত—কেরে সে?"

গদার মা ভাবিল, 'তবেত আমার কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। আর

বাছাধন যাবেন কোথায়! লোভে পড়িয়াছেন ; পূর্ণানন্দটা বোকা, বলে, একে হাত করা বড় শক্ত কাজ।'—হাসিতে হাসিতে বলিল, "বড় যে সে নন্, আমাদের প্রভু। তাঁর বড় ইচ্ছা যে, তোমাকে সেবাদাসী করেন। তোমার রূপ দেখে তিনি পাগল ; বলেন, 'গদার মা, সরলাকে এনে দে, তা নইলে আমি বিষখেয়ে মরব'—হরিগুণ গায়িতে গায়িতে ভুলে তোমার নাম ক'রে নেচে উঠেন। তোমার কপাল ভাল—তোমায় ভারি ভাল বেসেছেন। আর আমাদেরও চোখ দুটো সার্থক হোক্। দ্বাপরের লোকে রাধাকৃষ্ণকে যুগল মূর্ত্তিতে দেখে চোখ জুড়াত, কলিতে তোমাদের দুজনকে যুগল মূর্ত্তিতে দেখে মর্‌তে পার্‌লেই আমাদের স্বর্গলাভ।"

গদার মার কথা শুনিয়া সরলা চমকিত হইল ; কিছু ক্ষণ জড়প্রায় নিস্পন্দ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল ; যাহা সে কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহাই তাহাকে আজ শুনিতে হইল। সে বিশ্বাস করিতে পারিল না যে, মানব-চরিত্রে এতদূর শঠতা থাকিতে পারে ; অতি নীচ প্রবৃত্তির লোকে ধর্ম্মের আবরণে এরূপে অপরকে বঞ্চনা করিতে পারে। কিন্তু বলা যায় কি, ইহার কথা সত্য হইলে ত হইতে পারে। তাহাকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে হইতেছে। মাকে একথা বলিব, দেখি তিনি শুনিয়া কি বলেন ; তাঁহার পূর্ণানন্দের উপর যে অটল ভক্তি, তিনি আমার কথা বিশ্বাস করিবেন কি! যাহা হউক, ইহাকে ত রূঢ় কথা বলা কোন মতেই হইতে পারে না, তাহা হইলে সমস্তই খারাপ হইয়া যাইবে ; তাই সরলা গদার মাকে মনের ভাব গোপন করিয়া, কৃত্রিম হাস্য সহকারে বলিল, "বলিস্ কি! আমার ত কোনমতেই বিশ্বাস হয় না ; আমার কি এমন ভাগ্য হবে, যে প্রভু আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন, তবে তাঁহার সঙ্গে কেমন করিয়া মিলন হইবে, বল্‌দেখি! মা ত আমাকে বাহির হইতে দেন না ; আমি ত কোন মতে তাঁহার বাড়ী যাইতে পারিব না ; তবে এক উপায় আছে, আমি কাল কোন সূত্রে সন্ধ্যার সময় মাকে কোথাও পাঠাইয়া দিব ; তুই তাঁহাকে কাল খিড়্‌কী দিয়া নিয়ে আসিস্। এই বেশ পরামর্শ কেমন, কিনা।"

গদার মা বলিল, "সেই বেশ কথা মাসীমা, আমি কাল প্রভুকে নিয়ে আস্‌ব ; তুমি সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে রেখ।"

এই বলিয়া গদার মা আপনাকে সফলমনোরথ ভাবিয়া প্রফুল্লমুখে চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ স্তবক।

বিদ্যাবুদ্ধি ধরা পড়িল।

মাতঙ্গিনী বাড়ী আসিলে পর, সরলা তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। তিনি শুনিয়া বলিলেন, "একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে—এও কখন কি হইতে পারে।"

সরলা বলিল, "আপনি অতদূর বিশ্বাস কাহাকেও করিবেন না। আপনার নিজের স্বভাব না কি ভাল, তাই সকলকেই ভাল ভাবেন। যাহা হউক, যখন তাহার বিষয়ে মাগী একটা কথা বলিয়া গেল, তখন সত্য কি মিথ্যা তাহাও ত একবার পরীক্ষা করা উচিত। কাল তাহাকে আসিতে বলিয়াছি ; যদি আসে, তাহা হইলে তাহার অর্দ্ধেক পাপ ধরা পড়িল। তাহার পর সে আমাকে যে সকল কথা বলিবে, আপনি লুকাইয়া সকলই শুনিতে পারিবেন।"

বৈষ্ণবী কৃত্রিম বিরক্তির সহিত বলিলেন, "আচ্ছা দেখা যাইবে" ; কিন্তু মনে মনে তিনি বিলক্ষণ সন্দিহান হইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবীর একটী ঘর অনাবশ্যকীয় বলিয়া প্রায় নিয়ত চাবি দেওয়া থাকিত—সেটী ঠিক্ সরলার শুইবার ঘরের পার্শ্বে। উভয় গৃহের সাধারণ ভিত্তিতে উচ্চে একটী ক্ষুদ্র গবাক্ষ ; সেই ঘরে বসিয়া সরলার ঘরে যাহা কিছু হইবে, অনায়াসে শুনিতে পাইবেন, বৃদ্ধা স্থির করিলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় পূর্ণানন্দ আসিবার কিছু পূর্ব্বে, সরলা মাতঙ্গিনীকে সেই গৃহে চাবিবদ্ধ করিয়া রাখিল।

সূর্য্য প্রায় অস্তগত; দূরে গদার মা-সহ পরমহংস মহাশয় দেখা দিলেন। পরমহংসের সেদিন আর গেরুয়া বসন নাই; বড় জাঁকাল পোষাক—কালা পেড়ে কাপড় পরা, ভাল জামা গায়ে, তাতে সোণার বোতাম লাগান; ঢাকাই চাদর গায়ে; জামার পকেটে গোলাপ জলে ভিজান রুমাল (১); পায়ে মোজা ও ভাল বার্ণিস করা ইংরাজী জুতা; হাতে ছড়ি ও হীরক অঙ্গুরী। গলায় ওয়াচ গার্ড-সহ ঘড়ী ঝুলিতেছে— সর্ব্বাঙ্গে আতরের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে; মাথায় তেড়ি কাটা। রসিক নাগরের এই সুন্দর নাগর বেশ; আবার এদিকে মুখখানি চাদরে ঢাকিয়া লোক লজ্জা টুকু ও নিবারণ করা হইতেছে। আসিল বটে, কিন্তু একেবারে বাড়ীতে প্রবেশ করিল না; কি জানি, যদি মাতঙ্গিনী থাকে; তাই সাত পাঁচ ভাবিয়া মাতঙ্গিনী বাড়ী আছে কি না, জানিবার জন্য গদার মাকে পাঠাইয়া দিল।

গদার মা আসিয়া "বৈষ্ণবী দিদি" "ও বৈষ্ণবী দিদি" বলিয়া এঘর ওঘর সে ঘর খুঁজিতে লাগিল—কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইল না। এদিকে বৈষ্ণবী দিদি যে, চাবিবদ্ধ থাকিয়া কারাবাস যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাহা তাহার কূটবুদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারিল না; সে মনে করিল, ও ঘর ত নিয়তই বদ্ধ থাকে। সে পরমহংসকে যাইয়া বলিল, "চল; বাড়ীর ভিতর সরলা আর তার এক দুই বৎসরের মেয়ে ছাড়া কেউ নাই; দরজায় দরওয়ান বসে আছে; কি জানি, তোমাকে এবেশে দেখে যদি কোন সন্দেহই করে; তাই বল্‌চি, খিড়কীর দরজা খোলা, সেই দিক্ দিয়ে যেও, কেউ দেখ্‌তে পাবে না।"—এই বলিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

'ভাল, ভাল,' এই বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে পূর্ণানন্দ নানারূপ সুখের কল্পনা করিতে করিতে খিড়কী দিয়া সরলার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল; মাতঙ্গিনী কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না বটে, কিন্তু আতরের গন্ধে ও জুতার

(১) তখন আজ কালকার মত এত বিলাতী এসেন্সের প্রাদুর্ভাব ছিল না।

শব্দে তিনি জানিতে পারিলেন যে, পরমহংসের আবির্ভাব হইয়াছে; রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। যাহা হউক, মনের ভাব এখনও ত জানিতে পারা যায় নাই; আর জানিতেই বা বাকী কি!—যখন এত সাজসজ্জা। তত্রাচ তিনি স্থিরভাবে সেই উন্মুক্ত গবাক্ষের নিকট কাণ পাতিয়া তাহাদের সকল কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন।

সরলা বলিল, "আজ আমার কি সৌভাগ্য যে, আপনি আমাকে দয়া করিয়া, আসিয়াছেন—আমি কৃতার্থ হইলাম।"

পূর্ণানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, "অমন কথা বলিও না সরলা, বরং তুমিই আমাকে দয়া করিয়াছ; তোমার রূপতৃষ্ণা আমাকে পাগলের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে—আজি হইতে আমি তোমার ক্রীতদাস হইলাম।"

"আমার কপাল বড় প্রসন্ন, তাই প্রভু আমাকে এত ভাল বাসেন—বসুন, আমি আসিতেছি,"—এই কথা বলিয়া সরলা বাহিরে গেল।

বাহিরে আসিয়া সে ধীরে ধীরে মাতঙ্গিনীর ঘরের চাবি খুলিয়া দিয়া আবার ঘরে আসিয়া বসিল। মাতঙ্গিনী তখনই বাহিরে আসিল; আর বেশী শুনিবার আবশ্যক করে না, এই ভাবিয়া সে সরলার প্রায় পশ্চাৎ পশ্চাতই ঘরে ঢুকিল।

আমাদের রসিকনাগর মাতঙ্গিনীকে দেখিয়াই ভয়ে জড়সড় ও অবাক্। তখন বৈষ্ণবী শতমুখে পূর্ণানন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "আমি কি নির্ব্বোধ; তাহা না হইলে আর তোর ন্যায় একজন দুশ্চরিত্র বঞ্চককে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলাম; তুই ত আপনি নরকেরই যোগ্য লোক, আবার আমাদিগকে ও তার সঙ্গে সঙ্গে নিরয়গামী করিতেছিলি! তুই মানবের মধ্যে অতি ঘৃণিত পশু; একজন সামান্য শিক্ষিত বা বোধযুক্ত লোক যে কার্য্য করিতে ঘৃণা বোধ করে, তুই অনায়াসে সেই কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছিস্! তুই অক্লেশে মনে একটু কষ্ট না ভাবিয়া বেশ হাসি হাসি মুখে একজন সতীর সতীত্ব-নাশে উদ্যত হইয়াছিস্! আর না, এখনই আমার বাড়ী হইতে দূর হ, তোর ছলনা আর খাটিবে না।"

সরলারও মুখমণ্ডল সতেজ ভাব ধারণ করিল—বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধে

সতীর সে কোমল মূর্ত্তি অতি উগ্রভাব ধারণ করিল। তাহার পূর্ণানন্দের প্রতি এতদূর ঘৃণা হইয়াছিল যে, সে যেন তাহাকে ভৎর্সনা করিতে ও ঘৃণা বোধ করিল।

পূর্ণানন্দ সরলার সে ভাব দেখিতে পাইল; মাতঙ্গিনীর ও সে তীব্র ভৎর্সনা শুনিল, তখন এক নৈরাশ্য ও প্রতিহিংসা ব্যঞ্জক অট্টহাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক্, দেখ্‌ব, দেখ্‌ব; কতদিন তুই সতী থাকিস্ দেখ্‌ব। এত তাচ্ছিল্য, এত অপমান, এর প্রতিশোধ নেবই নেব। যদি বেঁচে থাকি, এ কাজের ফল তোদের ভোগাবই ভোগাব। হি! হি! হি! সতী, সতী,"—এই বলিয়া সে এক বিকট হাসি হাসিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল।

মাতঙ্গিনী ও সরলা তাহার ঐরূপ কথায় আতঙ্কে শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনীর বাড়ী রক্ষার জন্য সদরে একজন হিন্দুস্থানী বসিয়া থাকিত; সে তাহাদের সেই মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া ভিতরে আসিতেছিল, তখন পূর্ণানন্দকে দৌড়াইয়া পলাইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া, তাহার পোষাকে তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, কোন বদমায়েস লোক বলিয়া ঠাওরাইল; এবং উত্তম মধ্যম প্রহার না দিয়া ছাড়িল না।

দ্বারপালের নাগরা জুতার আস্বাদনই পরমহংসের যথেষ্ট হইল না। তাহার অদৃষ্টে আরও অপমান ও প্রহার ছিল; বিধাতা তাহার কর্ম্মের প্রতিফল দিবার জন্য যাহা সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, আজ তাহাকে প্রায় সকলই ভোগ করিতে হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পূর্ণানন্দের অনেক শত্রু ছিল; এবং যে দিন পূর্ণানন্দ বৈষ্ণবী মাতঙ্গিনীর বাড়ীতে উপদেশ দেয়, সেই দিন একজন লোক তাহাকে জব্দ করিবার কথা বলিয়াছিল; তাহারা তাহার ছিদ্রান্বেষণে প্রায়ই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত, এখন যেমন দ্বারপাল কর্ত্তৃক ঐরূপে সম্ভাষিত হইয়া সে ছিন্নবেশে দৌড়াইয়া পলাইতেছিল, আর অমনই তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া গেল। তাহারা তাহার অবস্থা এবং সাজসজ্জা দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিল; তখন অনেক অপমান বাক্যের

সহিত এরূপ প্রহার দিল যে, কিছুক্ষণের জন্য তাহাকে অজ্ঞান হইয়া মাটীর উপর পড়িয়া থাকিতে হইল।

এইরূপে যে কত ঘৃণিত চরিত্রের লোক ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সংসারের কত অনিষ্ট ঘটাইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে!

ষড়বিংশ স্তবক।

কাণা নীলরতন (১)।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামে পূর্ণানন্দের গুণের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।—এখানে ওখানে কতলোক, জড় হইয়া তাহার চরিত্রের সমালোচনা করিতে লাগিল। পরমহংস যাহা মনে ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। যাহারা তাহাকে ভক্তি করিয়া আসিতেছিল, তাহারা লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া রহিল; একজন ভণ্ডের প্রতারণায় মজিয়াছিল বলিয়া, অনেক অনুতাপ করিতে লাগিল। শত্রুপক্ষের টিট্‌কারী আরও বাড়িয়া উঠিল; তাহারা যেখানে সেখানে দাঁড়াইয়া তাহার বিষয়ে কথা কয়, আর হাসে; যে কোন কালে পরমহংসকে চক্ষে দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ, কেবল নাম মাত্র শুনিয়াছে; সেও, "কেমন সেদিন কুঁৎকে দেওয়া গেছে—বাছাধনকে তিন ঘণ্টা অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌তে হয়েছিল; বাবা, পাপের ফল ভুগ্‌তেই হয়—ধর্ম্মের দরজায় কেউ আগড় দিয়ে রাখ্‌তে পারে না"—এইরূপ কথায় আপনার কৃতকার্য্যতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল।

(১) এইরূপ জনশ্রুতি যে, সে একবার মদ খাইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করে; তাহার একজন সঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া চোখের উপর এক ঘুসি মারাতে তাহার চক্ষের ঢেলা বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আমাদের নীলরতন বড় ইয়ার লোক; কেহ তাহাকে অকস্মাৎ কাণা হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত; বলিত, 'জানই ত বাবা, আমার নস্য নেওয়া অভ্যাস আছে; একদিন বড় মাথা ধরেছিল, যেমন নস্য নিয়ে জোরে হাঁচতে যাব, অমনি ফট্ ক'রে চোখ্‌টা বেরিয়ে এল।'

পরমহংস আপনার কার্য্যের উপযুক্ত প্রতিফল পাইল। 'দশদিন চোরের একদিন সাধের,' এ কথাটীর সার্থকতা ঘটিল; সে পরকে বঞ্চনা করিয়া, পরিশেষে তাহার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করিল। যাহারা যথার্থ কুচরিত্রের লোক, তাহারা যদি প্রকাশ্যভাবে সেইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে লোকে তাহাদের সম্পর্ক হইতে পৃথক থাকিয়া আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারে; তাহা হইতে সংসারের তত অনিষ্ট ঘটিতে পারে না; কিন্তু যাহারা আপনাদের জঘন্য চরিত্র ধর্ম্মের আবরণে ঢাকিয়া রাখে, তাহা হইতে যে সংসারের কত অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা বলা যায় না—যাহার ঘটিয়াছে, সেই-ই বুঝিতে পারে। তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই; প্রভো! এ প্রকার নরাধমদিগের হস্ত হইতে আমাদের পরিত্রাণ কর!

পূর্ণানন্দ সেইরূপ অবমানিত, প্রহারিত ও হতাশ মনোরথ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তাহার যদি লজ্জারই ভয় থাকিত, তাহা হইলে কি আর সেরূপ জঘন্য কার্য্যে অগ্রসর হইত—কিন্তু অপমান ও প্রহারের ভয়ে তাহাকে অগত্যা বাটীর বাহির যাইতে ক্ষান্ত হইতে হইল। তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি বাড়িয়া উঠিল। যে ব্যক্তি সৎস্বভাবের লোক হন, তাঁহার প্রতি কেহ অন্যায়াচরণ করিলেও ক্ষণকালের নিমিত্ত তাঁহার মনে ওরূপ জঘন্য ইচ্ছার উদয় হয় না; কিন্তু যাহার স্বভাব নীচ, সে আপনার কর্ম্মের যোগ্যপ্রতিফল পাইলেও, জিঘাংসা-বৃত্তি তাহার মনে দ্বিগুণবেগে বলপ্রকাশ করে। সে সরলা ও মাতঙ্গিনীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য অনন্যমনে ব্যাপৃত রহিয়া সুবিধা খুঁজিতে লাগিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নীলরতন নামে পূর্ণানন্দের একজন অনুগত শিষ্য ছিল। ভণ্ডামিতে সে সম্পূর্ণরূপে পরমহংসের অনুকরণ করিত, বিধাতা তাহাকে শারীরিক সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, সে দেখিতে গভীর কৃষ্ণবর্ণ, রোগা, মুখে বসন্তের চিহ্ন, দৈর্ঘ্যে চারি হাতের উপর, তাহার উপর আবার একটী চক্ষু-রত্নে বঞ্চিত। একটী চক্ষু ছিল না বলিয়া, লোকে তাহাকে সচরাচর কাণা নীলরতন বলিয়াই ডাকিত।

নীলরতন, আমাদের পূর্ণানন্দের একজন বিশ্বাসী মন্ত্রীর কাজ করিত; বিপদের সময়ে মন্ত্রণা দিত; আবার সুখের সময় আসিলে, তাহার সমান অংশভাগী হইত। এত গুণের বলিয়াই পূর্ণানন্দ তাহাকে আদর করিয়া, 'খুড়ো, খুড়ো,' বলিয়াই ডাকিত। তাই নীলরতনকে ডাকিয়া পূর্ণানন্দ আজ পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিল।

নীলরতনের মুখমণ্ডল গম্ভীরভাব ধারণ করিল, সে যেন ক্ষণকালের জন্য কি ভাবিয়া বলিল, "হুঁ! তোমার জন্য আমারও ত পথ চলা এক রকম ভার হ'য়ে উঠেচে; লোকে বলে, 'ইলাচন্দ্র রাজার গজেন্দ্র মন্ত্রী' (১); যেমন সে বেটা ভণ্ড, এও তেমনই উপযুক্তচেলা; এই ব'লে, আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মারে, গায়ে থু থু দেয়, আর আমাদের উল্লেখ ক'রে অনেক কুকথা বলে।"

পূর্ণানন্দ বলিল, "এ অপমানের শোধ ত তুলিতে হইবে, বাবা। কি করা যায়, সে বিষয়ে একটা পরামর্শ দেও দেখি, খুড়ো!"

নীলরতন বলিল, "একটু থামো বাপ্, ঠাওরাই আগে; তুমি চারিধারে যে অসুবিধা ক'রে রেখেচ, তাতে শীগ্‌গির যে, একটা কোন সুবিধা ঘটে উঠে, তাত বোধ হয় না; বৈষ্ণবীর বাড়ী যাবার পথ, তাত তোমার কাজের দরুণ একেবারে বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে;—তাইত কি করা যায়।"

পূর্ণানন্দ ব্যস্তভাবে বলিল, "হ্যাঁ খুড়ো; তোমাকে এ দায় হইতে আমাকে উদ্ধার করিতেই হইবে; রাগে আর প্রতিহিংসায়, আমার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছে; সরলাকে কি কোন মতে বার করিয়া আনিতে পারা যায় না, সে বিষয়ে একটু সচেষ্ট হওনা খুড়ো।"—এই বলিয়া সে কাতর নয়নে নীলরতনের গলা জড়াইয়া ধরিল।

"পাগল আর কি! আমাকে কি ওকথা ব'লে শেখাতে হবে। আমি

---

(১) এটী নীলরতনের আপনার কথা; নীলরতন বলিত, ইলাচন্দ্র ও গজেন্দ্র দুই মাস্তুত পীস্তুত ভাই—এদের দুজনের বড় ভাব ছিল, আর তারা খুব সাহসী ছিল।' তাই নীলরতন যার তার কাছে, পূর্ণানন্দকে ইলাচন্দ্র এবং আপনাকে গজেন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া বেড়াইত।

কি জানিনি যে, তোমার ভাল হ'লেই আমার ভাল। কিন্তু ওকাজটী আমায় মাপ্ করতে হবে ; ওটী আমি পারচিনি।"—নীলরতন উত্তর দিল।

"কেন, কেন পারবে না!—মাতঙ্গিনী ত সকল সময় বাড়ী থাকে না! একবার সুবিধামত রাত্রিতে যাইয়া, সরলাকে মুখে কাপড় বেঁধে ধরিয়া আনিলেই ত হয়।"—পূর্ণানন্দ উৎকণ্ঠিত ভাবে এই কথা বলিল।

"হাঁ, আমি মার খেয়ে মরি আর কি!—একদিন তোমার পালা গেছে, আমার একদিন যাগ্ ; পাড়ার লোক গুলো মেরে হাড়গুড়ো ক'রে দিগ আর কি! তা বাপু, আমি ত পারচিনি, তুমি রাগই কর, আর যাই কর। আর তা ছাড়া, এ রোগাহাড়ে অত বড় একটা বোঝা ব'য়ে আনা আমার কর্ম্ম নয়।"—নীলরতন উত্তর দিল।

"একান্তই যদি তা না পার," বিষণ্ণ বদনে অপেক্ষাকৃত হতাশ-স্বরে পূর্ণানন্দ বলিতে লাগিল, "তার মেয়েটাকে চুরী করিয়া আনিতে পারিবে ত!—এই উপকারটাই না হয় কর।"

হি-হি করিয়া হাসিয়া নীলরতন বলিল, "সে দুধের মেয়েটাকে নিয়ে আবার তুমি কি করবে।"

"প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, নীলরতন, সে অপমানের প্রতিশোধ আমাকে যে কোন প্রকারে হউক, লইতেই হইবে।—সরলার মেয়েকে লইয়া পলাইলেও ত সে মনে বড় কষ্ট পাইবে, মাতঙ্গিনী দুঃখিত হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমি সুখী হইব।"—পূর্ণানন্দ হিংসা-চক্ষে বিকট শব্দে এই উত্তর দিল।

নীলরতন তাহার কথায় প্রফুল্লমুখে সায় দিল ; এবং সেই দিন হইতে সে বালিকাটীর অপহরণ-রূপ কার্য্যে নিয়ত সচেষ্ট থাকিয়া আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সুযোগ দেখিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর বাড়ীর নিকট দিয়া চারিধার চাহিতে চাহিতে সে প্রায়ই চলিয়া যাইত। আর সে লোকের তীব্র উপহাস, অপমান-বাক্যে লজ্জিত হইত না—আর প্রহারের ভয় রাখিত না ; সে 'দুকাণ কাটা' হইয়াছিল। একদিন মাতঙ্গিনী এবং পল্লীস্থ প্রায় সকল লোকেই এক মেলা উপলক্ষে গ্রামের কিছু দূরে যাওয়ায় তাহার মনোরথ সিদ্ধ হইবার সুবিধা ঘটিয়া উঠিল।

সরলা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিল; আর তাহার বালিকাটী বাড়ীর বাহিরে সদর দরজার নিকট খেলা করিতেছিল—নীলরতন এই সুবিধা (১) দেখিয়া, বালিকাটীকে কোলে করিয়া পলাইল।

নীলরতন চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে যখন গাঢ় অন্ধকার হইয়া আসিল, সরলা আপনার কাজকর্ম্ম সারিয়া বালিকাকে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু কোন উত্তরই পাইল না। পরিচারিকা মাতঙ্গিনীর সহিত চলিয়া গিয়াছে, আপনি খুঁজিবার জন্য বাহির হইল। দ্বাররক্ষককে বালিকার কথা জিজ্ঞাসা করিল, সে থত মত খাইয়া গেল, কোন জবাব দিতে পারিল না—শশব্যস্তে রাস্তার বহু দূর দেখিয়া আসিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না; তাহার পর যখন সরলা বাড়ীর চারিধার খুঁজিয়াও তাহাকে পাইল না, তখন হতাশ হইয়া ঘরের মেঝেয় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

যথাসময়ে মাতঙ্গিনী ও পরিচারিকা বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বাড়ী আসিয়া সরলাকে কাঁদিতে দেখিয়া বৈষ্ণবী ভীতা হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সরলা অর্দ্ধস্ফুট ক্রন্দনস্বরে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। মাতঙ্গিনী যখন শুনিলেন যে, বালিকা অপহৃত হইয়াছে, তখনই বুঝিতে পারিলেন, "সেই ভণ্ডই এ কার্য্য করিয়াছে,"—তিনি পূর্ণানন্দের বাড়ীতে বালিকার অনুসন্ধানে পরিচারিকাকে পাঠাইয়া দিলেন।

লোকের ব্যবহার-দোষে লোকের বিশ্বাস ঘুচিয়া যায়, মন সন্দিগ্ধ হয়; মাতঙ্গিনী আগে যাকে তাকে বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু ইদানীং তাঁহার সকলেরই উপর সামান্য কারণে সন্দেহ জন্মিত।

কিছু ক্ষণ পরে পরিচারিকা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাড়ীতে কেবল দুইজন চাকর আছে, আর কেউ নেই; পূর্ণানন্দও নেই, গদার মা ও

---

(১) বাড়ীর দ্বারপাল অতিরিক্ত মাত্রায় সিদ্ধি পান করিয়া, সন্ধ্যা-সমীরণ সেবন করিতে করিতে, ভিত্তির গায়ে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল, তাই সে বালিকাটীর অপহরণের বিষয় কিছুই জানিতে পারে নাই। বালিকা নীলরতনকে চিনিত, যখন সে পূর্ণানন্দের সহিত মাতঙ্গিনীর বাড়ীতে আসিত, তখন অনেকবার তাহাকে পূর্ণানন্দের বাড়ীতে লইয়া গিয়া সন্দেশ খাইতে দিয়াছিল, তাই নীলরতন তাহাকে কোলে করিলেও সে ভয় পাইল না।

নেই, কাণা নীলরতন ও নেই। কোথায় গেছে, কতবার জিজ্ঞেস কল্লেম, কিন্তু তারা কিছুই বল্লে না।"

তখন মাতঙ্গিনী ও সরলার আর কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহারা বুঝিল যে, পূর্ণানন্দ বালিকাকে অপহরণ করিয়া পলাইয়াছে।—'বালিকাকে পাইবার যাহা কিছু আশা ছিল, তাহাও ঘুচিল,' ভাবিয়া সরলার শোক দ্বিগুণ হইয়া উঠিল—সে শোকে অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। তাহার পর চেতনা হইলে সে উন্মাদের ন্যায় হাত পা আছাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত পাগলের মত প্রলাপ-বাক্য বলিতে লাগিল। মাতঙ্গিনীর সরলার উপর অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার মেয়েটীকে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন —কিন্তু শোক করিয়া কোন ফল নাই, ভাবিয়া তিনি শোকের কথঞ্চিৎ শমতা করিয়া সরলাকে প্রবোধ-বাক্যে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সে সান্ত্বনাবাক্যে কি কোন ফল ফলে! তুমি আমি, পরের ব্যথায় ব্যথী হইতে পারি, কিন্তু পুত্র কন্যার জন্য মাতার হৃদয়ে যে দারুণ শোক লাগে, তাহার শতাংশের একাংশ ও অপরে কি অনুভব করিতে পারে!

সেই রাত্রেই মাতঙ্গিনী বালিকার অপহরণের কথা, পুলিসে জানাইলেন। তাহার শরীরের প্রত্যেক অংশের বর্ণনা করিয়া জানাইলেন, যে তাহাকে আনিয়া দিতে পারিবে, সেই ৫০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবে। পূর্ণানন্দের উপর সন্দেহের কথা ও তিনি বলিলেন। চারিধারে তাহাদের অনুসন্ধানের নিমিত্ত লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু কোন ফল ফলিল না—কেহই পূর্ণানন্দ কি তাহার অনুচরদিগকে ধরিতে পারিল না; পূর্ণানন্দের পরিচারকদিগকে ও অনেক উৎপীড়ন করা হইল, কিন্তু তাহারা কিছুই বলিল না। কেবল, 'আমরা কি জানি, আমাদের মারেন্ কেন, মুশাই? আমরা আজ সমস্ত দিন বাড়ী ছিলুম না,' এইরূপ বলিয়া কাটাইয়া দিল।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল; সরলা খায় দায় না, কেবল কাঁদে; মাতঙ্গিনী প্রত্যহই বুঝায়, কিন্তু সরলা কিছুতেই শান্তি পায় না। সংসারের কপট ব্যবহারে মাতঙ্গিনীর মনে বড়ই বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল—তাঁহার

কিছুই ভাল লাগিত না। ক্রমে তিনি যখন দেখিলেন যে, কালের নিয়মে সরলার সে দারুণ শোকের কিছু শমতা হইয়াছে, তখন একদিন সরলাকে বলিলেন, "দেখ সরলা, সংসারের ত এই ব্যাপার; দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে বড় বিরক্তির উদয় হইয়াছে। তোমারও এই বিপদের উপর বিপদ্। সেই জন্য আমি মনস্থ করিয়াছি যে, তীর্থ-পর্য্যটনে শান্তি পাইতে চেষ্টা করিব। আমার সহিত যাইবে কি!"

সরলার মন ও অত্যন্ত ব্যাকুল ছিল—তাহার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়াছিল; তাহাতে আবার তাহার প্রতিপালিকার ইচ্ছা, সে সম্মত হইল।

তখন মাতঙ্গিনী বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনার জ্ঞাতির উপর দিয়া, প্রয়োজনীয় অর্থ লইয়া, সরলা, পরিচারিকা, দ্বারপাল এবং দুই চারিটী বৃদ্ধা রমণীর সহিত শুভদিনে তীর্থোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

সপ্তবিংশ স্তবক।

কালের নিত্যখেলা।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার শিয়ালদহ অপেক্ষা এখনকার শিয়ালদহ অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। তখন এখনকার মত অসংখ্য সুন্দর সুন্দর দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকা এবং চারিধার ব্যাপিয়া অসংখ্য প্রশস্ত রাজপথ ছিল না; সুন্দর ষ্টেশন দ্বয় ও তখন শিয়ালদহে শোভা পাইত না। ছিল কেবল, কতকগুলি খোড়ো ঘরের সারি—আর মাঝে মাঝে দুই একখানা সামান্য ইষ্টকালয়, তা তাহাদের অধিকাংশেই মুসলমানদের বসতি। আর যেখানে এখন শিয়ালদহ ষ্টেশন দুইটী হইয়াছে, সেখানে কতকগুলি প্রশস্ত উদ্যান মাত্র ছিল। আঁকা বাঁকা অপ্রশস্ত দুর্গন্ধময় গলি—তাহার ভিতরে গাঢ় অন্ধকার; এখন যেমন কচিৎ দুই একটী পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এখানে ওখানে অসংখ্য বৃহৎ বা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী দেখা যাইত।

কালে কিছুই থাকে না, সকলেরই যেমন উন্নতি সীমা আছে, তেমনই

চরম সীমা ও দেখিতে পাওয়া যায়। যে কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে কতকগুলি এখানে ওখানে বিন্যস্ত অতি সামান্য খড়ের ঘর মাত্র ছিল, সেই কলিকাতাকে এখন লোকে 'City of the Palaces' বলিয়া উল্লেখ করে; এখন সেই কলিকাতা, পৃথিবীর মধ্যে একটী সুন্দরী নগরী বলিয়া বিখ্যাত। আবার গৌড় ও রাজমহলের দিকে চাহিয়া দেখ, যাহারা এককালে ভারতের অনেক সুন্দর নগরকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছিল, দেখিবে যে, তাহাদের স্থানে কেবল মাত্র রাশি রাশি ধ্বংসাবশেষ পতিত আছে; নিবিড় অরণ্যে এখন সেই সকল সুন্দর নগর পরিণত হইয়াছে; ব্যাঘ্র, ভল্লুক আদি হিংস্র জন্তুরা এখন সুখে সেই সকল অরণ্যের মধ্যে বিচরণ করিতেছে। যেখানে আগে অনেক ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত লোক দেশ বিদেশ হইতে আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছা করিত, এখন সেখানে একজন সামান্য কাঠুরিয়া যাইতেও ভয় পায়। কাল যেন সকলকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছে, "ঐ দেখ; আমার খেলা দেখ। কিছু দিন পূর্ব্বে তোমাদের পুর্ব্বপুরুষেরা যাহাকে চিরকালের সুখের আবাস বলিয়া ভাবিয়াছিল; যাহার পতন তাহারা কখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, তাহার কি অবস্থা করিয়াছি দেখ! সুজা যখন রাজমহলকে নানা সুন্দর অট্টালিকায় ও রাজবর্ত্মে সাজাইল, তখন মনে করিয়াছিল যে, ইহা চিরকালই এইরূপে লোকের মনোহরণ করিবে! কিন্তু কোথায় বা সে সুজা রহিল, আর কোথায় বা সে রাজমহল। আমার কাছে তোমাদের লোকবল, অর্থবল, বুদ্ধিবল, সকল বলই তৃণ অপেক্ষাও লঘু। আমি তোমাদের লইয়া খেলা করিতেছি; যদি মনে করি, তবে এই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীকে রসাতলে পাঠাইতে পারি! আমার সহিত কি তোমাদের ও সামান্য ক্ষমতার তুলনা হইতে পারে!—তোমাদের ক্ষমতায় কলিকাতার এরূপ শোভা হয় নাই, আমিই করিয়াছি; আমিই কলিকাতাকে এক সামান্য অজানিত গ্রাম হইতে এক বিখ্যাত নগরীতে পরিণত করিয়াছি। আমি এখন কিছু দিন ইহার সহিত খেলা করিতে চাহি।"

এইরূপে যে প্রতিদিন পৃথিবীর কত নূতন নূতন পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে—

কাল এইরূপে যে কত ভাঙ্গিতেছে, গড়িতেছ,—কত সুন্দর অট্টালিকাকে ধূ-ধূ প্রান্তরে পরিণত করিতেছে, আবার কত প্রান্তরকে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকায় শোভিত করিতেছে—তাহা কে বলিতে পারে!

যখন জানকীবাইয়ের সেরূপ জঘন্য ব্যবহারে ভীত এবং বিরক্ত হইয়া নরেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিলেন, তখন কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু শিয়ালদহে ছিলেন না; জমীদারীর কোন বিশেষ গোলযোগ নিষ্পত্তির জন্য তাঁহাকে বর্দ্ধমান জেলায় যাইতে হইয়াছিল। তিনি জানিতেন যে, যেরূপ পত্র লেখা গিয়াছে, তাহাতে যুবক শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের জন্য দুই চারি দিন অপেক্ষাও করিয়াছিলেন; অবশেষে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়াতে যাইতে বাধ্য হন।

নরেন্দ্রনাথ দেওয়ানের মুখে সকল কথা শুনিয়াছিলেন; তাঁহার মনে বড়ই আশা হইয়াছিল যে, সরলার বিষয়ে কোন না কোন কথা কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু শুনিলেও শুনিয়া থাকিবেন।

একাকী নির্জ্জন বাস তাঁহার ভাল লাগিত না; বাহিরের ঘটনা ও লোকের সহিত মিশামিশিতে তিনি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে অসন্তুষ্ট বই সন্তুষ্ট হন নাই। বসন্তকুমারীর চরিত্রে তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল; জানকীবাইকে তিনি অত্যন্ত জঘন্য চরিত্রের মনে করিয়া তাহাকে ঘৃণা করিতেন; আবার ভীতও হইয়াছিলেন; কেন না তিনি জানিতেন, যদিও জানকী তাঁহাকে সচ্চরিত্রের লোক দেখিয়া হতাশভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল, তত্রাচ সে যে সহজে তাঁহার আশা ছাড়িবে, এমন বোধ হয় না। ব্রজদুর্লভ বাবুকে কতক পরিমাণে এবং যুগলকিশোরকে সম্পূর্ণ নির্ব্বোধ বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইয়াছিল, এবং ভাবিয়াছিলেন যে, যুগলকিশোরকে হয় ত ঐরূপ অবিশ্বাসী স্ত্রীর হস্তে তাঁহার অপরিণাম-দৃষ্ট কার্য্যের জন্য কোন না কোন গুরুতর ফলভোগ করিতে হইবে। ব্রজেন্দ্রকুমার স্বার্থপর হউক আর যাহাই হউক, তাহার উপর তাঁহার কিছু স্নেহ জন্মিয়াছিল; সেই জন্য তিনি যদিও প্রথম প্রথম ভাগলপুর হইতে রাগ করিয়া চিঠি লিখেন

নাই, কলিকাতায় আসিয়াই তাহাকে পর পর তিনখানি চিঠি মুঙ্গেরে লিখিয়াছিলেন ; দুইখানির উত্তর পান নাই, একখানি তাঁহার নিকট ফিরিয়া আইসে।

শীতকালের দিন, কাটাইতে তত কষ্ট বোধ হয় না ; তত্রাচ সেই স্বল্প দিবাভাগ কাটাইতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইত। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিত না, কেবল এঘর ওঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেন ; একবার বসিতেন, একবার উঠিয়া দাঁড়াইতেন, মাঝে মাঝে সরলাকে মনে পড়িলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন, আর অন্যমনস্ক হইয়া সরলার কথা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতেন। হরনারায়ণ তাঁহার উপর যে পুস্তক ছাপাইবার ভার দিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

এক দিন একখানা চিঠি তাঁহার হাতে আসিল—তিনি হস্তাক্ষর দেখিয়া মনে করিলেন, ব্রজেন্দ্রের চিঠি ; খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন—

মহাশয়,

আপনি বহুদিন হইল আমাকে যে আশা দিয়া গিয়াছেন, তাহার কি হইল ! আপনি টাকার জন্য চিন্তিত হইবেন না ; সকল খরচের হিসাব করিয়া রাখিবেন, আমি ইতি-মধ্যে একদিন কলিকাতায় গিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিব। আপনি আমার বড়ই অনিষ্ট করিতেছেন, অন্যের উপর ছাপাইবার ভার দিলে এতদিনে আমি একজন মহাকবি বলিয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইতে পারিতাম। হিন্দীতে লেখা ভাল পড়িতে পারিবেন না বলিয়া, এই পত্র একজন বাঙ্গালী বাবুকে দিয়া লিখাইলাম, তাঁহার নাম ব্রজেন্দ্রবাবু। আপনি এখানে কি করিয়া গিয়াছেন, বলিতে পারি না ; আমার ভগিনী ও তিনি উভয়ে আপ-নার চরিত্রের অনেক অখ্যাতি করেন ; যাহা হউক আমার যখন আপনার সহিত এতদূর প্রণয় তখন আমার ও বিষয়ে থাকিবার আবশ্যক কি !—আমার ভগিনীপতির আজকাল বড় বিষণ্ণ ভাব দেখিতে পাই ; কারণ কি বলিতে পারি না, বোধ হয় কোন কঠিন পীড়া হইয়া থাকিবে। শুনিলে সুখী হইবেন যে, আমি সেই বাঙ্গালী বাবুটীর নিকট বাঙ্গালা শিখিতেছি ; তিনি আমার কবিতার খুব সুখ্যাতি করেন ; বঙ্গ ভাষায় ভাল কবিতার পুস্তক নাই, শীঘ্রই আমি সে অভাবটী দূর করিব। শীঘ্র শীঘ্র আমার হিন্দী কবিতাগুলি ছাপাইয়া একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দিবেন—কদাচ বিলম্ব করিবেন না।

চির পরিচিত

কবি হরনারায়ণ।

চিঠি পড়িয়া যুবকের বড় রাগ হইল। রাগ হরনারায়ণের উপর নহে, ব্রজেন্দ্রের উপর। কি! এতদূর অকৃতজ্ঞ যে, স্বচ্ছন্দে মিছামিছি আমার নামে অখ্যাতি রটায়; আর প্রকারান্তরে হরনারায়ণের পত্রে আমার নিন্দা করিতেছে, লিখিয়া পাঠায়। আমি তাহার এত করিলাম, অসময়ে তাহার এত সাহায্য করিলাম (১), সে কি সকলই ভুলিয়া গেল। কই, আমি ত তাহার সহিত একদিনও মন্দ ব্যবহার করি নাই, বরং সেই-ই করিয়াছে। লোকে এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না; আমি তাহার কি করিয়াছি যে, জানকীবাইয়ের সহিত যোগাযোগ করিয়া আমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে!—জানকীর সহিত তাহার এত ভাব—তা হই-তেই পারে; যে যেমন চরিত্রের লোক, সে সেইরূপ চরিত্রের লোকের সহিতই মিশে।—ক্রোধে অধীর হইয়া নরেন্দ্রনাথ পত্রখানি শতখণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারিধারে ছড়াইয়া দিলেন; হরনারায়ণের চিঠি বলিয়া নহে, ব্রজেন্দ্রের লেখা বলিয়া। বুঝিলেন, যুগলকিশোরের সর্ব্বনাশের পথ আর বেশীদূর নাই!—তিনি বিরক্ত হইয়া পাদচালন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল, "কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আস্‌চেন।"—বলিতে বলিতে কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; যুবককে দেখিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন ভাল আছত।"

যুবক আপনার মনের ভাব কিঞ্চিৎ শমতা করিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশীর্ব্বাদে ভাল আছি।"

"কেমন নূতন নূতন দেশ দেখিলে, বল।"

"কিছুই না। যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে বিরক্ত হইয়াছি; পৃথিবীতে নানারূপ চরিত্রের লোকের বাস। কেহ স্বার্থপর, কেহ নির্ব্বোধ, কাহারও কাহারও বড় ভয়ানক স্বভাব।"

---

(১) যদিও ব্রজেন্দ্র রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি তোমার একটা তাঁবার পয়সার ও প্রত্যাশা রাখিনি'—তথাচ যুবক জানিতেন যে, তিনি তাহাকে সাহায্য না করিলে সে বড় কষ্ট পাইবে, সেই জন্য তিনি মুঙ্গের হইতে আসিবার সময় বাড়ীওয়ালার নিকট ২০০্ টাকা ব্রজেন্দ্রকে দিইবার জন্য রাখিয়া আইসেন।

"যতই নূতন নূতন দেশ দেখিবে, নূতন নূতন লোকের সহিত মিশ্রিত হইবে, ততই সামাজিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিবে; পূর্ব্বাপেক্ষা তুমি অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ, ভিন্ন ভিন্ন মানব-চরিত্র অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারিয়াছ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আসিয়াছ, ভালই হইয়াছে, তোমার জমীদারীর ও অন্যান্য বিষয়াদির হিসাব পত্র সমস্ত বুঝিয়া লও। তোমার পিতা আমাকে তোমার সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক করিয়া গিয়াছেন বটে এবং আমি জানি যে, তুমি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর, তত্রাচ তোমারও ত এ সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া চাই, তাহা না হইলে ভবিষ্যতে বিষয় আশয় বুঝা তোমার পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হইবে।"

"আপনার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস; আমি জানি যে, আপনার ন্যায় সৎলোক এ পৃথিবীতে অতি বিরল। কিন্তু আপনি যখন বলিতেছেন, এ সকল বিষয়ে পারদর্শী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তখন অবশ্যই আমি অতি শীঘ্রই উহা বুঝিতে চেষ্টা করিব; মহাশয়, উত্তর পশ্চিম বাঙ্গালায় পিতা যে একটী বিশ্রাম-স্থান করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে; বহুদিন হইল, বাল্যকালে একবার সেখানে গিয়াছিলাম, স্থানটী কিরূপ যদিও ঠিক্ মনে পড়ে না, তথাপি সুন্দব এবং মনোরম বলিয়া ধারণা আছে। আপনি যদি বলেন, তাহা হইলে কিছু দিন সেইখানে গিয়া থাকি।"

"তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে যাইতে পার—আমি বাধা দিতে চাহি না," কৃষ্ণগোবিন্দবাবু বলিলেন, "স্থানটী সর্ব্বাংশে সুন্দর বটে, দেখিবার যোগ্য বস্তুও সেখানে অনেক আছে; কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট। মোটা চাউল, অপকৃষ্ট ডাইল ও সামান্য তরী তরকারী যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে তোমার ন্যায় একজন সুখভোগী ব্যক্তির বড় কষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যাহা হউক, অর্থ থাকিলে সকলই হয়, ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য তোমার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। তোমার যখন যাহা ইচ্ছা হইবে, পূর্ব্বে লিখিও, তাহা হইলে সময়ে সমস্তই পাইতে পারিবে।"

—এই বলিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু গমনোন্মুখ হইলেন।

তখন যুবকের চির-অভিলষিত বিষয়টী জানিবার জন্য "সরলা!" এই কথাটী সহসা তাঁহার অজ্ঞাতসারে মুখ হইতে বাহির হইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ বাবু যাইতেছিলেন, থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "সরলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ। পুলিষে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অনেক অনুসন্ধান লইয়াছি, এখনও তাহার কিম্বা তাহার সেই দুরাত্মা পিতার কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।"

যুবক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন; তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল, সমস্ত শরীর অবশ হইয়া আসিল।

কালের নিত্যখেলা এইরূপ; যে কাল কিছু পূর্ব্বে নরেন্দ্রনাথকে আশায় নাচাইতেছিল, এখন সেই-ই আবার তাঁহাকে হতাশ ও স্তম্ভিত করিয়া, ধমণী নিষ্পেষিত করিয়া, মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া, নিরাশার অতল জলে ফেলিয়া দিল।

অষ্টবিংশ স্তবক।

নির্জ্জন আবাস।

রাজমহলের কিছুদূরে একখানি অজানিত সামান্য গ্রাম। গ্রামখানিতে সাঁওতাল নামক অসভ্য জাতিরই অধিক বসতি। চারিধারে ছোট বড় পাহাড়ে ঘেরা একটী জায়গা; উচু নীচু এবড়ো খেবড়ো জমী, মাঝে মাঝে বালুকাময়, মাঝে মাঝে ঘাসযুক্ত। পাহাড়ের কোলে কোলে লতা পাতায় ছাওয়া ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর; সাঁওতালেরা সেই সকল কুটীরে বাস করে। তাহারা চাষ করে, গরু চরায়, সামান্য খায় দায়, একটু একটু লেঙ্গট পরে, আর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে আপনাদের কুটীরে আসিয়া হাঁড়িয়া (১) খেয়ে সাঁওতালী ভাষায় গীত গায়িয়া মাদল বাজায়। শীতকালে

(১) হাঁড়িয়া এক প্রকার ধেনো মদ; ভাত এবং আমানী বহুদিন পচাইয়া এই মদ প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে বড় মত্ততার বৃদ্ধি করে। বাঙ্গালার নিকটবর্ত্তী আদিম অধিবাসীদের মধ্যে হাঁড়িয়া খাওয়া অধিক পরিমাণে প্রচলিত।

খড় কুটার আগুন জ্বালিয়া আর গ্রীষ্মকালে পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে অনাবৃত প্রান্তরে স্ত্রী পুরুষে একত্রিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া গান গায় আর নাচে। মাঠ সব ধূ ধূ করিতেছে—জায়গায় জায়গায় আবাদ আছে; কোন কোন স্থানে পতিত জমী। মধ্যে মধ্যে দুই একটা বটগাছ, অশ্বত্থ গাছ আর শালগাছের বন দেখিতে পাওয়া যায়। পাহাড়ের কাছ দিয়া একটী ক্ষুদ্র নদী বাহিত; গ্রীষ্মকাল, এ সময়ে প্রায় সকল নদীই শুষ্ক। নদীর তলভূমি বালুকা পূর্ণ; সুদূর বিস্তৃত বালুকা রাশি, মাঝে মাঝে এক হস্ত দেড় হস্ত অনতিগভীর স্নিগ্ধ সলিল অসরল ভাবে মৃদুনাদে চলিতেছে। শিলা ভেদ করিয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরে বহুদূর হইতে শীতল সলিলরাশি আসিয়া পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া পড়িতেছে—দিবারাত্র পড়িতেছে, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—নিয়ত ঝর ঝর শব্দে পড়িতেছে, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের আকারে সেই নদীর পুষ্টি সাধন করিতেছে। এখানে ওখানে ক্বচিৎ দুই একটা প্রস্রবণ, জল সবেগে উঠিতেছে না, স্থির ভাবে রহিয়াছে; দুই হস্তের অনধিক গভীর কুণ্ড, নিয়ত সলিলে পূর্ণ। সহস্র লোকে নিয়ত তুলিয়া ও সে জল ফুবাইতে পারে না—ভিতরে চারিধার হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝর-পথে সলিল রাশি আসিয়া তাহাকে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ রাখিতেছে।

কোন কোন পাহাড় ছোট, তাহার উপর দুই একটী সামান্য গুল্ম লতা; কোন কোন পাহাড় বড়, তাহার উপর নিবিড় জঙ্গল—সেই জঙ্গলে নানাবিধ হিংস্রজন্তুর বাস; গভীর নিশীথে যখন সকলে সুসুপ্ত হয়, তাহারা পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আইসে—সাঁওতালদের গরু, বাছুর ছাগল আর সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র শিশুসন্তানদিগকে আক্রমণ করে; সেই সকল আক্রান্ত জীবের প্রাণভয়ে চীৎকারে সাঁওতালদের ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়—তাহারা হৈ হাই শব্দ করিয়া কেহ সুদীর্ঘ যষ্টি, কেহ টাঙ্গী আর কেহ কেহ তীর ধনুক লইয়া সেই সকল হিংস্রজন্তুকে আক্রমণ করে। সাঁওতালদিগের সন্ধান অব্যর্থ, প্রায়ই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না; আর যাহাকে একবার লাগিবে, সেও প্রাণে বাঁচে না—কেন না তাহাদের

বাণের অগ্রভাগগুলি অতি তীব্র বিষাক্ত। সাঁওতালেরা সভ্যজাতি অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী—তাহাদের ধনের পিপাসা নাই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, পরস্পর পরস্পরকে দ্বেষ করিবার কোন বস্তুই নাই; তাহারা সামান্য আহারেই সন্তুষ্ট—দিবারাত্র স্ত্রীপুরুষে খাটিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই তাহারা সুখী; নানাবিধ সুখভোগ্য দ্রব্যের তাহারা আকাঙ্ক্ষা রাখে না—বিলাস কাহাকে বলে তাহারা জানে না। তাহারা সত্যবাদী, বিশ্বাসী এবং সচ্চরিত্র—সভ্যজাতির ন্যায় ছল কপটতা, মিথ্যাকথা বা লাম্পট্য তাহারা জানে না—যদি কখন কাহাকে কুচরিত্র বলিয়া জানিতে পারে; যদি এমন জানিতে পারে যে, কোন পুরুষ অন্য কাহারও স্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণয় করে, তাহা হইলে উভয়ের প্রাণ পর্য্যন্তও লইতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা অজ্ঞান এবং অশিক্ষিত হইলেও কয়েকটী প্রধান গুণে ভূষিত এবং সেই জন্যই অসভ্য হইয়াও অনেক সভ্যজাতি অপেক্ষা তাহারা সহস্র গুণে নির্দ্দোষী।

প্রায় এক শত বিঘা জমী লইয়া সেই নির্জ্জন আবাস। তাহার চারিধারে উচ্চ ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীর হিংস্রজন্তু হইতে রক্ষার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে; মধ্যে কোথাও কপি জন্মিবার স্থল, কোথাও আলুর চাষ, কোথাও বা মূলা বেগুণ, শালগম আর অন্যান্য শাক সবজী উৎপন্ন করিবার জায়গা। এক পার্শ্বে সুপক্ক ফলে অবনত বৃক্ষ রাজি—মধ্যে বাঙ্গালাটীর চতুষ্পার্শ্বে গোলাপাদি নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্প বৃক্ষের সারি। পূর্ব্বে যুবকের পিতা যখন মধ্যে মধ্যে এইখানে আসিতেন, সে সময়ে ঐ সকল স্থানে তাঁহার যত্নে যে কালের যা, সেখানে সেই সময়ে তাহা উৎপন্ন করা হইত। কিন্তু এখন তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে প্রায় দুই বৎসর এখানে কেহ আইসে নাই, কাজেই আর সেরূপ যত্ন নাই—সেই সকল আবাদী জমী এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যবৃক্ষে পূর্ণ; পুষ্প বৃক্ষের মধ্যে মধ্যে নানাবিধ আগাছা আর বড় বড় ঘাস। বাগানের মালীরা আর তাদৃশ যত্ন করে না। উদ্যানের মধ্যে গোলাপ বৃক্ষাদি বেষ্টিত একটী খড়ে ছাওয়া সুন্দর বাঙ্গালা। তাহার চারিধার বড় বড় দরজা জানালায় শোভিত—ভিতরে নানাবিধ

আবশ্যকীয় গৃহসজ্জা; নিকটে রন্ধনশালা—তাহার চালে খড় নাই; বোধ হয়, গত শীতকালে মালীরা সেই খড়ের আগুন জালিয়া শীত নিবারণ করিয়াছিল।

বাগানে দুইজন মালী আর গৃহসজ্জা রক্ষার নিমিত্ত একজন পরিচারক। যুবক যখন রামচরণ এবং একজন পাচক সহিতে তথায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে অপরিচিত জ্ঞানে এ উহার-মুখ পানে চাহিতে লাগিল; দেখিয়া রামচরণ বলিল, "কিরে আমাদের চিন্‌তে পারিস্‌নি।"

পরিচারক বলিল, "না, তোমরা কে?—কোথা হ'তে কি মনে করে এখানে এসেচ।"

রামচরণ বলিল, "সে কিরে, তোদের মনিব বিজয়বাবুর ছেলে ইনি! বিজয়বাবুব কাল হওয়াতে ইনিই এখন তোদের মনিব, জানিস্‌নি।"

উড়ে মালীরা যেন কিছু ত্রস্ত ও ভীত হইয়া বলিতে লাগিল, "বাবু ডোণ্ডবৎ, বাবু ডোণ্ডবৎ; মু না জানিথিলা।"—এই বলিয়া তাহারা করযোড়ে সঘনে প্রণাম করিতে লাগিল।

বৃদ্ধ পরিচারক বহুদিন এখানে কাটাইয়াছিল, সে শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবুর ছেলে ইনি?—ওঃ মনে পড়ে বটে, ইনি একবার ছেলে বেলায় বাবুর সঙ্গে এখানে এসেছিলেন; এরই মধ্যে এত বড় হয়েচেন, আহা ভগবান বাঁচিয়ে রাখুন। আহা, বিজয় বাবুর মত মনিব আর পাব না—অমন মনিব আর হবে না। বড় অমায়িক লোক ছিলেন; আমাদের মত গরিব লোকেদের উপর তাঁর বড় দয়া ছিল।"

যুবক সেই স্থানে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কখন পাহাড়ের উপর উঠিতেন, নির্ঝরের নিকট দাঁড়াইয়া জলপতন শব্দ শুনিতেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিগুহা গুলি তন্ন তন্ন করিয়া যেন কোন অমূল্যনিধি খুঁজিতেন, আরণ্য কুসুমের গন্ধে মোহিত হইতেন। কখন প্রান্তরের উপর দিয়া স্নিগ্ধসমীর স্পর্শে শরীর শীতল করিয়া, বৃক্ষারূঢ় পক্ষীগুলির মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে বহুদূর অবধি বেড়াইয়া আসিতেন। কখন বা

সাঁওতালদের গৃহের নিকট দাঁড়াইয়া তাহাদের উচ্চগীত সঙ্গীতগুলি শুনিতেন, আর কখন বা রাত্রি-আগমে প্রান্তরে দাঁড়াইয়া সাঁওতালেরা অকপটভাবে যুবক যুবতী মিলিয়া একত্রে যে পা ফেলিয়া ফেলিয়া নাচিত, তাহাই দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। এইরূপে তিনি নিত্য নিত্য স্বভাবের নূতন নূতন খেলা দেখিতেন, আর সেই অসভ্য জাতির সহিত সভ্যজাতির তুলনা করিয়া, তাহাদের নির্দ্দোষ হৃদয়ের প্রশংসা করিতেন। এত আমোদ প্রমোদে থাকিয়া তিনি কি সরলার বিষয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন? সে মূর্ত্তি ভুলিবার নহে। সে সুখছবি তাঁহার হৃদয়ে নিয়ত জাগরূক ছিল—সে সরল প্রকৃতি তিনি কখন ভুলিতে পারিবেন না—তিনি আপনাকে আপনি ভুলিতে পারেন, তথাপি সরলাকে ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইতে পারিতেন না—সেই সকল আমোদ প্রমোদের ভিতরে ও তাঁহাকে মাঝে মাঝে এক একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে দেখা যাইত।

এইরূপে প্রায় তিন চার মাস গত হইল, এমন সময়ে সহসা একদিন একখানি গরুর গাড়ী আসিয়া তাঁহার নির্জ্জন আবাসের নিকট থামিল। যুবক সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, গাড়ীর ছতরীর ভিতর '**কবি হরনারায়ণ**।'

ঊনত্রিংশ স্তবক।

আজন্ম কবি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কবি হরনারায়ণ ব্রজেন্দ্রের নিকট বাঙ্গালা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। হরনারায়ণ সত্য সত্য একজন নিরেট বোকা ছিলেন না, বুদ্ধি ও মেধা তাঁহার বিলক্ষণ ছিল—সুন্দর সুন্দর ভাবও সময়ে সময়ে তাঁহার মনে উদিত হইত। তবে যে বিষয়ে কোন বিশেষ ক্ষমতা নাই, সে বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ যোগ্য লোক বলিয়া বিশ্বাস করাই তাঁহার যা দোষ ছিল, এবং তাহাতেই তিনি আপনার অমূল্য জীবন বৃথা কাটাইতেছিলেন, এই যা দুঃখের বিষয়। চারি পাঁচ মাসের

মধ্যে তিনি একরূপ বঙ্গভাষায় সামান্য অধিকার পাইয়াছিলেন; সামান্য বাঙ্গালা লিখিতে এবং সামান্য বাঙ্গলা বুঝিতে একরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন।

হরনারায়ণের সহসা এখানে আসিবার কারণ এই যে, বহুদিন হইল তিনি আপনার পুস্তকের উল্লেখ করিয়া শৌরীন্দ্রমোহনকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি হয় ত তাঁহার উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, না হয় পুস্তক ছাপাইতে অপারক হইয়াছেন। এজন্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তভাবে শৌরীন্দ্রমোহনকে শতসহস্র তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আর পত্র লিখিয়া কোন ফল নাই, একবার স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাহা হউক একটা নিষ্পত্তি করিয়া আসিবেন। জানকীবাই শৌরীন্দ্রমোহনের চরিত্র বিষয়ে অনেক কুৎসা করিয়া বলিতেন, "ওরূপ বদ্‌লোক কি আর আছে—মুখে হাসি হাসি কথা, কিন্তু ভিতরে হারামের ছুরী। আমাকে অনেক প্রলোভন দেখাইয়া অনেক মনভোলান কথা কহিয়া অসতী করিবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু আমি নাকি বড় শক্ত মেয়ে, স্বামীর উপর আমার নাকি অচল ভক্তি, তাই সে আপনার অভিলাষ পূরণ করিতে সক্ষম হয় নাই।"—ব্রজেন্দ্র ও তাহার কথায় সায় দিয়া বলিত, "আঃ—ওর কথা আর বলিও না; ওর মত আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য বদমায়েস লোক কি আর আছে! সে দিন মুঙ্গেরে একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীকে কতদূর না নাকাল করিয়াছিল!—আমার সহিত উহার বহুদিনের আলাপ, আমি উহাকে বিশেষরূপ জানি।"—হরনারায়ণ সকলই শুনিত, তত্রাচ সে বিচলিত হইত না; সে স্বার্থপর লোক ছিল, যখন শৌরীন্দ্রমোহনের দ্বারা তাহার একটী প্রধান অভিলাষ পূর্ণ হইবার আশা রহিয়াছে, তখন সে তাঁহার সহিত অসদ্ভাব করিতে ইচ্ছুক হয় নাই।

যুগলকিশোর বাবুর অর্থের অপ্রতুল ছিল না; জানকীবাই মাঝে মাঝে ভাইকে কিছু কিছু করিয়া দিতেন। হরনারায়ণের কোন বাজে খরচ ছিলনা, কাজেই সেগুলি সমস্তই জমা হইত। যখন সে দেখিল যে, তাহার পত্রের জবাব আসিল না; দুইমাস, তিনমাস অপেক্ষা করিল, তথাপি কোন

উত্তর পাইলনা, তখন সে একেবারে শিয়ালদহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষ্ণগোবিন্দবাবু তাহাকে অনেক খাতির যত্ন করিয়া বলিয়াছিলেন, "যাঁহার সহিত আপনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তিনি এখন পেথম পাহাড়ে আছেন; আপনার পুস্তক এখনও ছাপা হয় নাই।"—এই কথা শুনিয়া আর কাল বিলম্ব না করিয়া হরনারায়ণ রাগতভাবে তথায় উপস্থিত হইল। এই হরনারায়ণের সহসা তথায় উপস্থিত হইবার কারণ—শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত একবার সাক্ষাৎ করা তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

হরনারায়ণ গাড়ী হইতে নামিলেন—গাড়ীবন্ গাড়ীখানিকে একপার্শ্বে টানিয়া রাখিল—যাওয়া আসার ভাড়া একেবারে করা হইয়াছিল। হরনারায়ণের রাগত রাগত ভাব; বগলে একতাড়া কাগজ—কাণে একটা খাগের কলম, তাহাতে এখনও কালি লাগিয়া রহিয়াছে; বোধ হয় আসিবার সময় পথে স্বভাবের কোন রূপ বর্ণনা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।

যুবক বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার এতদূর কষ্ট করিয়া আসিবার কারণ কি!—আছেন ভাল?"

"কারণ কি!" হরনারায়ণ অতি ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "কারণ কি!—তাকি তুমি জাননা; তুমিই এর কারণ; তোমাকে আমি বহুদিন হইল একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার একেবারে জবাবই দেও নাই। এই কি ভদ্রোচিত কার্য্য হইয়াছিল; তখন আপনি স্বইচ্ছায় ছাপাইবার ভার লইলে, নহিলে কি আমি লোক পাইতাম না। কাজেই পাছে অমূল্য পুস্তকখানি হাত ছাড়া হয়, সেই ভয়ে আসিতে বাধ্য হইয়াছি।"

যুবক বড়ই লজ্জিত হইলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, বহুদিন হইল হরনারায়ণ তাঁহাকে একখানা চিঠী লেখে, সেখানি তিনি তখন রাগ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন, কোন উত্তরই দেওয়া হয় নাই। বলিলেন, "মহাশয়, ক্ষমা করিবেন। কোন কারণ বশতঃ ছাপাইতে অপারক হইয়াছিলাম, আগামী শীতকালে সমস্ত নিশ্চয়ই আপনাকে ছাপাইয়া দিব!"

"অপারক কেন?—টাকার জন্য; এই নিন্—যত টাকা আবশ্যক নিন!—

পূর্ব্বে বলিলেই হইত; আমার উপর আপনার যদি এতই অবিশ্বাস, কোন্ পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা হইলে সমস্তই আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে দিতাম। হিসাব করিয়া দেখুন দেখি, কত টাকার আবশ্যক।"—এই বলিয়া জামার জেব হইতে মুদ্রাপূর্ণ একটী বৃহৎ থলি বাহির করিয়া হরনারায়ণ শৌরীন্দ্রের সম্মুখে ধরিল।

"কেন আর অধিক লজ্জা দেন; টাকার জন্য আপনার পুস্তক ছাপাইতে বিলম্ব করা হয় নাই—ছাপা না হইবার অন্যান্য অনেক কারণ ছিল।"—বিমর্ষভাবে শৌরীন্দ্রমোহন এই কথা বলিলেন।

"অন্য কারণ ত কিছুই দেখিতে পাই না," এই বলিয়া যেন হঠাৎ কোন কথা মনে পড়াতে হরনারায়ণ বলিয়া উঠিল. "ওঃ বুঝেছি, বুঝেছি, সেইজন্য আমার উপর আপনার এত রাগ; তা আমার ভগিনী বা ব্রজেন্দ্র বাবু আপনার চরিত্রের উপর যে সকল দোষ দেন, তার আমি একটী কথাও বিশ্বাস করি না। আর এক কথা, সে আমার ভগিনী, আপনি আমার বিশ্বাসী বন্ধু, আমার ও সকল কথায় থাকা কোন মতেই উচিত হয় না। যাহা হউক, ও সকল কথা যাইতে দিন; আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব চিরকালই থাকিবে। শীতকালে পুস্তকখানি ছাপা হইয়া উঠিবে ত। ভাল, ততদিন অবধি আমি না হয় অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।"

—কথাগুলি সমাপ্ত হইলে হরনারায়ণ সতৃষ্ণ নয়নে আপনার কক্ষস্থিত কাগজের তাড়াটীর উপর চাহিতে লাগিল।

হরনারায়ণের কথার ভাবে শৌরীন্দ্রমোহন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, সে একজন সম্পূর্ণ স্বার্থপর লোক; আপনার কাজ লইবার জন্য সে তাঁহার এত খোসামোদ করিতেছে। যে কালে জানকীবাই তাহার ভগিনী; যদিও সে মিথ্যা বলিয়া নিজের মন্দ স্বভাব ঢাকিবার নিমিত্ত তাঁহার নামে অমন অখ্যাতি রটনা করিতেছে; তথাপি সে তাহার ভাই হইয়া যখন সে কথা শুনিয়াও তাঁহার সহিত বেশ হাসি হাসি মুখে সদ্ভাব রাখিয়া কথা কহিতেছে, তখন তাহার ন্যায় স্বার্থপর লোক আর ইহ জগতে কয়জন আছে! যখন শৌরীন্দ্রমোহন দেখিলেন যে, হরনারায়ণ তাহার ভগিনীর বিষয়ে

কোন কথা কহিতে ইচ্ছুক নহে, তখন তাহার অনিচ্ছায় জানকী-বাইয়ের অসচ্চরিত্রার কথা তাহাকে শুনাইবার আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তিনি কোন কথা কহিলেন না, নীরবে স্বার্থান্ধ মানবের কথা ভাবিতে লাগিলেন। মনে করিলেন, যাহার খাইয়া হরনারায়ণ মানুষ, যাহার টাকা লইয়া সে নবাবী ফলাইতেছে, কি করিয়া সে তাহার প্রতিপালিকা ভগিনীর শত্রুকে বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিল।

"দেখুন শৌরীন্দ্র বাবু, আজকাল আমার ভগিনীপতির বড় বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভাব দেখিতে পাই; যতই দিন যাইতেছে, ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতেছেন। আমরা পীড়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিতেন না, কেবল অন্যমনস্কভাবে একদিকে চাহিয়া থাকিয়া একটু ম্লান হাসি হাসিতেন। আমরা অবশেষে জোর করিয়া ডাক্তার দেখাইয়াছিলাম। ডাক্তার বলিলেন, ক্ষয়কাশের সূত্রপাত হইয়াছে, অধিক চিন্তাই ইহার কারণ। যাহা হউক চিকিৎসার গুণে এখন একটু আছেন ভাল। সেইজন্যই না আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এত বিলম্ব হইল, নহিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই আসিয়া দেখা করিতাম।"

শৌরীন্দ্রমোহন সকলই শুনিলেন; মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, যে কাল সর্পীর তীব্র হলাহল যুগলকিশোরের অজ্ঞাতসারে তাহার শরীর জর্জ্জরিত করিতেছিল, তাহা কতদূর সাংঘাতিক তিনি এখন জানিতে পারিয়াছেন। আহা, এক স্ত্রীর কুচরিত্রের জন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছে; আপনার কার্য্যের বিষময় ফল আপনি এখন ভয়ানকরূপে ভোগ করিতেছে।'—কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথা হরনারায়ণকে কহিলেন না।

"হাঁ আপনি হিন্দী পুস্তক খানি ত ছাপাইবেন-ই, আর তার সঙ্গে আর একটী কার্য্যের ভারও আপনাকে লইতে হইবে," এই বলিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসির রেখা দেখাইয়া হরনারায়ণ চকিতের ন্যায় কুক্ষিস্থিত কাগজের তাড়াটী হস্তগত করিল।

সবিস্ময়ে শৌরীন্দ্রমোহন চাহিয়া দেখিলেন, কতকগুলা দেশী তুলাট কাগজে বৃহৎ বৃহৎ আঁকা বাঁকা বাঙ্গালা অক্ষরে কবিতার মত কতকগুলা কি

লেখা রহিয়াছে। তাঁহার কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল, হরনারায়ণের আকার প্রকার দেখিয়া তিনি সকলই ভুলিয়া গেলেন, হাসিয়া বলিলেন, "ওগুলা কি, দেখিতে পাই না।"

"পাইবেন বৈকি ?—আপনাকে দেখাইবার জন্যই ইহা আনা হইয়াছে। মনে পড়ে, আপনাকে যে চিঠি লিখি, তাহাতে লিখিয়াছিলাম, বঙ্গ ভাষায়, ভাল কবিতাপুস্তক নাই, বাঙ্গালা শিখিলেই সে অভাবটী দূর করিব—এগুলি তাহাই আর কি!"—এই বলিয়া কবি হরনারায়ণ তাড়াটীর পানে সঘনে চাহিতে চাহিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

শৌরীন্দ্রমোহন হরনারায়ণের হাত হইতে তাড়াটী লইয়া দেখিলেন, প্রতি ৭।৮ পংক্তি করিয়া কবিতা, তাহার প্রত্যেক পংক্তিতে গড়ে দুই চারিটা বর্ণাশুদ্ধি; প্রায় তিনশত পৃষ্ঠা আগাগোড়া বাঙ্গালা কবিতায় পূর্ণ—উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলেন যে তাহাতে স্থাবর জঙ্গম সকল প্রকার চেতন অচেতন পদার্থের উপরে একটা না একটা কবিতা লেখা রহিয়াছে—ভবিষ্যতে যে অন্য কবিরা কোন নূতন বিষয় লিখিয়া বাহাদুরী লইবেন, তাহার আর পথ রাখেন নাই। উহার কোথায় কি লেখা হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। পড়িবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে হরনারায়ণ তাঁহার হস্ত হইতে কাগজের বোঝা টানিয়া লইয়া বলিতে লাগিল, "শুনুন দেখি, কেমন সুন্দর কবিতা, কেমন মধুর ভাব; মনে করুন, একটী ভাঙ্গা, ভিতর বাহির ইটবার করা ঘর। তাহার ফাটলে ফাটলে আরশুলার বাসা, এখান ওখানে উড়িয়া বেড়াইতেছে। মেঝেয় একটা বিছানা তাহার লেপের খোলের ভিতর তুলা নাই—আর সেই লেপের কোণগুলি ছারপোকা পরিপূর্ণ, তাহার উপর একটী দুই হাতভাঙ্গা লোক শুইয়া আছে। আর এক পার্শ্বে একখানা কুলা লইয়া একটী পুংমার্জ্জার খেলা করিতেছে—এই ভাবটী কেমন সুন্দর কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি দেখুন দেখি"—এই বলিয়া হরনারায়ণ গম্ভীর ভাবে পড়িতে লাগিল—

"বিছানার উপর একজন শুলো, তার হাত দুখানা খুলো।
লেপখানার ভিতরে নাই আদপেতে তুলো॥

ঘরের কোণে ব'সে হুলো, বাক্সায় একখানা কুলো।
চারিধারে উড়ে বেড়ায় ছারপোকা আরশুলো।"

—"কেমন রচনা সুন্দর হয় নাই।"

উক্ত অদ্ভুত কবিতাটী শুনিয়া, হাসিলে পাছে বাড়াবাড়ি হয়, এই ভয়ে অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিয়া শৌরীন্দ্রমোহন বলিলেন, "হাঁ বেশ হইয়াছে। আপনার কবিতা আব কোন কালে খারাপ হইয়াছে; এখন চলুন, আহারাদি করিবেন চলুন।"

হরনারায়ণ সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া বলিতে লাগিল, "আমরা কি জানেন, আজন্ম কবি। যখন আমার বর্ণপরিচয় পর্য্যন্তও হয় নাই, যখন আমি তিন চারি বৎসরের শিশু ছিলাম, মুখে মুখে এমন সব কবিতা বানাইতাম যে, সকলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইত।"

শৌরীন্দ্রমোহন বলিলেন, "আপনার ক্ষমতার পরিচয় আর আমাকে অধিক দিতে হইবে না। আমি সকলই জানি, এখন চলুন, বেলা প্রায় এগারটা বাজে।"

হরনারায়ণ আপন মনে বকিতে লাগিল, "হাঁ দেখুন শৌরীন্দ্র বাবু, এক বড় মজা হইয়াছিল; আমি কোকিলের উপর পদ্য লিখিতেছিলাম, সবে দুই চরণ মাত্র লিখিয়াছি, এমন সময়ে ব্রজেন্দ্র বলিলেন, কি কোকিল, পুরুষ না মেয়ে। আমি বলিলাম, দেখিতেছেন না, যখন 'কুহু কুহু রবে ডাক গাছের আড়ালে', এইরূপ বলিয়া সম্বোধন করা গিয়াছে, তখন পুরুষ না ত কি মেয়ে। তা হাঁ শৌরীন্দ্র বাবু, আমার ঠিক বলা হয় নাই, পুরুষ কোকিলেরই ত গলা ভাল।"

শৌরীন্দ্রমোহন বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি আবার কবে ঠিক্ ছাড়া বেঠিক্ লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, এখন চলুন বেলা অধিক হইয়াছে, আহারাদি করিবেন চলুন।"

হরনারায়ণের যেন চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে বলিল, "আমরা বেহারী কায়স্থ, আমরা ত আপনাদের বা আপনার দেশীয় ব্রাহ্মণের হাতে খাইব না।"

"বেশ আপনাকে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া দেওয়া যাইবে, আপনি স্বহস্তে পাক করিয়া খাইবেন," এই বলিয়া হরনারায়ণকে লইয়া শৌরীন্দ্রমোহন পাকশালা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তখন হরনারায়ণও একটী স্বরচিত আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের প্রথম চরণ দুইটী গায়িতে গায়িতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—

"যাদু, এখন বড় আয়েসেতে চড়্‌চ একা।
জান না যে দুদিন পরে পেতে তোমায় হবে অকা॥"

ত্রিংশ স্তবক।

রাজমহলের ধ্বংসাবশেষ।

রাজমহলের পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রধানতঃ সাঁওতালদিগের বসতি; পাহাড়ের উপর জঙ্গলময় স্থানে হিংস্র জন্তুদিগের সহিত পাহাড়ীয়া নামক এক সম্পূর্ণ বন্য জাতি বাস করে। সাঁওতালেরা যে কেবল রাজমহলের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে, এমত নহে, দক্ষিণ পশ্চিমে তিনপাহাড়াদি ছাড়াইয়া বহুদূরে এবং উত্তর ও পশ্চিমে কিছুদূর ব্যাপিয়া তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অবস্থা অতি হীন। যখন আর্য্যজাতি এদেশে আসিয়া আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন, তখন অধিকাংশ আদিম অধিবাসীই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করে; অবশিষ্টাংশ নানা স্থানের নানা পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক এক অঞ্চলে তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম; কোল, সাঁওতাল ভিল, গোন্দ এবং এরূপ প্রায় শতাধিক ভিন্ন ভাষী, ভিন্ন আচার ব্যবহার-ক্রান্ত অসভ্য জাতি ভারতবর্ষের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অবধি তাহারা অসভ্য বলিয়া পরিগণিত; যাহারা সভ্যজাতির নিকটস্থ প্রদেশে বাস করিত, তাহারা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় থাকিয়া সামান্য কৃষিকর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, আর যাহারা বহুদূরে থাকিত তাহারা সম্পূর্ণ

উলঙ্গাবস্থায় আম মাংস ভক্ষণে দিন কাটাইত। মুসলমানদের সময়েও তাহাদের কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই; কিন্তু বৃটিশ শাসনে বিশেষতঃ ইংরাজ পাদ্রিদিগের যত্নে তাহারা ক্রমে সভ্য হইতেছে; লেখাপড়া শিখিতেছে, ভাল বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছে; গৃহনির্ম্মাণ, কৃষিকর্ম্ম এবং আপনাদের আহারীয় দ্রব্যাদির অনেক উন্নতি করিয়াছে। তথাপি এখনও অনেক দূরে জঙ্গলময় স্থানের অসভ্য অধিবাসীরা কেহ সীবিত পত্র পরিধান করিয়া আর কেহ কেহ বা সম্পূর্ণ উলঙ্গভাবে বাস করে।

কিন্তু তাহাদের সে অসভ্যতা এখনকার সভ্যাবস্থা হইতে অনেক গুণে প্রার্থনীয়। সভ্য জগতের কেহ সামান্য বিষয়েও ইষ্টাম্প কাগজে বিনা রেজেষ্টরিতে একজন লক্ষপতিকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেই ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত চির-দরিদ্র সাঁওতালকে অনায়াসে বহু মুদ্রা দিয়া বিশ্বাস করিতে পারিত। তাহারা যে সকল অন্যায় কার্য্য করিত, তাহা প্রায় না বুঝিয়া করিত না; আর যদি বা করিত, মুক্তকণ্ঠে বিচারালয়ে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা সত্যবাদী ছিল; প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, স্বপ্নেও তাহারা জানিত না; কিন্তু ক্রমে যতই তাহাদের ভিতর সভ্যতালোকের বিস্তার হইতেছে, ততই তাহাদের মহৎ গুণ-গুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে।

১৮৫৫ সালে লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে সাঁওতালেরা যে বিদ্রোহ উপস্থিত করে তাহা এখন আর নাই। যে বিদ্রোহকে লোকে সাঁওতালবিদ্রোহ নামে উক্ত করিয়া থাকে, জমীদার এবং মহাজনদিগের উৎপীড়নই যাহার কারণ, সে বিদ্রোহ এখন শান্তভাব অবলম্বন করিয়াছে। সাঁওতালদের আবার ঘরে ঘরে শান্তি বিরাজ করিতেছে। আপনাদের মাতৃভূমি পার্ব্বত্য প্রদেশ ছাড়িয়া যে ত্রিংশসহস্র সাঁওতাল কুঠার এবং বিষাক্ত তীর হস্তে ইংরাজজাতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমতলভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল এবং পথে লুণ্ঠন ও নরহত্যা আদি অনেক ভয়ানক কার্য্য করিয়া সেখানকার নিরীহ অধিবাসীদিগের মনে ভয়ানক ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল, ইংরাজরাজের একটী সামান্য শিক্ষিত

সেনাদল যাইয়া সেই অশিক্ষিত সাঁওতালদিগকে আবার শান্তভাবে পার্ব্বত্যপ্রদেশ আশ্রয় করাইয়াছে। তাহাদিগের সুশাসনের নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা আর কোনরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে না পারে, সেইজন্য তখনকার ভারতরাজ লর্ড ডালহৌসী সাঁওতালদিগকে একজন স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তার অধীনে রাখিয়াছিলেন। এখন সাঁওতালেরা তাহাদের স্বাভাবিক নিরীহ প্রকৃতি ধারণ করিয়াছে, আর প্রতি সাঁওতাল-গৃহে নির্দ্দোষ আমোদলহরী উথলিয়া উঠিতেছে।

যুবকের পিতা দরিদ্র সাঁওতালদিগকে বড় যত্ন করিতেন, তাহা-দিগকে সময়ে সময়ে অনেক সাহায্য করিতেন, কাজেই তাহারাও তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। অসভ্য জাতির আর এক প্রধান গুণ এই যে, তাহারা কৃতজ্ঞ। যে তাহাদের একবার কোন উপকার করে, প্রাণান্তেও কখন তাহার অনিষ্ট চেষ্টা করিবে না। সেইজন্য চারি ধারে সাঁওতাল-বেষ্টিত থাকিয়াও সেই বিদ্রোহের সময় তাঁহার বাগান বাড়ীখানি এবং লোকজন নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছিল।

রাজমহল ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। কলিকাতা হইতে নৌকাপথে ভাগিরথী দিয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়া যাও, ক্রমে দূর হইতে বহু ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দেখিতে পাইবে, সেই সকলই রাজমহলের পাহাড় নামে উক্ত, সাঁওতালদিগের প্রধান আবাস-ভূমি। যতই অগ্রসর হইবে, ততই সেই মেঘগুলি গভীর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিবে, অবশেষে যখন তাহার নিকটে আসিবে, তখন দেখিবে, সম্মুখে একটী মালভূমি, নানাবিধ বৃক্ষে আবৃত; আর দূরে থাকে থাকে পর পর অসংখ্য অসংখ্য ক্ষুদ্র পাহাড় শোভা পাইতেছে।

সাজাহান যখন আপন পুত্র সুজাকে বাঙ্গালার সুবাদারী প্রদান করেন, তখন সুজা রাজমহলে বাঙ্গালার রাজধানী স্থাপন করিয়া-ছিলেন; সে সময়ে রাজমহলের এক শোভাময়ী মূর্ত্তি ছিল। চারি ধারে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর সৌধমালা শোভা পাইত, কত দেবমন্দির, কত সুদৃশ্য মস্‌জিদে রাজমহলের শোভা বৃদ্ধি করিত। কত সুন্দর রাজপথ, কত বৃক্ষ-

বাটিকা, দীর্ঘিকা, কত প্রস্তরবদ্ধ কূপ শোভা পাইত। রাজপথগুলি আমীর, ওমরাহ এবং অন্যান্য ধনী লোকদিগের হস্তী, অশ্ব, পাল্কী, এবং এক্কায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। নিয়ত লোকের কলরবে রাজমহল প্রতিধ্বনিত হইত। তীরে কত শোভন হর্ম্ম্যরাজী সগর্ব্বে জলে আপনাদের প্রতিবিম্ব ফেলিত, আর ভাগীরথীর সলিলে সে কাল ছায়া পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইত। নদীতে কত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র নৌকা কত রূপ বাণিজ্য দ্রব্যে পূর্ণিত হইয়া নিয়ত যাওয়া আসা করিত। কিন্তু কালে সকলই যায়, কিছুই থাকে না। ক্রমে যখন রাজমহল হইতে অন্যত্রে রাজধানী নীত হইল; সকল প্রধান প্রধান লোকে একে একে আপনাদের বসৎবাটীর মায়া ত্যাগ করিয়া অর্থের নিমিত্ত নূতন রাজধানীকে অলঙ্কৃত করিতে লাগিল; ক্রমে যখন রাজমহল একেবারে পরিত্যক্ত হইল, কাল দ্বিগুণ বিক্রমে তাহার উপর আপনার প্রভুত্ব খাটাইতে লাগিল; আজ মন্দির মস্‌জিদের চূড়া ভাঙ্গে, কাল অট্টালিকার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেয়, সুগম্য রাজপথ জঙ্গলে পরিপূর্ণ করে, শৃগাল কুক্কুর এবং অন্যান্য হিংস্র জন্তুদিগকে তাহার ভিতরে আশ্রয় দেয়, এইরূপে কাল ক্রমে রাজমহলের উপর আপনার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব খাটাইয়া, সেই সুন্দর নগরটীকে চূর্ণ বিচূর্ণিত করিয়া একটী বৃহৎ অরণ্যানীতে পরিণত করিল। এখনও যদি কেহ সেই অরণ্যের ভিতর যায়, তবে পুরাতন রাজ-মহলের ভগ্নাবশেষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পায়। তাহার ভিতর কোথা-ওবা সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় পতিত, কাহার কাহারও বা ভিত্তিভূমি মাত্র অবশিষ্ট, কোথাও বা উন্নত মস্‌জিদ বা মন্দিরের চূড়া পতিত, কোথাও বা পূর্ব্বের সুন্দর দীর্ঘিকা জলজ বৃক্ষে পূর্ণ রহিয়াছে, কোথাও পূর্ব্বের রাজপথের সামান্য চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ এখনও এই জঙ্গলের মধ্যে পুরাতন রাজমহলের অনেক চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

যাহাকে এখন রাজমহল কহে, তাহা কিছুই নহে; একখানি সামান্য গ্রাম মাত্র। অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই এখন সেখানে বসতি; পূর্ব্বের

সে সৌন্দর্য্য বা সে ঐশ্বর্য্যের কোন চিহ্নই এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। যেমন সামান্য গ্রাম সচরাচর হইয়া থাকে, সেইরূপ; কিন্তু দেখিতে যে মনোহর ও সুদৃশ্য তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ তাহারই নিকটে পুরাতন রাজমহলের সৌভাগ্য-চিহ্ন এখনও দেখিবার একটী প্রধান বস্তু।

হরনারায়ণ সেইখানেই রহিলেন। স্থানটী তাঁহার মনোনীত হইয়াছিল, সে কারণ শৌরীন্দ্রমোহনের সামান্য অনুরোধেই তিনি সেই স্থানে কিছু-দিনের জন্য থাকিতে মনস্থ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াই বাড়ী যাইবেন, স্থির করিয়া একখানি গাড়ী 'যাওয়া আসার' ভাড়া করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর পূর্ব্বের সে রাগ রাগ ভাব নাই, যুবকের বাক্যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গাড়ীবান্‌কে টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হইল।

হরনারায়ণের থাকিবার আর একটী প্রধান কারণ ছিল। সাঁওতালদের রীতি নীতি জানিয়া ও তাহাদের জাতির উৎপত্তি, বিস্তার আদি সমস্ত বিষয় শিখিয়া, একখানি "সাঁওতাল জাতির জয়" নামক মহাকাব্য রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আর পুরাতন রাজমহলের ধ্বংসাবশেষগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া, তাহার উন্নতি ও পতন লইয়া অপর একখানি কাব্য লিখিতে তাঁহার আন্তরিক বাসনা ছিল। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এই দুইখানি কাব্য লিখিতে পারিলেই তাঁহার সুযশ আরও বৃদ্ধি পাইবে; চিরকালের জন্য পৃথিবীতে তাঁহার নাম থাকিয়া যাইবে।

সাঁওতালদের বিষয়ে যাহা জানিবার তাহা সে স্থানের আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন।

যাহা শিখিলেন, তাহা এই—"সাঁওতালদের আদিপুরুষ ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করেন (১); তাহার পর ক্রমে বংশবৃদ্ধি; হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের বিস্তৃতি; একজন বিরোর-জাতীয় পুরুষের সহিত

(১) সাঁওতালজাতির মধ্যে এরূপ প্রবাদ আছে যে, সিংবঙ্গার আদেশে মারাং বুরুর ইচ্ছায় দুই হংসডিম্ব হইতে এক স্ত্রী ও এক পুরুষের উৎপত্তি হয়; পুরুষের নাম মানিকো এবং স্ত্রীর নাম জাহিরইরা। পরে তাহাদের পরস্পর সহবাসে ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি হইয়াছে।

তাঁহাদের জাতীয় এক কন্যার সহযোগে মধু সিং নামে এক সন্তানের উৎপত্তি, এবং সেই পুত্রের উপদ্রবে তাহাদের নানাস্থানে অধিবাস। রেওয়া, মানভূম, কটক, হাজারিবাগ, ছোটনাগপুর, পালামৌ, সাঁওতাল পরগণা আদি অনেক স্থানে তাহাদের নানা শ্রেণীর বাস। সিংবঙ্গা (সূর্য্য) তাঁহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা—মারাং বুরু (বৃহৎ পর্ব্বত) এবং চান্দো বঙ্গা (চন্দ্র) ও তাহাদের অর্চ্চনীয়; বোরামাঞ্জি নামক একজন বিখ্যাত বীরপুরুষের আত্মার তাহারা অর্চ্চনা করে। ইহা ব্যতীত অনেক ভুতপ্রেতের ও তাহারা উপাসনা করিয়া থাকে; ব্যাঘ্র যাঁহাকে তাহারা বাঘভূত বলে, এবং হস্তীও তাহাদের পূজনীয়। হিন্দজাতি ইহাদের নিকট হইতে অনেক গ্রাম্য দেবদেবীর সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সাওন্ত (এক্ষণে মেদিনীপুরের অন্তর্গত সিলদা) নামক গ্রাম হইতে তাহাদের সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। ১৮৩২ সালে তাহাদের সাঁওতাল পরগণায় উপনিবেশ স্থাপন।"

তাঁহার উক্ত মহাকাব্যের জন্য যে সকল উপকরণ আবশ্যক, সমস্ত জানা হইল। ইহা ব্যতীত আর একটী নূতন বিষয় এই জানিলেন যে, সাঁওতাল ছাড়া পাহাড়ের উপরিভাগে পাহাড়ীয়া নামক আর এক বন্যজাতি বাস করে; তাহাদের প্রধান দেবতার নাম 'বুদো গোঁসাই', এবং অন্যান্য বিষয়ে তাহারা প্রায় সাঁওতালজাতির তুল্য।

একখানি কাব্যের ত উপকরণ সংগ্রহ হইল। এখন আর একখানির ত আবশ্যক। হরনারায়ণ শৌরীন্দ্রমোহনকে রাজমহল দেখিবার জন্য মহা অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শীঘ্রই দিন স্থির করা হইল। উভয়ে সেই নির্দ্ধারিত দিনে রাজমহল অভিমুখে চলিলেন।

রাজমহলের সেই ধ্বংসাবশেষ গুলি দেখিয়া উভয়ে বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। মহৎলোক দরিদ্র হইলেও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন কিরূপ বর্ত্তমান থাকে, তদ্দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলেন। ভারতবর্ষের নগরগুলি চিরকালের জন্যই বিখ্যাত। কোন ইংরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, লণ্ডন নগর ধ্বংস হইলেও ইহার তুল্য হইবে

না ;—ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশেষে তিনি এত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলেন! পূর্ব্ব হিন্দু রাজা এবং নগরবাসীদের এত অতুল সম্পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলেন।

যতদূর সাধ্য ততদূর শোভাময়ী করিয়া সুজা রাজমহলকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; তখনকার বাদসাহদিগের রাজধানী আগরা কিম্বা দিল্লীকেও যেন ইহা সৌন্দর্য্যে সমকক্ষ ভাবিয়া উপহাস করিত। এখন সেই নগরের ধ্বংসাবশেষ,—সেই সকল সুন্দর সুন্দর মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাংশ, গগণস্পর্শী সুন্দর মন্দির বা মসজিদগুলির শেষ চিহ্ন, [illegible] কূপ এবং দীর্ঘিকা-শোভিত রাজপথগুলির অস্তিত্বের নিদর্শন দেখিয়া ইহার পূর্ব্বকীর্ত্তি এবং বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া কাহার না মনে কালের অসীম ক্ষমতার ধারণা হয়!

এই সকল দেখিয়া হরনারায়ণ বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। আসিবার সময় পথে শৌরীন্দ্রমোহনকে বলিলেন, "দেখুন, 'সাঁওতাল জাতির জয়খানি' আগে লেখা হইবে না। কালের কতদূর ক্ষমতা ত দেখিলেন ; এবার বাড়ী যাইয়াই রাজমহলের স্থাপন ও পতন লইয়া একখানি পুস্তক লিখিব, তাহার নাম দিব "কালমাহাত্ম্য।"

শৌরীন্দ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, "কালমাহাত্ম্য ?—'কাল-মাহাত্ম্য,' নাম কি করিয়া দিবেন। কালের কোটী কোটী খেলার মধ্যে তুই একটী দেখিয়াছেন মাত্র। সহস্র সহস্র বৎসরের ভিতর সে কত কাণ্ড করিয়াছে, এ তাহার একটী ঘটনা মাত্র। ইহাতে কালের অসীম ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় কিরূপে দেওয়া হইবে।"

হরনারায়ণ বড় চিন্তিত হইলেন ; কিয়ৎক্ষণ একাগ্রচিত্তে ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ঠিক্ বলিয়াছেন ; ও নামটী দেওয়া হইবে না। 'রাজমহল কাব্য' এই নাম দিব। কেমন নামটী সুন্দর হয় নাই ?"

"বেশ নাম, অতি সুন্দর হইয়াছে।"—শৌরীন্দ্রমোহন উত্তর দিলেন।

"আর দেখুন, এ পুস্তকখানি যখন ছাপান যাইবে, তার সঙ্গে সঙ্গে একখানি উৎসর্গ-পত্রও ছাপাইব।"

"উৎসর্গ-পত্র ছাপাইবেন ?—কাহার নামে ?—কাহাকে আপনার ও

অমূল্য পুস্তকখানি উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।”—যুবক যেন কিছু বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই কথা বলিলেন।

হরনারায়ণ কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, “দেখুন; ফুলকুমারী আমার বড় কবিতা-প্রিয়; কবিতা শুনিতে ও শুনাইতে সে বড় ভালবাসিত। ফুলকুমারী বলিয়াছিল যে, যে দিন আমি মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইব, সেই দিনই সে আমাকে বিবাহ করিবে। ফুলকুমারীকে আমি বড় ভালবাসিতাম, এখনও বাসি; তাহারই নামে উৎসর্গ-পত্র ছাপাইব।”

হরনারায়ণের কথা শুনিয়া যুবক বিস্মিত হইলেন; তাঁহার মনে পড়িল যে, যুগলকিশোরের বাড়ীতে অবস্থান-কালে তিনি একদিন হরনারায়ণকে ‘কাঁহা যাওয়ে’ আদি একটী কবিতায় ফুলকুমারীর উল্লেখ করিতে শুনিয়াছিলেন; এখন বুঝিলেন যে, এ সেই ফুলকুমারী। হাসিয়া বলিলেন, “বেশ যোগ্যপাত্রীর হস্তেই পুস্তকখানি অর্পণ করা হইবে, কিন্তু ফুলকুমারী কে?—কই, আপনি একদিনও ত আমাকে তাঁহার বিষয়ের কোন কথা শুনান নাই।”

হরনারায়ণ কিছু বিনীতভাবে কহিলেন, “মাপ্ করিবেন?—আপনার সকল অনুরোধ আমি রাখিতে পারি, কিন্তু এটী পালন করিতে আমি অক্ষম। ফুলকুমারী কে?—তাহার সহিত কিরূপে আমার প্রথম আলাপ হয়, তাহা আমি এখন বলিতে পারিব না। যদি ঈশ্বর করেন, সময়ে সমস্ত কথা আপনাকে শুনাইব।”

শৌরীন্দ্রমোহন বলিলেন, “ভাল, আপনি যে কথা গোপন করিতে ইচ্ছুক, আমি তাহা শুনিবার জন্য উপরোধ করিতে চাহি না। ফুলকুমারীর কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি?”

হরনারায়ণ অন্যমনস্ক হইলেন; তাঁহার অজ্ঞাতসারে একটী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “ফুলকুমারী আমাকে বড় ভালবাসিত, আমিও তাহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসি। কিন্তু তাহার একটী দৃঢ় পণ। সে বলিত, যে দিন তুমি মহাকবি বলিয়া বিখ্যাত হইবে, সেই দিন হইতে আমি তোমার হইব। সে যখন আমাকে ছাড়িয়া

যায়, তখন বলিয়া গিয়াছে, 'আমি যেখানেই থাকি না কেন, লোক-মুখে তোমার কবিতার সুখ্যাতি শুনিলেই তোমার নিকট উপস্থিত হইব।'—সেই জন্যই না একজন বিখ্যাত কবি হইতে আমার এতদূর চেষ্টা।"

একত্রিংশ স্তবক।

নূতন পরিচয়।

ক্রমে তাঁহারা বর্ত্তমান রাজমহলের একমাত্র প্রশস্ত রাজপথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। পথে হরনারায়ণ এবং শৌরীন্দ্রমোহনের আর কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। হরনারায়ণ ফুলকুমারীর চিন্তায় মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যুবক তাঁহাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

উভয়ে নীরবে সেই পথটী অতিক্রম করিতে লাগিলেন; কিছুদূর আসিলে, একজন সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিত লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রাজমহলে একে ভদ্রলোকের বসতি অতি বিরল, তাহাতে আবার একজন সুন্দর সুবেশে ভূষিত লোককে সম্মুখে দেখিয়া যুবক বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মনে ধারণা ছিল, রাজমহলে আদতে ভদ্রলোকের বাস নাই, তাহাতে আবার আগন্তুক আকৃতিতে সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং কলিকাতার নিকটবাসী বলিয়া বোধ হইল।

উপস্থিত লোকটীও যেন আশ্চর্য্যভাবে তাঁহাদের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশের উপর; মাথার কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যে কচিৎ দুই একগাছি শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। মুখখানি প্রফুল্ল। বৃহৎ নেত্রদ্বয়ের ভিতর প্রগাঢ় নীল তারকা দুইটী চঞ্চলভাবে ঘুরিতেছে। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, সে সুন্দর সুগঠিত দেহে সে রূপের মাধুরী আরও বাড়িয়াছে। যদিও দেহে এখনও যৌবনের সৌন্দর্য্য নাই, তত্রাচ সে সুন্দরও নশ্বর দেহকান্তি দেখিলে সহজেই লোকে মুগ্ধ হইতে পারে। বোধ হয় দুই

চারি বৎসর হইল, যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়া প্রৌঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আগন্তুক বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়দের কি এইখানে থাকা হয়।"

হরনারায়ণ এতক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিল, যেমাত্র উক্ত কথাগুলি কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি বলিয়া উঠিল, "আমার নাম কবি হর-নারায়ণ—ভাগলপুরে বাড়ী। কাব্য লিখা আমার কার্য্য। আমার নাম আপনি হয় ত শুনিয়া থাকিবেন, আর যদি একান্তই না শুনিয়া থাকেন, শীঘ্রই শুনিবেন। শীঘ্রই আমার নাম দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া যাইবে। কেহ ছাপিয়া রাখিতে পারিবে না। ইঁহার নাম শৌরীন্দ্রবাবু, কায়স্থ ইনি; বাড়ী শিয়ালদহে। ভারি আমায়িক লোক, অতুল বিষয়, শরীরে অত্যন্ত দয়া।"

যুবক আত্ম-প্রশংসায় বড় লজ্জিত হইতেন। বিনীত ভাবে বলিলেন, "না মহাশয়, আমি একজন সামান্য লোক; আমার নাম ওই বটে, জাতিতেও কায়স্থ; বাড়ীও শিয়ালদহে—যৎকিঞ্চিৎ পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়াছি; আমার কোন গুণই নাই।"

অপরিচিত ব্যক্তিটী হাসিয়া বলিলেন, "মহতের স্বভাব ঐরূপই হইয়া থাকে—তাঁহারা আত্মগর্ব্ব করিতে ভাল বাসেন না। মহাশয়ের এখানে কি জন্য আসা হইয়াছে।"

যুবক উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরনারায়ণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "রাজমহলের কিছু দূরে পেথম পাহাড় নামে যে একটী পাহাড় আছে, তাহারই নিকটে ইহাঁর একখানি নির্জ্জন আবাস; সেইখানেই আমরা দুইজনে থাকি। এখানে পুরাতন রাজমহলের ভগ্নাবশেষ দেখিতে আসিয়াছিলাম, দেখা হইল, এখন বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি। আর যে আত্মগর্ব্বের কথা বলিলেন, তা যথার্থ কথা বলিতে দোষ কি! তাহাতে আর আত্মগর্ব্ব কি দেখান হইল! আমি যে, আপনাকে আপনি কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সে কথা কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন।"—এই বলিয়া আমার জেব হইতে সেই অসংখ্য কবিতা-শোভিত কাগজের তাড়াটী বাহির করিয়া

আগন্তুকের পায়ের নিকট ফেলিয়া দিল। সে পুঁথীখানি সঙ্গে সঙ্গে লইয়া ফিরিত।

হরনারায়ণের অদ্ভুত আচরণে সেই নব-পরিচিত লোকটী অবাক্ হইয়া অনিমিষ লোচনে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনও তাঁহার সঙ্গীকে এরূপ উন্মত্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে দেখিয়া লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া অধোবদনে রহিলেন।

হরনারায়ণ অপ্রস্তুত হইবার ছেলে নহে। সে আবার বলিতে লাগিল, "বেশ সময়েই মনে পড়িয়াছে। হাঁ মহাশয়, রাজমহলের স্থাপন হইতে পতন পর্য্যন্ত ঘটনাগুলির একটী সংক্ষেপ বিবরণ দিইতে পারেন।"

ভদ্রলোকটী কি করেন, যখন জিজ্ঞাসা করিল, কাজেই যাহা জানিতেন, বলিতে হইল,—"রাজমহল বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু রাজাগণ এইখানে প্রমোদ-গৃহ এবং উদ্যান নির্ম্মাণ করাইতেন; এবং রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই এখানে আসিয়া কিছু দিন আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া যাইতেন। তাহার পর মুসলমানদের রাজত্বকালে বহুদিন এ নগরী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মধ্যে মানসিংহ ইহার পুনর্নির্ম্মাণ করাইয়া এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার পর কিছু দিনের জন্য অন্যত্র রাজধানী নীত হয়। অবশেষে যখন সাজাহান বাদ্‌সাহের দ্বিতীয় পুত্র সুজা বাঙ্গালার সুবাদারী প্রাপ্ত হন, তিনি ইহার জীর্ণ-সংস্কার করিয়া এখানে রাজধানীর পুনঃস্থাপন করেন। তাঁহার শাসন-কালে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে এই নগরীর অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা, রাজপথ পদ্মাগর্ভে সমাহিত হইয়াছিল; কিন্তু অর্থ এবং যত্নে কি না হয়, সুজার অধ্যবসায়ে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুন্দর করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু যখন সুজার রাজত্ব ফুরাইল, মীরজুম্লা আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া, ঢাকায় রাজধানী নীত করিলেন; ক্রমে ক্রমে কালের প্রভাবে রাজমহল আধুনিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল—এই রাজমহলের ইতিহাস। অনেক রাজা এখানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহাকে রাজমহল বলে।"

হরনারায়ণ গম্ভীরভাবে সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "হুঁ হুঁ, হয়েছে, হয়েছে; আর বলিতে হইবে না। আপনি যাহা বলিলেন, ইহাই যথেষ্ট; ইহাতে ত্রিশ সর্গ, আর এক পুরাতন রাজমহলের যে অবস্থা দেখিলাম, তাহাতে দশটী সর্গ, সর্ব্বশুদ্ধ এই চল্লিশটী সর্গে পুস্তকখানি সমাপ্ত করা যাইবে। মহাশয়, আপনার নাম কি?"

"আমার নাম রামহরি বসু; বাড়ী হুগলীর নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুরে। দুই বৎসর হইল, এখানে বাস করিতেছি।"

"বেশ্ বেশ্, দেখুন রামহরি বাবু, 'রাজমহল কাব্যখানি' ছাপা হইলেই, আপনাকে একখণ্ড পাঠাইয়া দিব। আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, তাহা চিরকাল স্মরণ থাকিবে।"

রামহরি বাবু পাগলের কথায় কি উত্তর দিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। পরে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনার আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ।"

"অনুগ্রহ আর কি!—অনুগ্রহ কিছুই না; আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইতে আমি সম্পূর্ণ বাধ্য।"

শৌরীন্দ্রমোহনকে সম্বোধন করিয়া রামহরি বাবু বলিলেন, "যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনারা আমার বাড়ীতে যান, তাহা হইলে আমি বড়ই বাধিত হইব। আমাদের দেশের ভদ্রলোকেরা প্রায়ই কেহ এখানে আসেন না; যদি আপনাদের সহিত ভাগ্যক্রমে দেখা হইল, তবে একবার অনুগ্রহ করিয়া যাইবেন কি!"

যুবক লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সে কি মহাশয়, আপনার অত অনুরোধ করিবার আবশ্যক কি!—আমার যাইতে কোন আপত্তি নাই; তবে, ইনি না কি আমার সঙ্গে আসিয়াছেন, ইনি সম্মত হইলেই যাইতে পারি!"

"আমি এখনই বাড়ী যাইব! আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিতে পারি না। বিলম্বে কার্য্য ক্ষতি হইবে; কাল হইতে যেরূপে হউক লিখিতে আরম্ভ করিব। তবে এগুলা তোমার কাছে থাক্"—এই বলিয়া কবিতাগুলি ভূমি হইতে সযত্নে তুলিয়া যুবকের হাতে দিয়া হরনারায়ণ প্রস্থানোন্মুখ হইলেন।

"সে কি ?—সত্য সত্যই যাইবে নাকি !"—যুবক ব্যগ্রভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"যথার্থ না ত কি তামাসা ! এই পুস্তকখানি যত শীঘ্র ছাপাইতে পারিব, ততই আহ্লাদের বিষয় ; জানইত, ইহার উপর আমার ভবিষ্যত সুখ নির্ভর করিতেছে। তবে আসি ভাই ; মহাশয়, তবে চলিলাম।"

—এই কথা বলিতে বলিতে হরনারায়ণ দৃষ্টির বাহির হইয়া পড়িল।

দ্বাত্রিংশ স্তবক।

রামহরিবাবুর অভিলাষ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যুবকের প্রকৃতনাম শৌরীন্দ্রমোহন ; নরেন্দ্রনাথ তাঁহার একটী কল্পিত নাম মাত্র। আমরা বহুদিন অবধি তাঁহাকে নরেন্দ্রনাথ নামে অভিহিত করিয়া আসিতেছিলাম ; কিন্তু প্রকৃত নাম গোপন করিয়া একটী কল্পিত নামে সম্বোধন করা কোনমতেই উচিত হয় না ; তবে যখন নিতান্ত আবশ্যক হইবে, তখনই নরেন্দ্রনাথ বলিয়া উল্লেখ করা যাইবে।

রাজমহলের একপ্রান্তে রামহরিবাবু সপরিবারে বাস করিতেন। তাঁহার পরিবারের মধ্যে স্ত্রী তারাসুন্দরী, আর কন্যা হেমলতা। তারাসুন্দরী সুরূপা ; এই বলিলেই যথেষ্ট হয়, আমরা যাহাকে নির্দ্দোষ সুন্দরী বলিয়া থাকি, তারাসুন্দরী তাহাই। তারাসুন্দরীর বয়স প্রায় তেত্রিশ বৎসর হইবে। পূর্ণযৌবনের সীমা উত্তীর্ণ—কিন্তু এখনও তাঁহার শরীরে লাবণ্যের হ্রাস হয় নাই। তাঁহাকে দেখিলে নয়ন তৃপ্ত হয় এবং বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, তারাসুন্দরী এককালে অতুল্য সুন্দরী ছিলেন।

হেমলতা ও সুন্দরী—অনুপমা, অতুলনীয়া সুন্দরী ; সেরূপের তুলনা সহজে পাওয়া যায়না ; যে দেখিয়াছে, সে সেইরূপের কথঞ্চিৎ মনে ধারণা

করিতে পারে। তাহার আকৃতিতে এমন একটী মোহিনী-শক্তি ছিল যে, কি স্ত্রী কি পুরুষ কেহই তাহাকে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে পারিত না। হেমলতা যখন কুঞ্চিত ঘোরকৃষ্ণ অলকদাম স্তবকে স্তবকে এলাইয়া বঙ্কিমভাবে দাঁড়াইত, তখন সে রূপরাশি আরও উছলিয়া উঠিত; স্ত্রী সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী স্বয়ং রতিদেবীও সে রূপ দেখিয়া যেন লজ্জা পাইতেন।

রামহরি বাবু যে বাড়ীতে থাকিতেন, তাহা একটী সুন্দর দোমহল বাঙ্গালা। উপরে বেশ সুরকী দিয়া গাঁথা খোলার চাল। ভিতরে সবুজ রংমাখান কাঠের ছাউনী; চারিধারে সাসীআঁটা রুজু খড়খড়ি, বৃহৎ বৃহৎ পেনেলা কপাট। প্রায় দশ বারটী গৃহ, সকলগুলিই সুন্দর, সুবৃহৎ; ভাল ভাল গৃহসজ্জায় শোভিত। কত ছবি, কত কেদারা, কত কৌচ, ঘরটীকে অলঙ্কৃত করিতেছে। তাহাদের মেঝেয় সুন্দর কারপেট পাতা—দিয়ালের গায়ে রং মাখান, তার উপরে কাল ও সবুজ রঙে নানা রকম লতাপাতা কাটা। বাটীর চারিপার্শ্ব ঘেরিয়া প্রায় পাঁচ বিঘাজমী—তার ভিতর গোলাকার, পঞ্চকোণ, চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ আদি কত প্রকারের কেয়ারী করা জায়গা। তার মধ্যে যেখানে যেটী দিলে শোভাবৃদ্ধি হয়, সেখানে সেই গাছটী বসান। কত সুগন্ধ ফুল, মৃদু স্নিগ্ধ সমীর-হিল্লোলে হেলিতেছে, দুলিতেছে, যেন হাসিয়া হাসিয়া সকলকে বলিতেছে, 'দেখ, দেখ, আমাদের সৌন্দর্য্য দেখ; আমরা আপনার রূপে আপনারা মোহিত হইয়াছি, সমীরণকেও মোহিত করিয়াছি; ঐ দেখ, সে প্রেমভরে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। একবার এ রূপ এ সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লও।'—রাস্তা হইতে বাটীর দ্বার অবধি একটী সুন্দর প্রশস্ত কাঁকরফেলা পথ।

হরনারায়ণ চলিয়া যাইলে পর, রামহরি বাবু ও গৌরীন্দ্রমোহন উভয়ে কথা কহিতে কহিতে সেই গৃহাভিমুখে আসিতে লাগিলেন।

রামহরি বাবু বলিতে লাগিলেন, "আমার নিজবাড়ী, শ্রীরামপুরে। পরিবারের মধ্যে আমার স্ত্রী এবং একমাত্র কন্যা হেমলতা। হেমলতা আমার রূপেগুণে ধন্যা; যেমন পদ্মাসুন্দরী গুণেও তেমনি। বাঙ্গালা, ইংরাজী, হিন্দী এবং সামান্য সংস্কৃতে তাহার একরূপ দখল জন্মিয়াছে।

নানাবিধ সূচীকর্ম্ম, পশমের কাজ, রন্ধনকার্য্যে সে উত্তমরূপ পারদর্শী। সঙ্গীত এবং পিয়ানো বাজাইতে শিখিয়াছে। পিতা বলিয়া অহঙ্কার করিতেছি না, আমার হেমলতার ন্যায় সুরূপা, সুগুণা কন্যা অতি বিরল—ইংরাজেরা যাহাকে Accomplished বলে, আমার হেমলতা তাহাই।”

—যুবক নিঃশব্দে রামহরি বাবুর কথা শুনিতে লাগিলেন।

রামহরিবাবুর কথা চলিতে লাগিল, “হেমলতা আমার সবে পনের বৎসরমাত্র অতিক্রম করিয়াছে। এখনও বিবাহ দিই নাই, যোগ্য পাত্র পাইতেছি না। আমার যত টাকা ব্যয় হউক, করিতে সম্মত আছি; তাহার মনের মত বর পাইলেই বিবাহ দিব।”

—এই বলিয়া রামহরি বাবু একদৃষ্টে যুবকের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তখন তাঁহার মনে কত আশাই উঠিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, “এতদিনে বুঝি বিধাতা হেমলতার যোগ্যপাত্র মিলাইয়া দিলেন; যাহার সুখের জন্য আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ব্যয় করিতেও কাতর নহি, বুঝি এতদিনে আমার সেই হেমলতা সুখী হইল। কিন্তু ইনি কি এখনও অবিবাহিত? যে দেশে বাল্যবিবাহ চলিত, সে দেশে কি এত দিন অবধি লোক অবিবাহিত থাকিতে পারে? হায়, বাল্যবিবাহে আমাদের দেশ ছারখার হইয়া যাইতেছে, কত কুফল ফলিতেছে, তাহা ত কেহই চাহিয়া দেখিতেছে না; তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাও করিতেছে না। বিধাতা, কি হেমলতার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন!”

রামহরিবাবুর মত স্বতন্ত্র। তিনি বাল্যবিবাহকে মনের সহিত ঘৃণা করিতেন। বলিতেন, “আমাদের দেশে এমন সময়ে বিবাহ হয়, যে সময়ে কন্যা বালিকা মাত্র; বিবাহ বুঝি কি একটা সুন্দর জিনিস, করিতে হয়, তাই করা। সকলে আমোদ করিতেছে, তাই তাহার ও আহ্লাদ; সে তখন হয় ত তাহার ভবিষ্যতের সুখাসুখ কিছুই বুঝিতে পারে না; ক্রমে যখন তাহার শরীরে যৌবনের আবির্ভাব হইতে থাকে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পূর্ণতা হয়, তখন সে স্বামী স্ত্রীর কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারে; আপনার সহিত স্বামীর পার্থক্য বুঝিতে সক্ষম হয়। হয় ত, মহা অসুখী

হইয়া পড়ে; কারণ সে অনুপমা সুন্দরী, তাহার স্বামী অত্যন্ত কদাকার; সে সর্ব্বগুণভূষিতা, তাহার স্বামী নির্গুণ; সে শান্তিপ্রিয়, তাহার স্বামী উগ্র-স্বভাব। এইরূপ পার্থক্য যখন সে দেখিতে পায়, তখন মনে করে, সে চিরকালের জন্যই অসুখী হইল; চিরজীবন তাহাকে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া কাটাইতে হইবে। এদেশ নাকি সতীত্বের জন্য বিখ্যাত; এদেশের স্ত্রীলোকদের নাকি অসাধারণ সহ্যগুণ আছে, তাহারা নাকি আত্মসুখ ত্যাগ করিতে জানে, তাই তাহারা মনের কষ্ট মনে রাখিয়া স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য যত্ন পায়। কিন্তু যদি তাহাদিগকে উপযুক্ত বয়সে মনোমত স্বামী নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে এদেশ আরও সুখের আকর হইবে, সতীত্বের গৌরবে আর ও গৌরবান্বিত হইবে। তাহাদের সন্তানেরা সবল, সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইবে; কেমনা, অনুপযুক্ত বয়সে যে সকল সন্তান হয়, তাহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় না।”—তাঁহার মতে পুরুষের চব্বিশের ন্যূনে এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করা কোন মতে উচিত নহে।

—সেইজন্য তিনি মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, উপযুক্ত বয়সে হেমলতা তাহার মনোমত স্বামী পছন্দ করিয়া চিরকালের জন্য সুখী হইবে।—হেমলতা সেইজন্যই এত দিন অবধি অবিবাহিতা।

রামহরি বাবুর কথায় শৌরীন্দ্রমোহন আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; বাঙ্গালীর মেয়ে, ষোল বৎসর বয়স অতিক্রম করিতে চলিল, এখনও বিবাহ হয় নাই; আশ্চর্য্য হইবারই ত কথা! বলিলেন, “আপনার কন্যা উপযুক্ত বয়স অতিক্রম করিয়াছেন, এখন অতি শীঘ্রই বিবাহ দেওয়া উচিত।”

“কি জানেন, শৌরীন্দ্র বাবু”, রামহরি বাবু বলিতে লাগিলেন, “বাল্য-বিবাহে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এক ত কন্যার কোন মত না লইয়া, আমরা যেমন ইচ্ছা তেমন একজনের সহিত তাহার বিবাহ দিই। কথাটা সামান্য নহে, যে তাহার চিরসহচর হইবে, যাহার সহিত সমস্ত জীবনের সম্পর্ক, সেই যদি তাহার মনের মত না হইল, তবেই তাহাকে অসুখী করা হইল! আর এক কথা যে,

স্ত্রী কি পুরুষের, অপূর্ণাবস্থায় যে সন্তান হয়, সে সন্তানের সম্যক পুষ্টি-সাধন হয় না। সে চিররুগ্ন, দুর্ব্বল এবং অল্পজীবী হয়। সেইজন্যই না আমাদের বাঙ্গালীজাতির এত দুর্দ্দশা। কই, আপনি তিনকোটী বাঙ্গালীর মধ্যে কয়জন সুস্থকায় সবলশরীর দেখাইতে পারেন। আমি হেমলতাকে চিরজীবন সুখী করিতে চাহি—তাহার ভবিষ্যৎ বংশের শারীরিক উন্নতিবিধান করিতে চাহি।”

“কিন্তু আর ত অমনোযোগী হওয়া উচিত নহে। যখন আপনি বলিতেছেন, সে ষোড়শ বর্ষে পড়িয়াছে, তখন আর তাহাকে অবিবাহিতা রাখা উচিত নহে। আপনি জানেন, যেমন বাল্যবিবাহে অনিষ্ট হয়, তেমনই অনেক বয়স অবধি অবিবাহিত থাকিলে, শরীরে নানারূপ ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে।”—যুবক উত্তর দিলেন।

“তা আমি বেশ বুঝি। আমি, হেমলতার বিবাহের জন্য নিয়ত উদ্বিগ্ন আছি; তাহার উপযুক্ত পাত্রের জন্য অনেক অনুসন্ধান করিতেছি—অনেকও পাইয়াছি, কিন্তু একটী ও আমার মনোমত হয় নাই।”

“আপনি হেমলতার যেপ্রকার রূপ ও গুণের কথা কহিলেন, তাহাতে ত শ্রীরামপুরেই তাহার উপযুক্ত পাত্র মিলা দুর্ঘট। এখানে এরূপ নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া কিরূপে যোগ্যপাত্রের অনুসন্ধান লইবেন, বুঝিতে পারি না।”

“এখানে বাস করা আমার ইচ্ছা নহে। কিন্তু কি করিব, আমার স্ত্রীর বড় কঠিন পীড়া হইয়াছিল, হেমলতার ও শরীর ভাল নহে, কাজেই অগত্যা বাটী ছাড়িয়া এখানে থাকিতে হইয়াছে। ডাক্তারে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই এখানে থাকা। রাজমহল স্থানটী অতি রমণীয়, জল হাওয়া ও ভাল। এখানে থাকিয়া আমার স্ত্রী ও কন্যা অনেক সুস্থ হইয়াছে। আর যে আপনি হেমলতার উপযুক্ত পাত্রের কথা বলিলেন, যদি বিধাতা করেন, এই খানে বসিয়াই মিলাইয়া দিবেন।”—এই বলিয়া রামহরি বাবু যেন মনোভাব বুঝিবার জন্য যুবকের মুখপানে চাহিলেন। কিন্তু সে মুখে কোন বিকার-চিহ্ন

দেখিতে পাইলেন না। হৃদয়ের যে কোন চাঞ্চল্য জন্মিয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন।

পথে আর ও বিষয়ের কোন কথা হইল না।

ত্রয়োত্রিংশ স্তবক।

হেমলতা।

যথাসময়ে তাঁহারা গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামহরিবাবুর বন্দোবস্ত দেখিয়া, শৌরীন্দ্রমোহন বড় সন্তুষ্ট হইলেন। বেশ সুন্দর বাড়ী; চারিধারে বেশ সুন্দর বাগান, তাহাতে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ। বাড়ীটীর চারিধারে কাষ্ঠের রেইল; তাহার পার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট মেথি গাছের ঝাড়, তাহার উপর নানাবিধ সুন্দর সুন্দর লতা উঠিয়াছে—তাহাদের প্রতি ক্ষুদ্র শাখায় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে; নানা বর্ণের ফুল, তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়াছে; বড় সুন্দর শোভা।

বসিবার ঘরটীর চারিধারে চাহিয়া দেখিলেন, ঘরটী বড় মনোহর সজ্জায় শোভিত। তাহার মেঝেয় সুন্দর কার্পেট, দেয়ালের গায়ে সুন্দর সুন্দর ছবি—তাহাতে কত বড়লোকের চেহারা, কত নদী, পর্ব্বত, গ্রামের দৃশ্য, যুদ্ধক্ষেত্রের সুন্দর বর্ণনা লেখা রহিয়াছে। ঘরের দুইপার্শ্বে ভিত্তির উপর উচ্চে ব্রাকেটে সুন্দর সুন্দর ঘড়ী টক্ টক্ শব্দে চলিতেছে, আর প্রতিমুহূর্ত্তে মানব-জীবনের একাংশ চলিয়া যাইতেছে, তাহাই সকলকে জানাইয়া দিতেছে। কিন্তু মনুষ্যের এমনই ভ্রম যে উহাতেও সতর্ক হয় না; কেবল গৃহসজ্জা এবং সময় নিরূপক যন্ত্র ভাবিয়াই আনন্দ পায়। দেয়ালের গায়ে নীল রং মাখান; তার উপর সবুজ রঙের লতা পাতা আঁকা—তার মধ্যে মধ্যে গোলাপ ফুলের নক্সা কাটা। দেয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে দেয়ালগিরি। কার্পেটের উপর

দুই পার্শ্বে দুইখানি সোফা। একটী সবুজ বনাতে মোড়া বৃহৎ টেবিলের চারিপার্শ্বে দশ বার খানি গদী মোড়া কেদারা।—ঘরটী ঠিক্ ইংরাজী ধরণে সজ্জিত। দেখিয়া শৌরীন্দ্রমোহন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, বাড়ীর অধিকারী একজন অতুল সম্পত্তিশালী ব্যক্তি—নহিলে অল্পদিন বাসের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতে পারিত না।

দুইজনে সেই গৃহে উপবেশন করিলে রামহরি বাবু বলিলেন, "মহাশয়ের আগমনে কৃতার্থ হইলাম। আমার বড় ভাগ্য যে, আপনার ন্যায় একজন মহৎ লোক অনুগ্রহ প্রকাশে এখানে আসিয়াছেন; তাহাতে চিরবাধ্য রহিলাম। সেই বেহারী বাবুটী যথার্থই বলিয়াছেন, আপনি যেমন সুরূপ, তেমনই গুণসম্পন্ন। ভগবান্ আপনাকে অনেক গুণে ভূষিত করিয়াছেন; ধন, মান্য, যশ, অমায়িকতা সকলই আপনি লাভ করিয়াছেন। আপনার ন্যায় অতুল সম্পত্তি স্বত্বেও বিনীত লোক আমি কখন দেখি নাই।"

"মহাশয়, আমার যে সকল গুণ নাই, সে সকলের উল্লেখ করিয়া কেন আমাকে লজ্জা দেন। বিধাতা কিছু অর্থ আমাকে দিয়াছেন বটে, কিন্তু আমি অনেক কারণে অসুখী—আমার ন্যায় মন্দভাগ্য লোক ইহ-জগতে অতি বিরল।"

"অসুখী কেন?—ধন সম্পদ, মান্য, কোন বিষয়েরই আপনার অভাব দেখিতেছি না"—এই কথা বলিয়া কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রামহরি বাবু আবার বলিতে লাগিলেন, "আর বোধ হয়, বিধাতা আপনাকে মনোমত স্ত্রীরত্ন প্রদানেও কুণ্ঠিত হন নাই।"—তখন আশা ও নিরাশা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল।

"সে কথা আর কহিবেন না। সে কথা মনে হইলে বড় কষ্ট হয়, হৃদয় ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হয়। আমি মনোমত স্ত্রী পাইয়াছিলাম; বিধাতা, আমাকে এক সরল-প্রকৃতি স্বভাবসুন্দরীর সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার মন্দভাগ্য, আমি সে ধনে বঞ্চিত হইয়াছি।"—এই বলিয়া জলভারাক্রান্ত লোচনে শৌরীন্দ্রমোহন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"অদৃষ্ট লিপি কে খণ্ডাইতে পারে! যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। সে সকল বিষয় আর ভাবিবেন না। সর্ব্বগ্রাসী কালের গ্রাস হইতে কে কাহাকে নিস্তার করিতে পারে!"

"না মহাশয়, তাহা হইলে ত মনকে প্রবোধ দিতে পরিতাম। তাহা হইলে ত সুখী হইতে চেষ্টা করিতাম। আপনি, কিছুই শুনেন নাই, তাহা হইলে জানিতেন যে, আমার কত মনঃকষ্ট; আমি কত দুঃখী এবং কি যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি,"—এই বলিয়া শৌরীন্দ্রমোহন সরলার সহিত সাক্ষাৎ অবধি বিচ্ছেদ পর্য্যন্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন; বলিবার সময় রামহরি বাবু যুবককে অশ্রুপাত করিতে দেখিয়াছিলেন।

রামহরিবাবু বুঝিলেন, যে, শোক বড় গুরুতর হইয়াছে; কিন্তু চিরস্থায়ী হইবে না। কেন না, পৃথিবীতে কোন শোকই চিরকাল থাকে না। যাহাকে পাইবার কোন আশা নাই, তাহাকে ভাবিয়া বোধ হয় আর বহুকাল মনঃকষ্ট ভোগ করিবেন না। সে হতভাগিনী, তাই এমন স্বামীধনে বঞ্চিত হইয়াছে। হেমলতার এমন সৌভাগ্য কি হইবে যে, ইনি তাহাকে বিবাহ করিবেন!

রামহরি বাবু বুঝিতে পারেন নাই যে, যথার্থ প্রণয় কি পদার্থ। তাহা যে ইহ জনমে একবার বই আর হয় না, ইহা তাঁহার ধারণা ছিল না। শৌরীন্দ্রমোহনের প্রাণের সহিত সরলার প্রাণ যে এক সূত্রে গ্রন্থিত হইয়াছিল,—উভয়ের জীবন থাকিতে সে সূত্র যে ছিন্ন হইবার নহে, তাহাদের দীর্ঘবিরহে ও সে বন্ধন যে উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইতেছে, ইহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি মনে আশা করিয়া ছিলেন যে, হেমলতাকে একবার দেখিলে শৌরীন্দ্রমোহন সে রূপে মোহিত হইবেই হইবে; সরলার বিষয় যুবক একেবারে ভুলিয়া যাইবেন!

রামহরি বাবু ডাকিলেন, "হেমলতা, হেমলতা।"

হেমলতা ভিতরে সূচীকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিল; পিতা ডাকিবামাত্রই সে শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরে আসিল। সে পিতার বড় আজ্ঞাবহ ছিল, পিতাকে বড় ভাল বাসিত। পিতার অস্পষ্ট স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশমাত্রই সে বাহিরে দৌড়াইয়া আসিল।

সেই আলুলায়িত কুন্তলা হেমলতা মৃদু সমীরণে অবেণীবদ্ধ অলকদাম দোলাইতে দোলাইতে যখন আসিল, গৃহে রূপের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। হেমলতা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "বাবা, আপনি আমাকে ডাকিতেছেন ?"—এই বলিয়া সে সেই সুবৃহৎনীলোৎপলতুল্য চক্ষে চারিধারে মোহন চাহনী চাহিবামাত্রই যুবককে দেখিতে পাইল। তখনি যেন আপনার অনিচ্ছায় যুবকের পানে চাহিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল; যাইতে তাহার পা সরিল না। সে সেইভাবে থাকিয়া এক একবার বঙ্কিম দৃষ্টিতে যুবককে দেখিতে লাগিল। হায়, কিক্ষণে যুবতী যুবককে দেখিল! সেই রূপমাধুরী দেখিয়া যুবতীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল; সে আপনার অমূল্য যৌবননিধি না বুঝিয়া অপাত্রে সমর্পণ করিল। অভাগিনী ইচ্ছা করিয়া অপরের নিকট আপনার মনঃপ্রাণ বিকাইল; সুধা ভ্রমে বিষপান করিল।

যুবক দেখিলেন, হেমলতা ও সুন্দরী; ক্ষণপ্রভার মত সুন্দরী। সে রূপে তরঙ্গ খেলিতেছে, দেখিলে নয়ন ঝলসিয়া যায়। সে রূপ অগ্নিশিখাবৎ, অনেক মানবরূপ পতঙ্গ সহজেই তাহাতে মোহিত হইয়া পুড়িয়া মরে। হেমলতা সুন্দরী, কিন্তু সরলা তাহা অপেক্ষাও সুন্দরী। হেমলতার সৌন্দর্য্যে বিলাস-প্রিয়তা দেখা যায; তাহার হাব, ভাব, কটাক্ষ সকলেতেই যেন বিলাসের মাখামাখি আছে; সরলা স্বভাব-সুন্দরী, তাহার প্রত্যেক কার্য্যে সরলতার পরিচয় দিইত। হেমলতাকে দৃষ্টিমাত্রেই লোকে মোহিত হইয়া পড়ে, সরলার সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মিত।

রামহরি বাবু বলিলেন, "হেমলতা, লজ্জা কি!—মুখ তুলিয়া কথা কহিতেছ না কেন? —এখানে তোমার লজ্জা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

হেমলতা কোন কথা কহিল না। সে উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু কে যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। সে লজ্জায় নতমস্তকে ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে যাইল। যাইবার সময় বার বার বঙ্কিম চক্ষে যুবককে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল। যাইতে তাহার মন চাহে নাই, সে রূপ দেখিয়া তাহার তৃপ্তি জন্মে নাই, কিন্তু পিতৃ-সমক্ষে লজ্জায় সে আর দাঁড়াইতে পারিল না।

লোকে হয় ত বলিবে, এও কি কখন হয়; একবার মাত্র দেখিয়াই কি কেহ কখন অপরকে একেবারে দেহ প্রাণ সমর্পণ করে। কিন্তু এ কথাটী যিনি বলেন, তিনি ভ্রান্ত। এ জগতে সহসা একজনের প্রাণের উপর অপর একজন এমন প্রভুত্ব খাটাইতে পারে যে, সে তাহা[illegible] মোহিত হইয়া যায়। তাহার রুচি এবং ইচ্ছার ঠিক্ মনোনীত একজনকে দেখিবামাত্রই সে তাহাকে না ভাল বাসিয়া থাকিতে পারে না। যাহাকে লোকে 'মাহেন্দ্র ক্ষণে বা সুনজরে' দেখা বলে এও তাহাই জানিবে।

রামহরি বাবু মনে মনে বড় সন্তুষ্ট হইলেন। যুবককে হেমলতার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে তিনি দেখিয়াছিলেন, আর হেমলতার সে সলজ্জভাবও তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন যে, উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। কিন্তু যুবকের সে দৃষ্টিতে যে কিছুমাত্র অনুরাগের চিহ্ন ছিল না. তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সন্তুষ্ট চিত্তে স্থির করিলেন, হেমলতা এতদিনে যোগ্য স্বামীর সহিত মিলিত হইল। এ জগতে কাহার না ভ্রম ঘটিয়াছে!

চতুস্ত্রিংশ স্তবক।

আত্ম-বিসর্জ্জন।

"আমার অভিলাষ পূরিবে কি!—যে অমূল্য রত্ন দৈবক্রমে আমি দেখিতে পাইলাম, বিধাতা তাহা আমায় গলে পরিতে দিবেন কি!—আমার কি এমন দিন হইবে যে, উনি আমার ন্যায় নির্গুণা কুরূপা রমণীকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না'—যুবককে দেখিয়া অবধি একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া হেমলতা আপনার মনে এই কথা নিয়তই আন্দোলন করিত। একটী পর্য্যঙ্কের উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নতমুখে হেমলতা সর্ব্বদাই এই বিষয় চিন্তা করিত।

না, হেমলতা, ও চিন্তা করিও না; ও কথাটীকে মনে স্থান দিও না। এই

বেলা তোমার সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেও, নহিলে পরে বিষময় ফল ফলিবে। যুবক সরলা বই আর কাহাকেও জানে না; তুমি যদি মানবী না হইয়া স্বর্গের অপ্সরা হইতে, তাহা হইলেও শৌরীন্দ্র তোমাকে পাইতে অভিলাষ করিত না। কেন বৃথা মনাগুণে পুড়িয়া মরিবে, মনঃকষ্টে হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। তাই বলিতেছি, পূর্ব্ব হইতে সাবধান হও।

হেমলতার মন বুঝিত না। সে আবার চিন্তা করিতে বসিত। সে মনে করিত, সে আমায় ভাল বাসুক বা না বাসুক, আমি ত তাহাকে ভাল বাসিব। সে যদি আমায় ভাল না বাসিয়া সুখী হয়, তাহার ভালবাসিয়া কাজ নাই। সে আমার সুখে থাকুক, তাহা হইলেই আমার সুখ। আমি তাহাকে একদণ্ডও অসুখী দেখিতে পারি না। এরূপ নিঃস্বার্থ ভালবাসা ত কখন দেখি নাই।

হেমলতার মাতা তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কন্যা শৌরীন্দ্রমোহনকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছে। যখনই শৌরীন্দ্রের বিষয়ে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে কোন কথা কহিতেন, অমনি সে অন্তরাল হইতে উৎকর্ণ হইয়া শুনিত। সতর্কতার সহিত শুনিত; যখনই ভাবিত যে, তাহার পিতা কিম্বা মাতা তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন, অমনি সেখান হইতে সরিয়া যাইত; কিন্তু মন বুঝিত না, আবার আসিয়া দাঁড়াইত। যখনই সুবিধা পাইত, তখনই খড়খড়ির পাখ্‌ড়ি তুলিয়া বা দরজার ফাঁক দিয়া যুবককে দেখিত; আবার যুবক তাহাকে দেখিতে পাইয়াছেন, মনে পড়িলেই আরক্ত গণ্ডে সলজ্জভাবে দূরে পলাইয়া যাইত। যুবকের কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিলেই সে চমকিত হইয়া চারিধার চাহিত; যেন সে কোন প্রিয়বস্তু হারাইয়াছিল, এখন কোথায় আছে জানিতে পারিয়া ব্যগ্রভাবে খুঁজিতেছে। এসকল দেখিয়া হেমলতার মাতা যে তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি!

তারাসুন্দরী এ বিষয় স্বামীকে জানাইলেন। বলিলেন, 'হেমলতা যেন উদাসের মত হইয়াছে। সে দিন দিন কৃশ হইয়া যাইতেছে, মনের উৎকণ্ঠায় সে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে।'

রামহরি বাবু পূর্ব্বেই হেমলতার মনের কতকটা আভাস পাইয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন যে, 'শৌরীন্দ্রমোহনের সহিত হেমলতার যতদিন না বিবাহ হইবে, ততদিন হেমলতার এভাব ঘুচিবে না। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহন ইহাতে সম্মত হইবে কি!—প্রথম দিনে যখন সে হেমলতাকে দেখে, তখন আমার মনে কত আশাই হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল যেরূপ মনের ভাব দেখিতে পাই, তাহাতে ত কোন আশাভরসা হয় না। হায়, কেন আমি ইহাকে আনিয়াছিলাম; আনিলাম ত হেমলতাকে দেখাইলাম কেন?—কেন আমি স্বইচ্ছায় হেমলতার সুখের পথে কণ্টক হইলাম।'

রামহরিবাবু অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, "শেষ আশা ছাড়িব না। শৌরীন্দ্রমোহনকে একেবারে স্পষ্টই আমার অভিলাষ খুলিয়া বলিব। বুঝাইয়া বলিব যে, গত বিষয়ের অনুশোচনা বৃথা। দেখি যদি মন লওয়াইতে পারি, নহিলে আর ত কোন উপায় দেখিতেছি না।"

সেইদিনই রামহরি বাবু কথায় কথায় যুবককে বলিলেন, "তোমাকে সর্ব্বদাই সরলার কথা উল্লেখ করিয়া বিমর্ষ হইতে দেখিতে পাই। সরলার জন্য তুমি নিয়ত অসুখী। তোমার ন্যায় পতি, সকল স্ত্রীলোকেরই প্রার্থনীয়। দেখ, সরলার জন্য তুমি যথেষ্ট করিয়াছ; পত্নীর প্রতি স্বামীর কিরূপ অনুরাগ থাকা উচিত, তাহার প্রমাণ তুমি যথেষ্ট দিয়াছ। কিন্তু নিষ্ফল যন্ত্রণায় কোন ফল নাই। সরলাকে পুনরায় পাইবার আশা ও অতি কম। এই পৃথিবী মধ্যে সে কোথায় আছে; বাঁচিয়া আছে, কি মরিয়াছে, তাহার ঠিক্ নাই। সরলা তোমাকে যেরূপ ভালবাসিত, সেরূপ ভালবাসা হয়ত অন্য কোন স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে পার।—তাহাকে ভালবাসিয়া আবার সুখী হইতে পার। সংসারের নিয়মই এইরূপ।"

রামহরি বাবু যুবককে আজ কাল আর আপনি বলিয়া ডাকিতেন না। তিনি তাঁহা অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ; বিশেষতঃ শৌরীন্দ্রকে জামাতারূপে পাইবার আশা, তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। পূর্ব্বে নবপরিচিত বলিয়া সেরূপ মান্যভাবে কথা কহিতেন।

"মহাশয়, আপনি আমার মাননীয় ব্যক্তি, বয়সে বড়; আপনাকে আর

অধিক কি বলিব। সরলা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; তাহার বিরহ আমি চিরকাল সহ্য করিতে পারি, তাহার জন্য কায়িক ও মানসিক সকলরূপ যাতনা সহ্য করিতে পারি; কিন্তু অপরকে পত্নী সম্ভাষণ কোনমতে করিতে পারিব না। সে যদি অপ্সরাতুল্যা হয়, সরলা অপেক্ষা সহস্রগুণে সুন্দরী হয়, তথাপি সে আমার প্রার্থনীয়া নহে। সরলা ভিন্ন আমি কাহাকে জানি না, আর জানিবও না। যথার্থ প্রণয় জীবনে একবারমাত্র হইয়া থাকে, সরলার সহিত আমার সেই প্রণয়ই হইয়াছে।"

"ভাল, অপর কেহ যদি তোমাকে সরলার ন্যায় নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসে; আর সেও যদি সরলার ন্যায় তোমাকে দেখিতে পাইবামাত্রই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে তাহাকে বিবাহ করা তোমার উচিত কি না!---সেস্থলে তাহার হৃদয়, নৈরাশ্যের দারুণ যন্ত্রণায় পীড়িত করা কি উচিত!"—রামহরি বাবু এই কথা বলিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন।

যুবক রামহরি বাবুর কথার ভাবে সকলই বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিলেন যে, হেমলতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন; মনে মনে হেমলতার জন্য দুঃখিত হইয়া ক্ষিপ্রস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সেরূপ রমণী যদি কেহ থাকে, তাহা হইলে অন্তরের সহিত আমি তাহার জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি করিব বলুন, যাহা আমার নহে, তাহা আমি কিরূপে অপরকে দিতে পারি। যে প্রাণ আমি সরলাকে দিয়াছি, তাহাতে আমার অধিকার কি!—যদি সে প্রাণে আমার অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আমি প্রফুল্লচিত্তে তাহাকে দিতাম।"

—রামহরি বাবু নিরাশ হইলেন। বিষাদরেখা আসিয়া তাঁহার মুখে দেখা দিল। হেমলতার ভাবী অসুখ ভাবিয়া তিনি ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি মনের ভাব গোপন করিতে অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। তাঁহার মুখ হইতে আর বাক্য সরিল না; নির্ব্বাক হইয়া সেইখানে বসিয়া রহিলেন।

এমন সময় একটী মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ উভয়ে শুনিতে পাইলেন—হেমলতা ইতিপূর্ব্বে ঘরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিতেছিল, যুবকের

শেষ কথা শুনিবামাত্রই হতাশ ও উন্মত্তার মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আলু থালু বেশে উন্মাদিনীর মত দৌড়িয়া আসিয়া সেই ঘরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। রামহরি বাবু কন্যার এঅবস্থা চক্ষে দেখিতে অসহ্য বোধ করিলেন। তিনি কাতর হৃদয়ে অশ্রু-প্লাবিত নেত্রে বাহিরে আসিলেন।

হেমলতার সে অবস্থায় যুবক বড় মর্ম্মাহত হইলেন; তিনি সত্বরে আসিয়া তাহার চেতনা সম্পাদনের জন্য, ব্যজন করিতে লাগিলেন। এ পৃথিবীতে এমন পাষণ্ড কে আছে যে, হেমলতার এ অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ না করে!

ক্রমে হেমলতার চৈতন্য হইল। তখন সে বলিতে লাগিল, "আমি তোমার যোগ্যা নহি তা আমি জানিতাম; কিন্তু জানিয়া ও কেন তোমাকে দেখিবামাত্রই স্বইচ্ছায় তোমার পদে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলাম। যদি না করিতাম, তাহা হইলে কি আজ আমার এদশা হইত! না, স্বইচ্ছায় কেনই বা বলি, যে মুহূর্ত্তে তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেই মুহূর্ত্তেই কে যেন আমার কাণে কাণে বলিয়াছিল, 'উনি তোমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দেবতা, উনি তোমার প্রভু; উহাঁর চরণে তোমার জীবন যৌবন সমস্ত অর্পণ কর, তাহা হইলে সুখী হইবে।'—কিন্তু আমি সে আশায় বঞ্চিত হইলাম,—তুমি আমায় পায়ে ঠেলিলে। কেন, আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম। যদি দেখিয়াছিলাম, তবে কেন তোমাকে আমার হৃদয়ের প্রভু করিয়া চিরজীবনের জন্য অসুখী হইলাম"—এই বলিয়া হেমলতা অধৈর্য্যা হইয়া যুবকের গলে ধরিয়া উন্মত্তার মত কাঁদিতে লাগিল।

যুবক এরূপ নিঃস্বার্থ ভাল বাসা কখন দেখেন নাই: এক সরলার দেখিয়াছিলেন, আর এই দেখিলেন। হেমলতার অবস্থায় এবং বিলাপ-বাক্যে তাঁহার মনে দারুণ ব্যথা লাগিল। তিনি কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "না, হেমলতা, না। আমাকে ওরূপ নির্দ্দয় ভাবিও না। আমার প্রাণ যদি আমার থাকিত, আমার হৃদয় যদি আমার হইত, তাহা হইলে আমি স্বইচ্ছায় তোমাকে সকলই দিতাম। কিন্তু কি করিব, সে যে হইবার নহে। আজ হইতে আমি তোমাকে ভগিনীর মত দেখিব, ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিব।"

সহসা হেমলতার সে চক্ষের জল শুখাইয়া গেল; উন্মত্তাবস্থা ঘুচিয়া গেল—সে তড়িৎবেগে যুবকের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "ও কথা বলিও না; আমাকে বঞ্চিত করিও না। তোমাকে ভাল বাসিয়া আমার যন্ত্রণার সীমা রহিল না, কিন্তু মিনতি করিতেছি, অতদূর নিষ্ঠুর হইও না। তোমাকে ভালবাসাই আমার সুখ। তুমি পুজ্জালও, বা নালও, তোমাকে অর্চ্চনা করাই আমার সুখ! আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করিও না। আমি তোমাকে প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা করিয়া রাখিয়াছি, মিনতি করি সে আসন শূন্য করিও না। তুমি সুখে থাক, তোমার নিকট আমার অন্য ভিক্ষা নাই।"—এই বলিয়া সে যেন বিবশা ও আত্মহারা হইয়া দ্রুতগতি যুবককে আলিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল, "আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব! নয়নতারা! জীবন মরণের কারণ! তুমি আমায় কি দোষে পায়ে ঠেলিতেছ! কি দোষ দেখিয়া এ অধিনীরে সকল সুখে বঞ্চিত করিতেছ।"

পরে উন্মত্তের মত এক ভীতিসঞ্চারক হাসি হাসিতে হাসিতে সবেগে গৃহের বাহিরে যাইল।

রামহরি বাবুর বাড়ী হাহাকারে পরিপূরিত হইল। হেমলতা কি আপনার মনে বকে, কাঁদে, হাসে, কিছুরই স্থিরতা নাই। হেমলতা পাগল হইয়াছে। রামহরি বাবু দৈবাধীনে পড়িয়া, আপনার সংসার বিষময় করিয়া তুলিলেন।

পঞ্চত্রিংশ স্তবক।

হালদার পো।

রামহরি বাবুর মনে দারুণ কষ্ট। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস তাঁহার গভীর মনঃক্লেশের পরিচয় দিতেছে। তাঁহার কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। নীরবে বাহিরে ম্রিয়মাণ হইয়া পাদচালন করিতেছিলেন। হেমলতা বাহিরে যাইবার কিছু পরেই তিনি নিঃশব্দে আসিয়া সেই গৃহে বসিলেন।

যুবকের মনে বড় কষ্ট হইতেছিল, বিশেষতঃ লজ্জায় তিনি কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

—এমন সময়ে একজন অপর লোক আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল।

যে আসিল, সে দেখিতে অতি কদাকার—অতি ঘৃণ্য আকৃতি। বর্ণ ভয়ানক কালো, চিবুকের অগ্রভাগ অসম্ভব লম্বা। নাসিকাগ্র ধনুকাকার, তাহার রন্ধ্রদ্বয় অত্যন্ত মোটা। চক্ষু কোটর-গত, বহুদূরপ্রবিষ্ট; ভিতর ঘোলাটে, চাহিতে দেখিলে ভয় হয়। মস্তক অসম্ভব বৃহৎ, তাহাতে আবার কেশশূন্য। মুখে শ্মশ্রু কিম্বা গুম্ফের চিহ্নমাত্রও নাই; হস্তপদ অসম্ভব দীর্ঘকার। বলিতে কি, তাহার মূর্ত্তি এরূপ জঘন্য যে, দেখিলেই সকল প্রকার ঘৃণ্যরিপুর আকর বলিয়া বোধ হয়। বয়স অনুমান করিবার উপায় নাই—কেহ কেহ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বলে, কেহ বা পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বলিয়া থাকে।

সে আসিয়াই একবার তীব্র দৃষ্টিতে যুবকের প্রতি চাহিল। পরে হা-হা-হা করিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "তবে রামহরি বাবু, সব ভাল ত।"

—রামহরি বাবু কোন উত্তর দিলেন না।

কটাক্ষে একবার চারিধারে চাহিয়া লইয়া, সে রামহরি বাবুর প্রতি কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ লোচনে চাহিয়া রহিল; দেখিল, রামহরি বাবুর মুখ অতি বিষণ্ণ, তাঁহার চক্ষু জলভারাক্রান্ত। সে ভাবিল যে, তাঁহার কোন বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। সে মনে মনে বড় আহ্লাদিত হইল, কারণ সে পরের বিপদে বড় আমোদ পাইত। কিন্তু আহ্লাদের হাসি চাপিয়া রাখিয়া বলিল, "সেকি রামহরি বাবু, ব্যাপার কি!—অন্যবার আমার সঙ্গে কত হাসি তামাসা করেন, এবার এরূপ ভাব দেখ্‌ছি কেন?"

রামহরি বাবু চাহিয়া দেখিলেন। অতিকষ্টে বদনের সে ক্লিষ্ট ভাব কথঞ্চিৎ গোপন করিয়া ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তবে হালদার মহাশয়, আছেন ভাল? এবার বহুদিনের পর আসিয়াছেন।"

হালদার-পো এখন হাসিবার অবসর পাইল। সে আহ্লাদে হাসিয়া গড়িয়া পড়িল। বলিল, "ভাল, ভাল, তবুভাল যে, এত ক্ষণের পর আমায়

দেখ্‌তে পেলেন। আমি আপনাদের অনুগত, আশ্রিত ত আছিই; জানেন ত, নানা কাজের ঝঞ্ঝাট তাই আস্‌তে পারিনি।"

হালদার-পো যখন সেই মসীনিন্দিত বর্ণে বৃহৎ দন্ত বাহির করিয়া স্থূল ওষ্ঠে বিকট হাসি হাসিত, তখন তাহাকে বড় ভয়ঙ্কর দেখাইত। সে না যাইত এমন স্থান নাই। কলিকাতা, মুঙ্গের, পাটনা, ভাগলপুর, বর্দ্ধমান, রাজমহল, ঢাকা এরূপ গুটীকতক প্রধান প্রধান সহরে তাহার নিয়ত ভ্রমণ করা আবশ্যক ছিল। সে আপনার স্বার্থ ছাড়া কোথাও যাইত না। সকলকে বেশ মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, দশটাকা উপায় করিত, এবং তাহাই তাহার জীবিকা ছিল; কিন্তু তাহার জন্য সে, কাহারও নিকট কৃতজ্ঞ ছিল না; কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে তাহা সে জানিত না, এমন কি আপনার স্বার্থ থাকিলে সে উপকারীর অনিষ্ট করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না; তাহাদের বিপদে সে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ পাইত। ইহা ব্যতীত তাহার পরের কুৎসা করা বিলক্ষণ অভ্যাস ছিল; সে লোকের নামে ঘৃণাজনক গ্লানি করিতে বড় ভালবাসিত। যেমন দশ জনের নিকট সাহায্য পাইত, তেমনই রামহরি বাবুর নিকটেও সে প্রতিবারেই দশ কুড়ি টাকা করিয়া পাইত। তাহার গলায় পৈতের গোছা, সে সকলের নিকট আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিত; কিন্তু অনেকেই তাহার আকৃতি দেখিয়া সে কথা বিশ্বাস করিত না। তাহার নানা স্থানে নানা নাম; যেখানে সে আপনাকে যে নামে পরিচিত করিত, সেখানে সেই নামেই অভিহিত হইত।

রামহরি বাবুকে আর কোন কথা কহিতে না দেখিয়া হালদার-পো শৌরীন্দ্রমোহনের দিকে চাহিল। শৌরীন্দ্রমোহনকে সে পূর্ব্বেই রামহরি বাবুর জামাতা বলিয়া স্থির করিয়াছিল। এখন তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ভাবিয়া যুবকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তবে বাবাজী, ভাল ত? কবে আসা হয়েছে? বাড়ীর সব খবর ভাল?"

শৌরীন্দ্রমোহন বিস্মিতের মত তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

"হা-হা-হা, বাবাজী চিন্‌তে পারচ না—চিন্‌বে! চিন্‌বে! যখন রামহরি বাবুর জামাই হয়েছ, তখন শীঘ্রই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়্‌বে।

হেমলতার আমি কাকা হই, বুঝ্‌লে কিনা?—হা-হা-হা।”—এই বলিয়া বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে সে ঘন ঘন উরুদেশে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। যদিও তাহার বয়সের কোন স্থিরতা ছিল না, তত্রাচ সে সকলের নিকট আপনাকে পঁচিশ বৎসর-বয়স্ক বলিয়া পরিচিত করিত।

“না মহাশয়, আমি উঁহার জামাতা নহি।”—শৌরীন্দ্রমোহন বিনীত ভাবে বলিলেন।

“না হও, হবে ত?—তা হ’লেই হল। তবে বাবাজী তোমার বাড়ী কোথা?”

“কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে শিয়ালদহ নামক স্থানে।”

“হুঁ, শিয়ালদহে—শিয়ালদহে ত হবেই! হুঁহুঁ, শিয়ালদহে না হ’য়ে যায় না। তোমার বাড়ী শিয়ালদহে হবে না ত কি একজন উনপাঁজুরে লক্ষীছাড়া হাড়হাবাতের বাড়ী শিয়ালদহে হবে।—কেমন কিনা?”—এই বলিয়া উচ্চরবে হাসিতে হাসিতে রামহরি বাবুর দিকে চাহিয়া হালদার-পো বলিতে লাগিল, “তবে রামহরি বাবু বেশ জামাই পেয়েচেন; রূপে গুণে কুলে শীলে সকল বিষয়েই ভাল—ধনও বিস্তর আছে।—আশীর্ব্বাদ করি ভগবান্‌ বাঁচিয়ে রাখুন,”—শেষ কথার উপর একটু জোর দিয়া আবার বলিতে লাগিল, “সে ত হ’লো, কিন্তু হেমলতার বিয়েতে আমি যেন ফাঁকি না পড়ি। গরীব ব্রাহ্মণ আমরা, এই ক’রেই আমাদের দিন গুজরাণ হয়; তোমাদের খাব আর আশীর্ব্বাদ ক’রব, এই আমাদের কাজ। বটে কি না?”

—হা-হা-হা শব্দে আকাশ ফাটাইয়া দুই হাতে পৈতা জড়াইয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে হালদার-পো মহা আহ্লাদে মেঝেয় গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

কিছু পরে হাসির বেগ একটুকু থামাইয়া স্থির হইয়া বসিল। পরে শৌরীন্দ্রমোহনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, “তবে বাবাজীর কি কাজকর্ম্ম করা হয়?”

শৌরীন্দ্রমোহন অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, “কিঞ্চিৎ পৈতৃক জমীদারী পাইয়াছি; তাহাতেই সংসার চলে।”

"জমীদারী!!"—স্মিতমুখে বৃহৎ দন্তগুলি বাহির করিয়া হালদার-পো বলিতে লাগিল, "আরে বল কি! জমীদারী!! তবে খুব বড়লোকের ছেলে ত তুমি? বাপ আছেন?"

"না, মহাশয়!"

"ভাই কিম্বা আর কেউ বিষয়ের সরীকান্ আছে?"

"না আমার আর কেহই নাই। আমি পিতার একমাত্র পুত্র।"

"বটে!—তা বিষয় আশয় দেখে কে? জমীদারীর তদারক বিলি ব্যবস্থা করে কে?"

"আমার একজন অভিভাবক আছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর অবধি তিনি বিষয় আশয়ের সকল ভার্ লইয়াছেন, আমাকে আর কিছুই দেখিতে হয় না।"

"হরিবোল হরি! তবেই হয়েছে। ও রকম বিশ্বাস সকলের উপর ক'রো না বাবাজী। কি জান, কাল বড় খারাপ পড়েছে। আজকাল নিতে, ঠকাতে পাল্লে আর কেউ ছাড়ে না; তাতে অত টাকার সম্পত্তি। তোমার আমার মত বিশ্বাসী লোক কজন পাওয়া যায়। আচ্ছা, জমীদারী থেকে কতটাকা আয় হয়?"

"ঠিক্ বলিতে পারি না—বোধ হয় মাসিক চারি পাঁচ হাজার টাকা হইবে।"

"চা-রি-পাঁ-চ-হা-জা-র!!" বলিতে বলিতে সে সেই ক্ষুদ্র নয়ন দুইটী যথাসাধ্য আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ইহাকে হাতে আন্‌তে পার্‌লে আর কোন ভাবনা থাক্‌বে না; এত দেখ্‌চি একটা বোকা গর্দ্দভ, একে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ কথা। অহং বাসুদেব, আমার অসাধ্য কর্ম্ম কি আছে। আর অত বড় বিষয়টা যদি ভোগে আসে মন্দ কি! এই বেলা আলাপটা ভাল ক'রে জাঁকিয়ে নেওয়া যাক্।"

—পরে সহসা ব্যগ্রভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "রামহরি বাবু, তবে এখন আসি।"

রামহরি বাবুর মন তখনও কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারে নাই;

কন্যার অমন অবস্থা দেখিয়া কোন্ পিতা শান্তি পাইতে পারেন! তথাপি হালদার-পোর উক্ত কথাগুলি শুনিয়া অতি ধীর ভগ্নস্বরে বলিলেন, "কেন? কোথায় যাইবেন?"

"না, এমন কোথাও না—এই বাবাজীর সঙ্গে একটুকু বেড়িয়ে আসি; বাবাজী ত এদেশ কখন দেখেন নাই, সব দেখিয়ে আনি,"—এই বলিয়া সে শৌরীন্দ্রমোহনকে উঠিবার জন্য সঙ্কেত করিল। যুবকের মন তখন কত চিন্তায় ব্যাকুল হইতেছিল; চারিধারের ঘটনাগুলি তাঁহার চিত্তকে অত্যন্ত বিমর্ষ করিতেছিল। তিনি মৌনভাবে হালদার-পোর সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিতে বাধ্য হইলেন। রামহরি বাবু আর কোন কথা কহিলেন না।

ষট্‌ত্রিংশ স্তবক।

সঙ্গী জুটিল।

বাটীর বাহির হইয়া হালদার-পো কিয়ৎক্ষণ উত্তরমুখে চলিল, পরে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর-স্তূপ সম্মুখে পাইয়া সেইখানে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। যুবক বলিলেন, "আর কতদূর যাইবেন; আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিবার অভিপ্রায় কি?"

"চুপ্ চুপ্, এখানে ত কেউ নেই," এই বলিয়া সন্দিগ্ধের মত চারিধারে চাহিতে চাহিতে হালদার-পো বলিতে লাগিল, "আরে এখনই সর্ব্বনাশ ক'রেছিলে আর কি!"

"কেন? কেন?—কি হইয়াছে?"—আগ্রহ সহকারে যুবক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"কি হয়েছে, তা কি আবার বল্‌তে হবে," অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে হালদার-পো বলিতে লাগিল, "সর্ব্বনাশ ক'রেছিলে আর কি! ভাগ্যিস

আমি ঠিক্ সময়ে এসে পড়্লুম, তা নইলে ত এখনই জাতকুল সব মজিয়েছিলে।”

যুবক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিছুক্ষণ হালদার-পোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, “জাতকুল মজান? সে আবার কি!”

“সে আবার কি!—হা-হা-হা! এ কথাটা আর বুঝতে পার্‌লে না। কি জান, তোমার আমার মতন সরল লোকে অত কারচুবী সহজে বুঝ্‌তে পারে না। কিন্তু সংসারে থাকৃতে গেলে রাঙ কি সোণা সকল ত চেনা উচিত।—রামহরি বাবুকে কেমন লোক ব’লে বোধ হয়?”

“রামহরি বাবু! কেন তিনি ত বেশ অমায়িক লোক।”

“বেশ লোক! তাই ত, তবেই তুমি ত খুব লোক চেন দেখ্‌চি। বাবু, জহুরী নইলে জহর চিন্‌তে পারে না। আমাদের নাকি হ’ল সকল রকম লোক নিয়েই কারবার, তাই আমরা লোক দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারি।”

“এ কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। রামহরি বাবু অত্যন্ত সৎচরিত্রের লোক, তাঁহার চরিত্রগত সামান্য দোষও আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।”

“হা-হা-হা, তবেই তুমি যত লোক চেন বুঝা গেল। তার একটা মস্ত মেয়ে আছে কি না, আর মেয়েটাও খুব সুন্দরী। চেহারা দেখিয়ে বুঝি ভুলিয়ে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। খবরদার বাবু খবরদার, ও লোভে পোড়োনা। রামহরি বাবুর কি আর জাত আছে!—তার নামে একটা বড় খারাপ কথা শুন্‌তে পাই, সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন,” এই বলিয়া যুবকের কাণের নিকট মুখ আনিয়া চারিধার দেখিতে দেখিতে হালদার-পো বলিল, “শুনেছি, হেমলতার মা না কি রামহরি বাবুর বিয়ে করা স্ত্রী নয়।—সেটা নাকি একটা কৃশ্চানের মেয়ে। সেই জন্যে লোকলজ্জায় এখানে পালিয়ে এসেছে। তোমাকে হাবাগোবা দেখে মেয়েটিকে গছাবার চেষ্টায় ছিল।—তা আর বুঝ্‌তে পার না। আর ও—”

যুবক শ্বাসরুদ্ধ হইয়া জড়প্রায় সকল কথা শুনিতেছিলেন। ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আর ও কি?”

“আর এই যে, দেশে থাক্‌লে একঘরে হ’য়ে থাক্‌তে হ’ত। আর

থাক্‌লেই বা ও মেয়েটাকে কে বিয়ে কর্‌ত। তা না হ'লে এ আর বুঝতে পারনা, অত বড় মেয়ে আমাদের ভদ্রলোকের ঘরে কোথায় আইবড় দেখেছ বল দেখি?"

যুবক বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা সম্পূর্ণ পরনিন্দুক। আগে তাহার চরিত্র কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। এখন তাহার কথা শুনিয়া ঘৃণিতভাবে বলিলেন, "ছি! ছি! পরের নামে ও প্রকার বৃথা অপবাদ দিবেন না; আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করিতে পারি না।"

একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হালদার-পো বলিতে লাগিল, "অপবাদ!—মিথ্যা বদ্‌নাম আমি কারুর নামে দিইনা। সেরূপ আমার স্বভাব নয়। রামহরি বাবুর ও অপবাদ সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু তা ব'লে আমি একথা তোমাকে দরকার না পড়্‌লে বল্‌তেম না। দেখ্‌লেম, তোমার ন্যায় একজন ভদ্রলোকের জাত কুল যায়, কাজেই সে কথা বল্‌তে হল। আর এ কথা কে না জানে?—শ্রীরামপুরে একথা টি টি হয়ে গেছে।"

"আপনার কথা সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, কিন্তু আপনার আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। রামহরি বাবুর কন্যাকে আমি ত বিবাহ করিব না।"

"আঃ বাঁচলেম, তোমার জন্য আমার বড় ভাবনা হয়েছিল। যা হোক্ বাবু, তুমিত আগে এসব কথা জান্‌তে না; তবে তুমি বিবাহ কর্‌তে নারাজ ছিলে কেন?

"মহাশয়, আমার বিবাহ হইয়াছে।"

"তাইত বলি। এমন কার্ত্তিকের মত ছেলে, বিষয়ের অভাব নেই, তোমার জন্য আবার মেয়ের ভাবনা। কত লোক কত টাকা, কত পরমাসুন্দরী মেয়ে নিয়ে সেধেছিল। তা এখানে আস্‌বার কারণটা কি?"

"কোন প্রয়োজনে।"

"প্রয়োজন! এখানে কিসের প্রয়োজন! আমাকে অবিশ্বাস করা তোমার কোন মতে উচিত হয় না। বাস্তবিক আমি তোমাকে দেখ্‌বামাত্রই ভালবেসেছি। ভায়ের মত ভালবাসি, আমাকে তোমার কোন কথা লুকান কি উচিত!"

"না মহাশয়, লুকাইবার আবশ্যক কি! যদি শুনিতে ইচ্ছা করেন, শুনিতে পারেন।"—এই বলিয়া যুবক আপনার জীবনের ঘটনাগুলি একে একে হালদার-পোর নিকট বিবৃত করিলেন।

সরলার অপহরণের কথা শুনিয়া হালদার-পো হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আরে পাগল না কি! এরই জন্য আবার ভাবনা। এমন বিপদ কত লোকের হ'য়ে থাকে। স্ত্রী কার না হারায়, কার না মরে; এই দেখনা, আমি এই অল্প বয়সেই পর পর ছটা বিয়ে করেচি।"

"না মহাশয়, সরলার সে মোহিনীমূর্ত্তি আমি একদণ্ডও ভুলিতে পারি না; সরলা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও চাহিনা।"

"বেশ বেশ, তাই হবে, সরলারই সন্ধান লওয়া যাবে। তার আর ভাবনা কি! জান বাবু, আমি পাটনায় থাকি, সেখানে অনেক বদ্‌মায়েস লোকের আড্ডা আছে, সেখানে সরলা থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে! তাকে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। যাহোক্ বাবু, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, সেখানে যেতে পার। এখানে আমি এসে থাকি, আপনার বিষয় কর্ম্মের জন্য। রামহরি বাবুর সঙ্গে আমার লেনা দেনার কর্ম্ম চলে। লোকটা টাকাকড়ির বিষয়েও বড় ভাল নয়। কেবল লোকের সঙ্গে খিট্ খিট্ করে। কখন এক পয়সা দানধ্যান নেই, কৃপণের শেষ। হাঁ, তবে আমুদে বটে।"—হালদার-পো ব্যস্তভাবে এই কথাগুলি বলিল।

যুবক ক্ষণেক কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কি চিন্তা করিলেন। পরে বলিলেন, "ভাল, তাহাই করা যাইবে। যখন সেখানে সরলাকে পাইবার আশা আছে বলিতেছ, তখন একবার অনুসন্ধান লইতেই হইবে। সেখানে যদি না পাওয়া যায়, সমস্ত জীবন সরলার অন্বেষণে কাটাইব। সরলাকে যতদিন না পাইব, ততদিন আর আমার কোন সুখের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু রামহরি বাবুকে আমাদের যাইবার অভিপ্রায় ত জানান উচিত!"

"রাম ও, কেন?—তুমি ওর ন শ পঞ্চাশ টাকা ধারনা যে, ওকে ভয় ক'রে ক'রে চল্‌বে। আচ্ছা, আজকে ওটা ওরকম জুজুর মত হ'য়ে বসেছিল, কেন বলদেখি। ভাল, ব্যাপারটা কি? ওর হয়েছে কি?"

যুবক নিঃশব্দে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

"বুঝেছি, বুঝেছি—আর বল্‌তে হবে না",—আহ্লাদের আবেগ থামাইতে না পারিয়া হালদার-পো বলিতে লাগিল, "মনে বড় আশা করেছিল যে, তোমার সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে—তা না হওয়ায় হতাশ হয়েছে। বেশ হয়েছে; ভগবান্ আছেন কিনা!"

যুবক বিমর্ষভাবে বলিলেন, "মহাশয়, পরের বিপদে ও রকম আমোদ করা অন্যায়। রামহরি বাবু যে রকমের লোকই হউন না কেন, তাঁহার বিপদে আহ্লাদ প্রকাশ করা কখনই উচিত নহে। বলিতে কি, যদি সরলার সহিত আমার বিবাহ না হইত, আমি হেমলতাকে বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।"

হালদার-পো দেখিল যে, আর বেশী বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে, তাহাতে তাহার স্বার্থনাশের আশঙ্কা আছে। তাহা হইলে ত আর অত টাকা ভোগ করা হইবে না। কাজেই ভয়ে ভয়ে একটু অগ্রাহ্যভাবে বলিল, "যাক্ যাক্, ও সব কথা যেতে দাও, এখন আমাদের যাওয়া ত স্থির হ'ল। তোমার আমার পুঁজীপাটা ত সঙ্গেই আছে, তবে আর দেরী করা উচিত নয়। দুর্গা, দুর্গা",—এই বলিয়া হালদার-পো পা বাড়াইল।

"দাঁড়ান মহাশয়, দাঁড়ান। রামহরি বাবুকে একথা একবার জানান উচিত। যখন তাঁহার আশ্রয়ে আমি ছিলাম, তখন তাঁহাকে না জানাইয়া যাওয়া ভাল দেখায় না"—শৌরীন্দ্রমোহন অতি ধীরভাবে এই কথাগুলি বলিলেন।

"তার কাছে যাওয়া আর ভাল দেখায় না। বল্‌তে গেলে তোমার সঙ্গে তার সঙ্গে এক রকম মনোভঙ্গ হয়েছে, সেখানে একদণ্ডও থাকা আর উচিত হয় না। তবে যদি একান্তই জানিয়ে যেতে চাও, একখানা চিঠি লিখে দাও, আমি একজন লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি",—এই বলিয়া হালদার-পো জামার জেব হইতে একটী ভাঙ্গা পেন্‌সিল ও একখণ্ড ময়লা কাগজ বাহির করিয়া যুবককে দিল। যুবক লিখিলেন,—

" মহাশয়,

আমি যদি আপনার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি যদি আমার সাধ্যাতীত না হইত, হেমলতাকে বিবাহ করিতাম। হেমলতার দুঃখে আমি সম্পূর্ণ দুঃখিত। তাহার অবস্থা স্মরণ হইলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি হেমলতাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ পতি প্রদানে সুখী করুন। আমি চলিলাম আর আপনাকে বৃথা কষ্ট দিতে চাহি না।

অনুগত

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন রায়।"

পত্র পড়িয়া হালদার-পো বলিল, "শৌরীন্দ্র বাবু, বেশ লেখা হয়েছে; এখন চিঠিখানা পাঠান আবশ্যক। তাইত, কাকে দিয়ে পাঠান যায়।"

এমন সময়ে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একজন কৃষক মাঠ হইতে বাড়ী যাইতেছিল। তাহাকে ধরিয়া হালদার-পো বলিল, "কি রে, একটা কাজ কর্‌তে পারিস্।"

কৃষক বলিল, "এজ্ঞে, কি বলেন।"

হালদার-পো বলিল, "রামহরি বাবুকে জানিস্ ত।"

কৃষক বলিল, "এজ্ঞে"

হালদার-পো বলিল, "তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্, আর এই তোর মেহনতের জন্য চারটে পয়সা দিচ্চি নে, দেখিস্ খবরদার খবরদার, দিতে ভুলিস নি।"

কৃষক হাত পাতিয়া পয়সা ও চিঠি লইয়া বলিল, "এজ্ঞে"—পরে আপন মনে পথ বাহিয়া চলিয়া গেল।

হালদার-পো বলিল, "বেটা পয়সা কটা না ফাঁকি দিলে হয়। কি জানি কালের স্বধর্ম্ম; আমাদের মত বিশ্বাসী লোক যদি আজকের কালে সবাই হ'ত তা হ'লে ভাবনা কি?"—মনে মনে ভাবিল, "আজ মনের মত সঙ্গী জুটিল।"

সপ্তত্রিংশ স্তবক।

বেশ পরিগ্রহ।

পাটনা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ বন জঙ্গল এবং অসভ্য লোকে পূর্ণ ছিল; যখন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ইউরোপের নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিত না, সে সময় হইতে পাটনা প্রসিদ্ধ। তখন ইহা পাটলিপুত্র নামে অভিহিত ছিল। অতি পূর্ব্বে লোকে ইহাকে কুসুমপুর নামে উল্লেখ করিত। রামায়ণ, মহাভারত আদি অতি প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এককালে মহারাজা নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য আদি লোকের ইহা ক্রীড়াভূমি ছিল। খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে এই নগর ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপে এতদূর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, ভুবনবিজয়ী আলেকজণ্ডার তখনকার বর্ত্তমান রাজা নন্দকে আপনার উপযুক্ত প্রতিযোগী বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। নানা দেশ হইতে কতলোক বাণিজ্য বা আপনার জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য এখানে আসিত। তখন এই নগরে কত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা শোভা পাইত; ইহার রাজপথ নিয়ত কত জনতায় পূর্ণ থাকিত।

ক্রমে যখন বেহার মুসলমান রাজাদিগের দ্বারা অধিকৃত হইল, তখনও ইহা পরিত্যক্ত হয় নাই। ইহার সৌন্দর্য্য বা সমৃদ্ধি পূর্ব্বের মত থাকুক বা না থাকুক, তাহার বড় অধিক হ্রাস হয় নাই। ইহার চারিধারে মুসলমান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রাচীর এবং দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এক্ষণে ইংরাজ-রাজত্বকালেও সে সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ইহার উত্তরপার্শ্বে স্রোতস্বতী গঙ্গা সেই পূর্ব্বের মত তাহার প্রশস্ত বক্ষে অসংখ্য পোত ও জনস্রোত ধরিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে নাচাইতে নাচাইতে চলিয়াছে। এখনও কত সুন্দর সুরম্য হর্ম্ম্যরাজী এখানে শোভা পাইতেছে। ইহার পার্শ্বে পার্শ্বে সুন্দর ক্ষেত্রগুলি মৃদু মন্দ বায়ুভরে শস্যবৃক্ষগুলি তরঙ্গায়িত করিয়া এক শ্যামবর্ণ তরঙ্গ তুলিয়া প্রান্তরের উপর

দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কাছে কাছে পতিত জমীর উপর নব দুর্ব্বাদল বাতাসে নড়িতেছে, আর গো-মহিষাদি পশুরা সেখানে আশা মিটাইয়া তাহা খাইতেছে। রাখালেরা কেহ বহুদূরগত পশুদিগকে বাঁশী বাজাইয়া ফিরাইয়া আনিতেছে; কেহ বা গাছতলায় বসিয়া ছাতু খাইতেছে; কেহ বা আপন মনে গীত গাহিতেছে। রাজত্ব পরিবর্ত্তন হইতেছে, সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে, মনুষ্যর পর মনুষ্য আসিতেছে, কিন্তু প্রকৃতি আপনার কার্য্যগুলি ধারাবাহিকরূপে সম্পন্ন করিতেছে, তাহার কিছুমাত্র ভিন্নতা নাই।

হালদার-পো একখানি একা গাড়ী ভাড়া করিয়া শৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া চলিল। গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড ধরিয়া উভয়ে পাটনা অভিমুখে চলিলেন। জীর্ণ কঙ্কালধারী অশ্ব অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে বহন করিয়া চলিল; মধ্যে মধ্যে উচু নীচু জায়গায় পড়িয়া যখন গাড়ীখানি দুলিয়া উঠিত, তখন তাঁহারা পড়িয়া যাইবার ভয়ে গাড়ীর কাষ্ঠদণ্ড ধরিয়া থাকিতেন। নানা আভরণে ভূষিত অশ্ব যখন তাহার গলস্থিত ঘুঙ্গুরের ঝুণু ঝুণু ধ্বনি করিতে করিতে একাখানি টানিত; তখন উহার ক্যাঁচ কোঁচ, ঝণাৎ ঝণাৎ শব্দে কাণ ঝালাপালা হইত। তাহার উপর আবার গাড়ীবান্ তাহার জিহ্বাগ্র উচ্চারিত টক্ টক্ ধ্বনি ও হেইট হেইট শব্দে অশ্বকে ক্ষুদ্র যষ্টি দ্বারা আঘাত করিত, আর অশ্ব লাফাইয়া লাফাইয়া সজোরে গাড়ী টানিত, তখন সেই হেঁচ্কা টানে তাঁহাদের যেন কোমর ভাঙ্গিয়া যাইত; তাঁহারা যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেন, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহাদের সর্ব্ব শরীর অত্যন্ত আড়ষ্ট হইয়া থাকিত, ও যখন চটীতে আসিয়া অতি কদর্য্য চাউল ডাইল লইয়া এক প্রকার অপক্কাবস্থায় ভোজন করিয়া একটু বিশ্রাম লাভের ইচ্ছায় শুইতেন, ভয়ানক মশক দংশনে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পারিতেন না। পথে যখন রৌদ্রের উত্তাপ বা বৃষ্টি একার সামান্য বস্ত্রাবরণভেদে প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিতে করিতে যাইতেন, তখন যুবকের ন্যায় ভাবুক লোকও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত গোচারণভূমি বা ফলভরে অবনত ক্ষেত্রগুলি দেখিয়া কিছুমাত্র আনন্দ অনুভব করিতে

পারিতেন না। এইরূপ কষ্টে প্রায় সাত আট দিন অতিবাহিত করিয়া, তাঁহারা পাটনায় আসিয়া পৌঁছিলেন। হালদার-পো বলিল, "বাবা কি যন্ত্রণা, কিন্তু দেখুন শৌরীন্দ্র বাবু আমার এ কষ্ট সওয়া আছে।"

হালদার-পো একটী সুন্দর বাঙ্গালা ভাড়া করিয়া বলিল, 'প্রস্তর বা ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ অপেক্ষা বাঙ্গালা অনেক গুণে ভাল।'—শৌরীন্দ্রমোহন সেখানে আসিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবুকে একখানি চিঠি লিখিলেন, "আমি এখন পাটনায় আছি; সরলার অনুসন্ধানে দেশে দেশে ফিরিব যত দিন না তাহার সন্ধান পাওয়া যায় তত দিন নানা স্থানে বেড়াইব; যদি পাই তবেই গৃহে ফিরিব। যখন যেখানে থাকিব, আবশ্যকীয় অর্থের জন্য সেইখান হইতে আপনাকে পত্র লিখিব।"

হালদার-পো কিন্তু সেখানে রহিল না। সে কোথায় থাকিত, তাহা শৌরীন্দ্রমোহন জানিতেন না। প্রত্যহই এক একবার আসিয়া তাঁহার নিকট বসিত, পরে সন্ধ্যা হইলে আবার চলিয়া যাইত।

একদিন হালদার-পো বলিল, "পাটনায় আসিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিলেন না। এখানে শাহ আর্জ্জনির ইমামবাড়া বলিয়া এক মস্‌জিদ্ আছে, তাহা এত বড় যে মহরমের সময় অসংখ্য লোক একত্রে সেখানে নমাজ পড়ে।"

শৌরীন্দ্রমোহন বলিলেন, "সহর দেখিতে এখানে আসা হয় নাই—শাহ আর্জ্জনির ইমামবাড়ী দেখিবার জন্য আমি ততদূর ব্যগ্র নহি। আপনি সে চোর-আবাসের সন্ধান লইয়াছেন কি!"

"হাঁ, লইতেছি বই কি! আর দেখুন আপনি পাটনেশ্বরী ঠাক্‌রুণ দেখেন নাই, অতি চমৎকার অতি সুন্দর।"

"সে আবার দেখিতে কি রকম!"

"যেমন ঢাকার ঢাকেশ্বরী, তেমনই আর কি!"

এই কথা বলিয়াই হালদার-পো দ্রুতপদে গৃহ হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু দুই চারি ঘণ্টা পরেই আবার ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার আকৃতির ও পোষাকের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছিল; তাহার মাথায় একটা প্রকাণ্ড পাগ্‌ড়ী; গায়ে লক্ষ্ণৌ ছিটের জামা। হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড়

পরা; পায়ে নাগরা জুতা; মুখে কৃত্রিম গভীরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজী। কপালে সিন্দূর চন্দনের ছড়াছড়ি।

যুবক তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। মনে করিলেন, এই নগরের কোন অধিবাসী হইবে; হালদার মহাশয়ের সহিত কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ আসিয়া থাকিবে। বলিলেন, "আইয়ে বইঠিয়ে!"

"বইঠিয়ে, বইঠিয়ে, আপ বইঠিয়ে—হামকো আপ পছনতে নেহি। মেরা নাম ভজনলাল তেওয়ারী।"—এই বলিয়া হালদার-পো হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যুবক তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হালদার-পোই এই নববেশে ভূষিত হইয়া রূপান্তরিত হইয়াছেন। অবাক্ হইয়া বলিলেন, "এ আবার কি, এ বেশে কেন?"

"চুপ্ চুপ্ এখানে আমাকে সকলে ভজনলাল তেওয়ারী বলেই জানে। বাঙ্গালা কথা কওয়া এখন আর আমার উচিত হয় না। জান ত, মিশতে হবে চোর ডাকাতদের সঙ্গে—তাদের আড্ডায় আড্ডায় ঘুর্‌তে হবে। বাঙ্গালী হলে মিশ্‌তে দেবে কেন? বরং প্রাণে নষ্ট হবার সম্ভাবনা।"—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "যা হোক্ যখন আমি এবেশে থাক্‌ব তখন ভজনলাল তেওয়ারী বলেই ডাক্‌বে, দেখো ভুলো না, তা হলে আমাদের দুজনেরই অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।"

যুবক তাহার কথা প্রমাণ ডাকিলেন, "ভজনলাল তেওয়ারী।"

ভজনলাল তেওয়ারী বলিল, "হুকুম হুজুরকা।"

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পা-কাটা মহারাজের প্রপৌত্র।

একদিন হালদার-পো (পাটনার ভজনলাল তেওয়ারী) শৌরীন্দ্রমোহনকে বলিল, "খোঁজ ত নেওয়া যাচ্চে—কিন্তু কোন খবরই পাওয়া যাচ্চে

না। ভয় নাই, যখন আমি আছি, তখন সরলাকে খুঁজে বার কর্‌বই কর্‌ব। কিন্তু এ রকম ভাবে থেকোনা। একলা থাক্‌লেই নানা ভাবনা আসে। আমোদ প্রমোদ কর, পাঁচটা এদেশের বড় লোকের সঙ্গে আলাপ কর, মনটা কতকটা ভাল থাক্‌বে। নইলে পাগল হ'তে হবে যে। মানুষ জন্ম জন্মে চিরকালটা পাগল হয়ে থাকা কি ভাল!"

শৌরীন্দ্রমোহন বলিলেন, "তুমি কি করিতে বল।"

হালদার-পো বলিল, "তুমি ত আর কারুর বাড়ী গিয়ে আলাপ কর্‌বে না। হোক্‌, আমি না হয় একজন রাজার সঙ্গে তোমার আলাপ ক'রে দেব। তিনি একজন মস্তরাজা; অনেক বিষয়, বড় একটা কারুর সঙ্গে দেখাই করেন না। তবে না কি, আমাকে যথেষ্ট মান্য করেন, খাতির ক'রে কথা কন, আমি যদি তাঁকে এখানে আস্‌তে বলি, একদিন আস্‌লেও আস্‌তে পারেন। দেখ্‌বে, তিনি এলে পরে দেখ্‌বে। কেমন অমায়িক লোক; মনে একটুও অহঙ্কার নাই। আজি তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।"

—এই বলিয়া আর সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া, হালদার-পো দুই তিন লাফে বাঙ্গালা পার হইয়া গেল।

অসাক্ষাতে কাহার প্রশংসা, যুবক হালদার-পোর মুখে শুনেন নাই, এখন মহারাজার এত প্রশংসা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মহারাজের আকৃতি প্রকৃতি দেখিবার জন্য অতি ব্যগ্রভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

'হুঁহুঁহুঁ' 'হুঁহুঁহুঁ' দূর হইতে বেহারার শব্দ শুনা গেল। যুবক বিস্মিতভাবে রাস্তার নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, একখানি বৃহৎ শিবিকা হেঁকোচ হেঁকোচ করিতে করিতে আসিয়া পৌছিল।

একজন চোপ্‌দার জোরে হাঁক দিল, "মহারাজাধিরাজ মহীপৎ ভূপৎ-সিং বাহাদুর কি জয়।"

শিবিকা হইতে দীর্ঘাকার একজন লোক নামিল, তাহার মাথায় সাঁচা জরীর টুপী, গায়ে কিম্খাপের চাপ্‌কান; কাণে বীরবৌলি—ফুলদার শাটীনের পায়জামা পরা। জরীর জুতা পায়ে—চোকে সোণার চশমা। হাতে

কতকগুলা কাগজ। বয়স অনুমান দ্বাবিংশ বৎসর। সঙ্গে দুইজন চোপ্‌দার আর পার্শ্বে হালদার-পো।

হালদার-পো হাসিতে হাসিতে হিন্দী ভাষায় বলিল, "ইহাঁরই নাম মহারাজাধিরাজ মহীপৎ ভূপৎসিং—ইহাঁরই কথা আপনাকে বলেছিলাম।"

শৌরীন্দ্রমোহন সাদরে বলিলেন, "আইয়ে মহারাজ।"

মহারাজ চশমার ভিতর হইতে কটাক্ষে একবার শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিলেন; কিন্তু তাঁহাকে না হাসিতে দেখিয়া যেন আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া বিমর্ষ হইলেন। পরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার হালদার-পোর প্রতি চাহিয়া কি সঙ্কেত করিলেন, হালদার-পোও একটু মৃদু হাসিল। শৌরীন্দ্রমোহন উহা লক্ষ্য করেন নাই।

হালদার-পো শশব্যস্ত হইয়া, 'ইধার মহারাজ, ইধার আইয়ে মহারাজ,' বলিতে বলিতে আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। আর আমাদের মহারাজ হেলিতে দুলিতে চলিলেন। দুই চোপ্‌দার তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শৌরীন্দ্রমোহনও বিরক্তভাবে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। মহারাজের অসভ্যতায় তিনি বড় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন যে ঘরে বসিতেন, সেখানে দুইখানি মাত্র কেদারা ছিল। মহারাজাধিরাজ আসিয়াই একখানিতে বসিয়া পড়িলেন। অপর-খানিতে শৌরীন্দ্রমোহন বসিলেন। হালদার-পো একখানা কাঠের চৌকী টানিয়া লইয়া তাঁহাদের নিকটে জাঁকিয়া বসিল। একজন চোপ্‌দার একখানা বৃহৎ পাখা হস্তে মহারাজকে বাতাস করিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তিনি হস্ত সঙ্কেতে নিষেধ করাতে অগত্যা নিরস্ত হইল।

শৌরীন্দ্রমোহন অতি নম্রভাবে বলিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় আসাতে যে কতদূর পর্য্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা আর বলিতে পারি না।"

"তখন মহারাজা শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি একটী গর্ব্বিতভাবপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "কি জান, মহতের স্বভাবই এইরূপ। যদিও আমি মহারাজাধিরাজ, তত্রাচ অতি সামান্য লোকের

বাড়ীতে যাইতেও কখন কুণ্ঠিত নহি। ইহাতে আমাদের মান্যের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় না।”

শৌরীন্দ্রমোহন বুঝিতে পারিলেন যে, লোকটা বড় আত্মাহঙ্কারী। আপনার গর্ব্ব করিতে, আত্ম-প্রশংসা শুনিতে বড় ভালবাসে। তাঁহার মনে বড় ঘৃণা হইল। কিন্তু ভদ্রতার অনুরোধে সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন, “সেত যথার্থ কথা!”

“আমি মহারাজাধিরাজ ত আছিই—এখন আরও কোন বড় খেতাব চাই। সার্ব্বভৌম, রাজচক্রবর্ত্তী, সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর এমনতর কোন একটা নূতন উপাধি সরকার থেকে আনাতে হবে। কেমন আমার মত একজন বড় লোককে বোধ হয়, এরূপ উপাধি দিইতে সরকার বাহাদুর কোন আপত্তি করিবেন না”—এই বলিয়া যেন অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিয়া গৃহের চারিধারে সগর্ব্বে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

শৌরীন্দ্রমোহন মনে করিলেন লোকটার নিশ্চয় বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া থাকিবে। নহিলে এমন পাগলের মত অসম্ভব ইচ্ছা প্রকাশ করিবে কেন? হাসিয়া বলিলেন, “কই, এরকম খেতাব ত কখন শুনি নাই। ইহার অর্থ বড় গুরুতর, এরূপ নূতনতর উপাধি বোধ হয় কাহাকেও দেওয়া সম্ভবযুক্ত নহে।”

“নূতন উপাধি আর কি! দিলেই হইল”, অত্যন্ত বিরক্তি ও ঘৃণা সহকারে মহারাজা বলিতে লাগিলেন, “যদি একটা পুষ্করিণী কাটাইয়া, দুর্ভিক্ষে দুইটাকা চাঁদা দিয়া, সাধারণকার্য্যে সামান্য খরচ করিয়া লোক অনায়াসে মহারাজা, রাজা, খাঁ বাহাদুর, রায় বাহাদুর, নবাব খেতাব পেতে পারে, তখন আমার মত একজন বড়লোক যে ও রকম উপাধির যোগ্য তা আর কি একবার করিয়া বলিতে হইবে! কি বলহে?

“তা না ত কি, মহারাজ” বলিয়া হালদার-পো করযোড়ে বিনীতভাবে বলিতে লাগিল, “যখন অতি সামান্য সামান্য লোক, যাদের কিছুমাত্র ভূসম্পত্তি আছে কিনা সন্দেহ!—দু-পাঁচটাকা খরচ ক'রে অমন সব উপাধি পাচ্চে, তখন আপনার পক্ষে সার্ব্বভৌম ত অতি সামান্য খেতাব। বল্‌তে কি মহারাজ, আপনার যোগ্য উপাধি আমি ত খুঁজে পাই নি।”

"ঠিক্ বলিয়াছ, ভজনলাল", এই বলিয়া ক্ষিপ্রহস্তে পকেট হইতে একটী সুবর্ণ কৌটা বাহির করিয়া সঅঙ্গুরীহস্তে কিঞ্চিৎ কাশীর নস্য লইয়া নাকে গুঁজিতে গুঁজিতে মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "হাঁ হাঁ, শুনিতে পাই না কি খেতাব সকল বিক্রয় হইবে? এক এক উপাধির এক এক দর ধরিয়া ছাপাইয়া দেওয়া হইবে। যাহার আবশ্যক হইবে, সে সেই দর দিয়া কিনিয়া লইবে। তাহা হইলে ত সব খেতাব ছি ছি হইয়া গেল। আর ত উহাদের আদর থাকিবে না, যা আছে তাহাও যাইবে।"

"সত্য নাকি মহারাজ!"—এই বলিয়া হালদার-পো বিস্মিত-নেত্রে মহারাজের মুখ পানে চাহিয়া রহিল।

"এও কখন কি হইতে পারে! আপনি ও কথা কোথা হইতে শুনিয়াছেন?"—শৌরীন্দ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহারাজ অগ্রাহ্যভাবে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "অতি বিশ্বস্তসূত্রেই শুনা হইয়াছে। বড় লাট সাহেবের দেওয়ান নিজে আমাকে এখবর পাঠিয়েছে।—কেমন নয় হে?"

চোপ্‌দার দুই জনে যোড়হস্তে নিম্নস্বরে বলিল, "হাঁ, মহারাজ।"

মহারাজের মুখ প্রফুল্ল হইল। তখন তিনি ঈষৎ গর্ব্বসূচক দৃষ্টিতে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, "কেমন শুনিলে ত, আমার কথা সত্য কি মিথ্যা। এখন কথাটা কি জান, আমাকে ঐ উপাধি গুলি লইতে হইলে কিছু টাকার আবশ্যক; বড় বেশী নয়, আন্দাজ পাঁচ হাজার টাকা হইলেই হইবে। কিন্তু হাতে এখন অত টাকা নাই, সেই জন্যই এখানে আসা; তোমাকে অনুগৃহীত করিতে ও বটে, আর টাকার জন্যও বটে। যদি ঐ টাকাটা আমাকে ধার দিতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার করা হয়।"

মহারাজের কথা শুনিয়া শৌরীন্দ্রমোহনের মনে বড় ঘৃণা ও সন্দেহ হইল। কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কেন?—আপনি মহারাজা, আপনার অগাধ বিষয়; ঐ সামান্য টাকার জন্য আপনাকে ধার করিতে হইবে?"

মহারাজা শুনিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, "কাজেই! সকল সময় ত সকলের হাতে টাকা থাকে না; আর আমি টাকা জমাতে পারিনা। এক-লাখ ছুলাখ যেমন আসে, অমনি ছুদিনে খরচ করিয়া ফেলি। আমি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারি না। আর সকল সময়ে কি সকলের হাতে টাকা থাকে। তাহা হইলে জমীদারদের জমীদারী লাটে উঠিবে কেন? ধার করিতে লজ্জাই বা কি!—আগেকার নবাবরা ধনী প্রজাদের নিকট হইতে যে কত টাকা ধার করিতেন, তাহাতে কি তাঁহাদের কিছু ক্ষতি হইত? আমি মহারাজাধিরাজ, সামান্য লোকের বাড়ী যাওয়া উচিত হয় না; কিন্তু নিতান্ত আবশ্যক হইলে কি করা যায়, এইরূপ আসিতেও হয়।"

—এই বলিয়া আর একবার নস্য লইয়া বক্রচক্ষে ঈষৎ হাসিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল, আপনি নিজে উক্ত পদবী পাইয়াছেন, না পুরুষানুক্রমে আপনাদের ভোগ দখল চলিয়া আসিতেছে ?"

শুনিয়াই মহারাজা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "একি, আজকাল-কার ফক্কীকারী খেতাব; অনেক বৎসর হইল, কোম্পানী বাহাদুরের নিকট হইতে আমার প্রপিতামহ গঙ্গারাম সিং, মহারাজা উপাধি পান। আমার প্রপিতামহ, বুঝিলেন মহাশয়, তখনকার কোন সেনাদলে এক হাওলদারের কর্ম্ম করিতেন; সে আজ প্রায় একশ বৎসরের উপরের কথা। কি জানি, কোন্ যুদ্ধে ঠিক্ মনে পড়ে না, তাঁহার একটী পা অর্দ্ধেক কাটা যায়। চারি ধারে শত্রুপক্ষের মাথা কেটে মধ্যস্থলে আপনি পাকাটা হইয়া পড়েন। তিনি বড় একজন সামান্য বীর ছিলেন না; যখন গণনা হইল, দেখা গেল, ঠিক্ দুই শত লোকের মাথা নিয়েছিলেন। কোম্পানী বাহাদুর ভারি খুসী হইয়া তাঁহাকে অনেক জমীদারী আর মহারাজা উপাধি দেন। একটী পা কাটা ছিল বলিয়া, লোকে তাঁহাকে পা-কাটা মহারাজ বলিয়া ডাকিত। আর অধিরাজ উপাধিটী আমি নিজের ক্ষমতায় কোম্পানী বাহাদুর হইতে লইয়াছি। তাই বলিতেছি, বড় যে সে লোকের প্রপৌত্র আমি নই, আর নিজেও বড় সামান্য নই। গঙ্গারাম সিংহের নাম হইলে

এখনও অনেক বড় বড় ইংরেজ মান্য করিয়া কথা কয়।”—এই বলিয়া মহারাজাধিরাজ শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি গর্ব্বিতভাবে চাহিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহন সহজেই বুঝিতে পারিলেন যে, এ লোকটী কতকগুলা অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্য বকিল। বুঝিলেন যে, ইনি কোন পুরুষেই মহারাজা নহেন এবং অর্থেরও বড় সম্ভাব নাই। তবে পৈতৃক কিছু বিষয় সম্পত্তি পাইয়া থাকিবেন। তাহাতেই সকল লোকের নিকট আপনাকে মহারাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া অহঙ্কার করিয়া বেড়ান। হালদার মহাশয়, ইহার বাক্যে মোহিত হইয়া সকল কথা বিশ্বাস করিয়া থাকিবেন। হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু মহারাজ, অত টাকা আমি কোথা হইতে পাইব। বিষয় আশয়, টাকা কড়ির সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। আমার অভিভাবক—যিনি সকল বিষয়ের তদারক করেন, তিনি আমার কথা শুনিবেন কি না সন্দেহ!—আর আমার হাতে ত অত টাকা নাই। তাইত মহারাজ—”

মহারাজ হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, “কেন? কেন?—তোমারই টাকা; সেকে?—তাকে তুমি ভয় করিয়া চলিবে কেন?—তুমি যদি তাহাকে অনুবোধ কর, সে কখনই তোমার কথা ঠেলিতে পারিবে না।”

“না মহারাজ তা নয”, শৌরীন্দ্রমোহন হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, “তিনি বড় বিবেচক লোক; তিনি আমাকে ভয় করিয়া চলিবার নহেন। আমার পিতা তাঁহাকে বিষয়ের অভিভাবক করিয়া গিয়াছেন, আমার অনুরোধ অন্যায় বুঝিলে তিনি কেন শুনিবেন?”

“এও কখন হইতে পারে? তবে বল যে তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না;—হালদার-পো আজ আমাকে বড় অপমানিত করিল।”—এই বলিযা মহারাজা সবেগে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। চোপ্‌দার দুই জনও তাঁহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

হালদার-পো আর তাঁহার সঙ্গে যাইল না; মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল, “আজ থামকা পাঁচ হাজার টাকা মারা গেল। বেটাকে এত ক'রে শিখিয়ে টিকিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে এলুম, আপনার কথার দোষে বেটা সব মাটী করলে। আবার বলে কি না, হালদার পো।

এখনই আমারও অন্নটী পর্য্যন্ত খেয়ে বসেছিল আর কি! ভাগ্যিস্ এ ছোঁড়া শুন্‌তে পাইনি, তাই রক্ষে।"

এমন সময়ে বাহিরে একটা বড় ভয়ানক জনতা শুনা গেল। উভয়ে শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, চোপ্‌দার দুই জন মহারাজকে যথেচ্ছা গালি বর্ষণ করিতেছে; কখন বা মারিতে উদ্যত হইতেছে। শিবিকা-বাহকেরা শূন্য শিবিকা স্কন্ধে করিয়া গালি দিতে দিতে যাইতেছে। আর মহারাজা পদব্রজে চোপ্‌দারদের সহিত হাতাহাতি করিতে করিতে চলিযাছেন।

দেখিয়া শৌরীন্দ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, "হালদার মহাশয়, তুমি ভয়ানক লোকের হাতে পড়িয়াছিলে। পূর্ব্বেই উহার আকার প্রকারে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, ও একজন জুয়াচোর লোক, এখানে ঠকাইবার জন্য রাজা সাজিয়া আসিয়াছিল।"

হালদার-পো বলিল, "কে জানে বাবা, আমি সাদাসিদে লোক; অত কারকোপ বুঝিনে। সহরে নবাবী কর্‌তে দেখে আমি মনে করেছিলেম, সত্য সত্য বেটা কোন একটা বড় রাজা রাজড়া হ'বে; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি সকলই ফক্কীকারী—বেটা একটা মস্ত জোচ্চোর! আজকের কালে লোক চেনা বড় সহজ কথা নয়।"

ঊনচত্বারিংশ স্তবক।

কে গায়িল?

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল। একদিন দুইদিন করিয়া শৌরীন্দ্রমোহন প্রায় দুই মাস পাটনায় রহিলেন। লোকে বলিবে যে, দুই মাস অতি সামান্য সময়। কিন্তু এই দুই মাসের মধ্যে যে কত নূতন নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, কত কত লোকের জন্ম মৃত্যু হইয়াছে; কত লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; কত সমাজনীতি শাসননীতি বদলাইয়া যাইয়াছে, পৃথিবী উল্‌টাইয়া

পাল্টাইয়া কত নূতন রূপে গঠিত হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে! সমস্ত পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, তুমি যদি একটী সামান্য পরিবারের এই দুইমাসের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ কর, একখানি বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হইতে পারে। তা এই কোটী কোটী মানবপূর্ণ জগতের ঘটনাগুলি মনে ধারণা করিতে কাহার সাধ্য?—প্রতিমূহুর্ত্তে প্রতিপলে মানবজীবনে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যিনি ঘটাইতেছেন, তাঁহার মহিমা কে বুঝিবে?

দুইমাস যাইল, এখনও হালদার-পো সরলার কোন সন্ধান দিতে পারিল না। শৌরীন্দ্রের মনে বড় সন্দেহ হইল। হালদার-পোর উপর তাঁহার সন্দেহ ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল। সে প্রায় তাঁহার নিকট একবার প্রত্যহই আসিত, আর শৌরীন্দ্রমোহনও সরলার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু সে কেবল, 'হাঁ হাঁ সন্ধান নিচ্চি বই কি! আমাকে আর সে কথা বল্‌তে হবে না',—এই বলিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিত। যখন নিতান্ত পীড়াপীড়ি দেখিত, একটা ছল করিয়া চলিয়া যাইত; আর দুই এক দিন আসিত না। এরূপ ব্যবহারে লোকের মনে সহজেই সন্দেহ হইয়া থাকে! শৌরীন্দ্রমোহন মনে করিলেন, আর দিন দুই দেখিয়া পাটনা পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। দেশে দেশে সরলার অন্বেষণ করিবেন। বৃথা আর পাটনায় থাকিবেন না।

একাকী থাকিতে কাহার ভাল লাগে? শৌরীন্দ্রমোহনের ও ভাল লাগিত না। বাড়ীতে লোকের মধ্যে পাচক, পরিচারক ও একজন দ্বারপাল। হালদার-পো দুই প্রহরের পূর্ব্বে আসিত না। সমস্ত প্রাতঃকাল তাঁহাকে একাকী থাকিতে হইত। কাজ নাই কর্ম্ম নাই, একলা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা, কাহার পক্ষে না অসহ্য বলিয়া বোধ হয়? সেইজন্য তিনি অতি প্রত্যুষে উঠিয়া বহুদূর বেড়াইয়া আসিতেন। নটার পূর্ব্বে প্রায়ই বাড়ী ফিরিতেন না। যেখানেই দেখিতেন, দুই চারিজন লোক একত্রে বেড়াইতেছে কি দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে, অমনি তাহাদের সঙ্গ লইতেন। তাহারা বিরক্ত হইয়া সরিয়া যাইলে

বা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি চাহিলেও তাহাদের সঙ্গ ছাড়িতেন না। মনে বড়ই আশা হইত, যদি ইহাদের কথাবার্ত্তায় সরলার কোন সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণের ভয় রাখিতেন না। জানিতেন যে, তাহারা যদি যথার্থ চোর ডাকাত হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রাণে নষ্ট করিতে পারে; তথাপি সরলার অনুসন্ধানে তিনি এত ব্যগ্র ছিলেন যে, প্রাণের আশঙ্কাও করিতেন না। নির্ভীকচিত্তে তাহাদের নিকট দাঁড়াইয়া তাহারা যাহা বলাবলি করিত, শুনিতেন; কিন্তু যখন সরলার বিষয়ের কোন কথা শুনিতে পাইতেন না, হতাশ হইয়া চলিয়া যাইতেন।

একদিন সেইরূপ নিশাশেষে বেড়াইতেছেন। মলিন জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্ট বাড়ীগুলি ও বৃক্ষরাজী দেখিতে দেখিতে একটী জনশূন্য পথ দিয়া যাইতেছেন। উপরে মলিন চন্দ্রমা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর জ্যোতি হইয়া আসিতেছে। শুকতারা ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আকাশে মিশাইবার উপক্রম করিতেছে। তিনি চলিতেছেন; প্রভাতের মৃদু মন্দ সমীরণে পরিধেয় বস্ত্র ও উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ ঈষৎ নড়িতেছে। বরাবর উত্তর-মুখে যাইতেছেন, এমন সময়ে বালাকণ্ঠেগীত সঙ্গীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে মধুর যন্ত্রধ্বনি হইতেছে। আর তাহার সহিত গলা মিশাইয়া কে অপ্সর-কণ্ঠে গায়িতেছে। চারি ধারের বায়ু-রাশি কাঁপাইয়া সেই গীতধ্বনি চারিধারে প্রতিঘাত করিতেছে। যেন কি মোহমন্ত্রে সমস্ত জগৎবাসীকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। শৌরীন্দ্রমোহন শুনিলেন, কে গায়িতেছে—

তু এহি স্বভাব্‌সে, কুলবালা ভুলাওহো কানাহী
আতেহু কব্ বোল্ গিয়াথা, সো আব্ মন্‌মে নেহী
কালা তেরা আব্ মন্‌মে নেহী।

মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্গীত থামিল। যন্ত্রধ্বনি স্থগিত হইল। আবার গীত উঠিল; শৌরীন্দ্রমোহন মুগ্ধচিত্তে শুনিতে লাগিলেন—

তেরা বচন ঝুটা, করম ঝুটা, ঝুটাবি জনম;
তেরা চরণ বাঁকা, গমন বাকা, বাকা দুনয়ন;

তেরা মোহন চূড়া ওভি বাঁকা, যেসা সব তেরাহী
কালা যেসা সব তেরাহী।

আবার গীত থামিল। মুহূর্ত্তের জন্য সকলই নীরব হইল। পুনরায় মৃদু সমীরণে ভর দিয়া সেই মধুর সঙ্গীত শৌরীন্দ্রমোহনকে মোহিত করিল—

তেরি পিছু লাগি প্রাণ, হোগেই সব অবসান;
ঘরপরমে অবমান, হোয়ত্ সদাহী (কালা হোয়ত্ সদাহী।)

একেবারে সমস্ত থামিয়া গেল। আর কিছুই শুনা গেলনা। শৌরীন্দ্র-মোহন স্থিরচিত্তে সেই গীত শুনিতেছিলেন। গীত এক্ষণে থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যেন তাঁহার কর্ণে তাহার ঘাতপ্রতিঘাত হইতেছে। তিনি ভাবিতেছেন, 'এ কণ্ঠস্বর যেন কোথায় শুনিয়াছি; কোথায় শুনিয়াছি, তাহা মনে পড়িতেছে না। কিছুতেই তাহা মনে পড়িল না।'—তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, 'কে গায়িল?—এই নিশাশেষে সমস্ত জগৎ মোহিত করিয়া কে গায়িল?—এ কণ্ঠস্বর অনেক বার শুনিয়াছি, কিন্তু কোথায় এবং কাহার এখন কিছুতেই মনে পড়িতেছে না।'

চত্বারিংশ স্তবক।

লালা নন্দদুলাল।

শৌরীন্দ্রমোহন একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছিলেন। চারিধারের কোন ঘট-নাই তিনি চাহিয়া দেখেন নাই। যখন চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে হালদার-পো, আর তাহার সঙ্গে একজন অতি কদাকার লোক দেখিতে পাইলেন। তিনি এতদিন বেড়াইতেছেন, পথে কখন হালদার-পোকে দেখেন নাই। বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে, এত প্রত্যূষে? সরলার কোন সন্ধান পাইয়াছ না কি?"

"হাঁ হাঁ! সন্ধান পাওয়াই বটে?—আমি আজ খুব ভোরের বেলা

তোমার বাড়ী গিয়েছিলেম, কিন্তু দেখ্‌তে পেলেম্ না। শুন্‌লেম্ তুমি নাকি রোজ ভোরের বেলা বেড়াতে বেরোও। যা হোক্ দেখা হ'ল ভালই হ'ল।"

"কেন? এত ভোরে আমাকে কি দরকার",—এই বলিয়া শৌরীন্দ্র মোহন হালদার-পোর সঙ্গীর প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন, সেরূপ কদাকার মূর্ত্তি আর কখন দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ! যেমন কালো, তেমনই মোটা। মাথাটী অতি ছোট। প্রকাণ্ড ফাঁক ফাঁক গোঁফ। চামরের মত দাড়ী। বড় বড় এবঁড়ো খেবড়ো দাঁত। কুঁচের মত ছোট ছোট চোখ। ছুঁচের মত আগাসরু নাক। সর্ব্বাঙ্গ দাদে ভরা। একখানা অর্দ্ধ ময়লা কাপড় দ্বারপালের মত পরা। গায়ে একখানা বৃন্দাবনী চাদর। মাথায় টাক—স্থানে স্থানে একটুকু একটুকু চুল। হালদার-পো ও বুঝি ইহার নিকট সুপুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

"দরকার! ভারি দরকার! বিশেষ দরকার না হ'লে এখানে আস্‌ব কেন?—একটী লোক আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়। সে বল্‌লে, অনেক কালের তার সঙ্গে তোমার আলাপ। বড় জরুরী দরকার তাই আমাকে দিয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। নিজে লজ্জায় আস্‌তে পার্‌লে না,"—হালদার-পো ব্যস্তভাবে বলিল।

"লজ্জার জন্য? কেসে? আমাকে তার কিসের লজ্জা।"—শৌরীন্দ্র-মোহন সন্দিগ্ধভাবে বলিলেন।

"একজন লোক, দিব্বি সুপুরুষ! বলে, 'আমি সরলার সন্ধান দিতে পারি,—শৌরীন্দ্রমোহন বাবুর সঙ্গে আমার একরকম চটাচটী হ'য়ে গেছে; তা নইলে আমি আপনি গিয়ে দেখা কর্‌তেম। তাতে নাকি আমারই দোষ ছিল, তাই লজ্জায় যেতে পাচ্চিনে',—কেমন নন্দদুলাল এই কথা সে বল্‌লে না?"

"হাঁ তেওয়ারীজী, বোলাতো হ্যায়", এই বলিয়া নন্দদুলাল কুটিল চক্ষে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি চাহিতে লাগিল।

"শুন্‌লে ত; আমি কি মিছা কথা বল্‌চি। সরলার জন্য আমি রোজ রোজ সন্ধান নিচ্চি। পাচ্চিনি তা কি করব। তুমি জিজ্ঞাসা কর্‌লে,

বড় লজ্জা পাই। কাল বিকেল বেলা আপনার বাসাথেকে বাড়ী যাচ্ছি, আর সে লোকটার সঙ্গে দেখা হ'ল; সে আমাকে দেখে থোম্‌কে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'আপনার কোথা থাকা হয়?'—আমি বল্‌লেম, 'শিয়ালদার শৌরীন্দ্রবাবুর কাছে।'—সে অবাক্ হ'য়ে বললে, 'তিনি এখানে!'—আমি বল্‌লেম, 'হাঁ।'—তখন সে বল্‌লে, 'তাঁকে বোলো যে, সরলার সন্ধান পাওয়া গেছে; আমি নিজে তাঁর কাছে যেতেম, কিন্তু তাঁর সঙ্গে চটাচটী হওয়াতে যেতে পাচ্চিনি। গঙ্গার ধারে আমি থাকি। তাঁকে সঙ্গে ক'রে একদিন আমার কাছে নিয়ে যেও।'—এই ব'লে আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে বাড়ী দেখিয়ে দিলে। আমি সে বাড়ী চিনি।"

"সে কে?—আমার সঙ্গে আলাপ আছে বলিতেছ; আবার আমার সঙ্গে তার বিবাদ; মনান্তর, লজ্জায় আসিতে পারে না। কে সে?—আমার ত কই মনে পড়েনা। জন্মে আমাব সঙ্গে কখন কাহার ও মনান্তর হয় নাই। তবে সে লোকটা কে?"—শৌরীন্দ্রমোহন চিন্তিত ভাবে এই কথা বলিলেন।

"কে সে?—যেই হোক্ না কেন? তোমার তাই নিয়ে অত মাথা বকাবার দরকার কি?—বল্‌লে, সে সরলার সন্ধান দিতে পারে, তা হ'লেই হ'ল। কে সে, কি বৃত্তান্ত, অত খোঁজ নেবার আমাদের কাজ কি! অবিশ্যি আলাপ থাক্‌বে, তা নইলে সে বল্‌বে কেন? এখন মনে পড়চে না, দেখলে পরে বোধ হয় চিনতে পারবে।"

"হাঁ হাঁ খাপসুরৎ লেড়কী—বহুৎ আচ্ছা; দেখনেভি যেসা, রূপেয়া ভিতেসা। উমর ভি বহুৎ কম। ওস্‌মাফিক্ সব কইকা নসীবমে মিল্‌তা নেহি। পরমেশ্বর করে হাম্‌কো দোএকঠো মিল্‌যায়", এই বলিয়া লালা নন্দদুলাল গর্দ্দভবিনিন্দিত স্বরে হাসিয়া উঠিল।

নন্দদুলালের কথা শুনিয়া শৌরীন্দ্রমোহনের আর একটা বড় সন্দেহ হইল; মনে করিলেন, লোকটা স্ত্রীলোক না কি? স্ত্রীলোকের আমার সঙ্গে আলাপ; দেখা করিতে চায়, কারণ কি!—প্রকাশ্যে বলিলেন, "ভাল, তোমার সঙ্গী বলে কি? সুন্দরী স্ত্রীলোক, বয়স কম। তবে কি সে স্ত্রীলোক না কি?"

"ও বেটা পাগল, ওর কথা ছেড়ে দিন্‌। ও আমাকে হাড়ে নাড়ে জ্বলিয়ে খেলে। যেখানে যাব, সেখানেই ওই রকম পাগলামী কর্‌বে। হ্যাঁরে, নন্দদুলাল, তুই বেটা পাগলের মত কি বক্‌চিস ?"

"পাগল! পাগল! বাউড়া! বাউড়া! তেওয়ারীজী হাম্‌ থোড়াবহুৎ বাঙ্গালা সমঝ্‌তে হেঁ! উস্‌রোজ যো একঠো বাঙ্গালা বয়েৎ হাম্‌কো বাৎলায় দিয়া ও অভতক্‌ হামারা অচ্ছা ইয়াদ হ্যায়। কেয়া! 'কিস্‌কো কপালে দালরোটী, কিস্‌কো বা দাঁত ছরকুটী।'—ওইসি মাফিক হাল হামরা ভি হুয়া। পাটনা সহর ভি আচ্ছা, চিজবিজভি বহুৎ ওয়ারা। বহুৎ আচ্ছি আচ্ছি দেখ্‌নেকা আওরৎ ভি হ্যায়—লেকেন মেরা এসা খারাপ নসীব, কোই হামকোপর নজর নেহি কর্‌তে। পরমেশ্বর করে হামকো দোএকঠো মিলযায়। উফু বহুৎ দরদ, বড়ী তজদী দেতা হ্যায়"—এই বলিয়া নন্দদুলাল একখণ্ড প্রস্তর লইয়া ঘস ঘস করিতে করিতে পিঠের দাদ চুল্‌কাইতে লাগিল।

"স্ত্রীলোকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায় ? কেন ? কে সে ?—সরলা ভিন্ন অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার ত সংশ্রব নাই। তাহাতে আবার যুবতী—কে সে ?"

"স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক বলে খেপে উঠ্‌লে না কি ? স্ত্রীলোক ? কোত্থেকে শুন্‌লে, আর কার কাছেই বা শুন্‌লে ?"

"না এ যখন বারংবার ঐ কথাই বলিতেছে, তখন আমি কোন মতেই অবিশ্বাস করিতে পারি না। এ নিশ্চয়ই কোন স্ত্রীলোক হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আচ্ছা, তুমি সত্য করিয়া বল দেখি, স্ত্রীলোক কি না ?"

"ওটা পাগল ; ও বেটার কথা যদি তোমার এতই বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ভাল আমি নয় স্বীকার কর্‌লেম, সে স্ত্রীলোক। তাতেই বা ক্ষতি কি! আমাদের কাজ পেলেই হ'ল। তা সে মেয়েই হোক্‌, পুরুষই হোক্‌; খোজাই হোক্‌ বা হিজড়েই হোক্‌। আমলোযা, আবার পাগলাটা কি বল্‌তে যাচ্ছে দেখ ? কেন মর্‌তে এ বেটাকে নিয়ে এলুম গা।"

"কুছ নেহি তেওয়ারীজী, দো চার বাত। বস্ হামকো যো বোলনেকা হ্যায় সব বোল চুকেগা। হামারা চেহারা ভি বহুৎ খারাপ নেহী, উমর ভি বহুৎ কম। আভতক সবকই হামকো ছোকরা বোল্‌তে হেঁ। তব্ কাহে মেরা নসীব এসা খারাপ হুয়া। পরমেশ্বর করে দো একঠো খাপ্‌সুরৎ লেড়্‌কী হামকোপর নজর করে"—এই বলিয়া নন্দদুলাল আপনার ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটী ঘুরাইয়া হালদার-পোর প্রতি চাহিল।

"কেন আর হাড় জ্বালাস্ বাপু?—ভাল তুই কার্ত্তিকগণেশ সব। তোর পিতামহ তোর চেহারা দেখে আদর ক'রে বাঁদর বাঁদর বলে ডাক্‌ত; আর ছেলেবেলায় কোন ছেলে তোর কাছে ভয়ে আস্‌ত না। উনি আবার সুপুরুষ হ'তে চান্। আবার বয়স কম, ছোকরা উনি। ঘেটের কোলে ঘাটে পা দিয়ে আবার ছোকরা হ'তে চান। মরণ আর কি! সুপুরুষ কি বয়স কমের কথা বলা, একদিন আমার সাজ্‌লেও সাজ্‌তে পারে।"—এই বলিয়া আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হইয়া হালদার-পো সগর্ব্বে আপনার সেই দগ্ধঅঙ্গারনিভ দেহখানি পুনঃ পুনঃ দেখিতে লাগিল।

"হা-হা-হা! আপ্ ভি যেসা জাম্বুবান্, হামভি তেসা হনুমান। দোনো বরাবর"—নন্দদুলাল হাসিয়া উঠিয়া এই কথা বলিল।

হালদার-পো মহা ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "হারামজাদা বেটা, আমাকে এই কথা। যত বড় মুখ তত বড় কথা। যা যা, যদি সুন্দর হতে চাস্, মুখে চা খড়ি আর গায়ে দেড়মণ হস্তেল মেখে বসে থাক্। আর যদি ছোকরা হ'তে চাস, গোঁফ দাড়ী ছেঁটে সব চুলে কলপ মাখগে যা।"

"বহুৎ বহুৎ সেলাম, তেওয়ারী জী! আপ হামকো আজ বহুৎ মেহেরবাণী কিয়া। খড়ি মাখকে খাপ্‌সুরৎ হোগ তো আজ হাম খড়ি ভি বন্‌যায়—পরমেশ্বর ক'রে তব দো একঠো মিলযায়"—হি-হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে উক্ত কথা গুলি বলিয়া নন্দদুলাল আপন মনে বিকটস্বরে গায়িতে লাগিল—

পরমেশ্বর করে দোএক্‌ঠো মিলযায়, তব বহুতআচ্ছা হোয়।
কেত্তা খাপ্‌সুরৎ লেড়কী পাটনা মে র'তে, সবকো নসীব্‌মে দোতিন মিল্‌তে।
হামাবা কপাল্‌মে একো ভি নেহি মিলতে।

—তব্ তেয়ারীজি কেসা গীত গাহথি ?"

হালদার-পো ও কথা শুনিয়া ও শুনিল না ; শৌরীন্দ্রমোহনকে বলিল, "আর দেরী করা ভাল দেখায় না ; যখন এখানে আস্‌বার উদ্দেশ্যই হ'ল সরলাকে পাওয়া—তখন কোন মতে ভয় পাওয়া কি ভাল ? —তাই বল্‌চি, শুভকাজে আর দেরী করা নয় ; চল, এই বেলা যাওয়া যাগ্। সরলা কোথায় আছে, সরলাকে সে কোথায় দেখেছে, সব জেনে নেওয়া যাক্। তার পর যেমন বোঝা যাবে তেমনই করা যাবে।"

শৌরীন্দ্রমোহন ক্ষণেক কি ভাবিলেন। মনে করিলেন, সে স্ত্রীলোকই হউক বা পুরুষই হউক, তাহাকে আমার ভয় কি! ঈশ্বর আমার সহায় থাকুন, আমি সামান্য মানব হইতে কেন ভয় পাইব! এ লোক-টাকে যদিও আর বিশ্বাস হয় না, তবে যখন বারবার বলিতেছে, দেখাই যাউক না। পরে বলিলেন, "ভাল তবে চল। তোমার যদি মনে এত বিশ্বাস যে সরলার সন্ধান নিশ্চয় পাওয়া যাবে—তবে চল।"

হালদার-পো, অনুরোধ রক্ষা হইল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "সেই জন্যই ত বল্‌চি, চল। দেখাই যাক না ; কিরে নন্দদুলাল, তুই বেটা যাবি, না এখানে থাক্‌বি।"

নন্দদুলাল বলিল, "একেলা হিঁয়া কেয়া করে—তব্ চলিয়ে।"

একচত্বারিংশ স্তবক।

মিশাবাই।

সেখানে দাঁড়াইয়া শৌরীন্দ্রমোহন ও হালদার-পোর কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেখান হইতে আন্দাজ চারি পাঁচ শত হস্ত দূরে, হালদার-পোর নির্দ্দিষ্ট বাড়ী। বাড়ীখানি গঙ্গার অতি নিকটে—বেশ সুন্দর দ্বিতল বাড়ী। সম্মুখে কাষ্ঠ-খোদিত বারাণ্ডা। নূতন চূণকাম করা।

আজ কালের ধরণে প্রস্তুত গৃহগুলি। এক মহল। ভিতরে ঢুকিতেই বামে পাথরের সিঁড়ি—তাহার একপার্শ্ব ভিত্তি, ও অপরপার্শ্ব কাষ্ঠের রেইল দ্বারা সুরক্ষিত। সিঁড়ি পার হইয়াই একটী ছোট চাতাল। তার পরেই একটী লম্বা টানা ঘর। ঘরের ভিতর আটটী রুজু খড়খড়ী ও চাতালের সম্মুখে দুইটী বড় বড় দরজা।

হালদার-পো ও নন্দদুলাল আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল। শৌরীন্দ্রমোহন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নন্দদুলাল নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করিতে করিতে অস্পষ্টভাবে কি বকিতে বকিতে যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তিনজনে সেই বাড়ীর নিকট আসিয়া থামিলেন।

হালদার-পো বলিল, "এই বাড়ী, এই বাড়ীতেই সে থাকে।"

—এই বলিয়া সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে হালদার-পো এক বিকট চীৎকার করিল। শৌরীন্দ্রমোহন চমকিত হইয়া উঠিলেন; নন্দদুলাল খিল্ খিল্ করিয়া হাসিল।

ঘরের ভিতর হইতে মৃদু মৃদু তান্পুরার আওয়াজ উঠিল।

শৌরীন্দ্রমোহন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একি?—কোথায় আসিলাম?"

হালদার-পো হাসিয়া বলিল, "কেন?—এখানেই ত সে থাকে; আমি বেশ ক'রে দেখেছি, এই সে বাড়ী। সন্দেহ কি?—উঠে এসো না।—এখানে একজন বাইজী থাকেন বটে—তাঁর নাম মিশাবাই; তা থাক্লই বা। সে লোকটা বোধ হয় কোথাও গিয়ে থাকবে; ততক্ষণ না হয়, এদের দুটো গানই শোনা যাক্। তাতে আর হানি কি?"

বলিতে বলিতে হালদার-পো দ্রুতপদে নন্দদুলালকে সঙ্গে লইয়া সিঁড়ি পার হইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। শৌরীন্দ্রমোহন ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

ঘরের ভিতরে যাইবামাত্র তবল্জী ঘাড় নীচু করিয়া, 'বইঠিয়ে বাবু সাব', বলিয়া সেলাম করিল। আর বাইজী তাঁহার প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিলেন। পরে উঠিয়া তাঁহাকে হাতে ধরিয়া আপনার অতি নিকটেই

বসাইলেন। শৌরীন্দ্রমোহন অগত্যা ভদ্রতার অনুরোধে তাহাতে কোনরূপ আপত্তি করিতে পারিলেন না। চারিধার চাহিয়া দেখিলেন যে, মেঝের একখানি সুন্দর গালিচা পাতা; দেয়ালের গায়ে অনেক ছবি, দেয়ালগিরি ও ঘড়ী। ঘরের দুই পার্শ্বে দুই খানা বৃহৎ আয়না। আর অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিসে ঘরটী সাজান।

বাইজী মছ্‌লন্দের উপর একটা বড় তাকিয়ায় ঠেস দিয়া বসিলেন, দুই পার্শ্বে দুইটী ছোট ছোট পাশবালিস। বামে একটী বৃহৎ রূপার আল্‌বোলা—তাহার মাথায় চীনের কলিকা, তাহাতে রূপার সরপোস ও জিঞ্জীর ঝুলিতেছে। আল্‌বোলার সোণার মুখনল একটা পাশবালিসের উপর রহিয়াছে। বাইজী তম্বুরা লইয়া দক্ষিণ হস্তের কোমল অঙ্গুলী চালনা দ্বারা তাহার তারে আঘাত করিতে লাগিলেন; আর তাহা হইতে 'জয় সী তা রাম, জয় সী তা রাম', এই সুর উঠিতে লাগিল। সম্মুখে তবল্‌জী ঘাড় হেঁট করিয়া হাতুড়ী দ্বারা সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিল।—ঠক্-ঠক্-ঠুন্;—ঠক্-ঠক-ঠুন্; ঠক-ঠক্ ঠকাস—ঠুন-ঠুন-ধা। ত্রেকেট্ ধা, ত্রেকেট ধা। তার পর বাঁয়া উপুড় করিয়া টিপ্ টিপ্ করিয়া ঘা দিল। পরে তাহা হইতে দুই তিনটা 'ধা' আওয়াজ বাহির করিয়া, দুই হাতে গোফ পাকাইতে আরম্ভ করিল।

শৌরীন্দ্রমোহন দেখিলেন, বাইজী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী; নিটোল গড়ন। পরণে পায়জামা, আঙ্গেয়া কোর্ত্তা—তার উপর ওড়না। সর্ব্বাঙ্গে হীরক-খচিত অলঙ্কার। পৃষ্ঠে দুইটী বেণী ফণীর আকারে পড়িয়া শোভা পাইতেছে। মুখখানি প্রফুল্ল, সদাই হাসি হাসি।

তবল্‌জীর মুখে খুব বড় গালাপাট্টা; জোড়া গোঁফ, দুদিকে পাকিয়ে তোলা। চুড়ীদার পায়জামা, চাপ্‌কান আর মাথায় গোলাপী রঙ্গের পাগড়ী; চেহারা মন্দ নয়।

দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, যেন ইহাদিগকে কোথায় দেখিয়াছি।—কে এরা?—কই মনে করিয়া দেখি, তাহারাই কি! তাহারা এখানে কেন আসিবে?—অসম্ভব। এক প্রকার আকৃতি কি দুই জনের হইতে পারে না!

বাইজী সুর ধরিলেন—য়া-য়া-য়া-য়া-য়া-য়া। তবল্‌জী বাজাইতে লাগিল। ক্রমে গীত আরম্ভ হইল—

কাহেতু শোচত প্যারী কহত বাখানি;
তু হামারি অঙ্গ আধা হোয়ৎ বিনোদিনী।

তাধিন্‌ ধিন ধা, ধাধিন্‌ ধিন ধা, ধাধিন ধিন ধা নাতিন্‌ তিন্‌ তা।
তেৎধাগে ত্রেকেট দিন, ধাধিন্‌ দিন তা; তেৎ ধাগে ত্রেকেট ধিন, দা তিন তিন তা।

ছোড়্‌কী গোলোকাসন, সাথ্‌লেহি সখাগণ;
ঢুড়তহি বৃন্দাবন হাম্‌, দিনওয়া (তেরালাগি) দিন যামিনী।

ধাত্রাকি ধেন ধেন ধাত্তিন্না, কৎধেন কেটেধেন দাগা থুন্না: ধিন ধিন্না ধিন্না ধিন,
ধাত্তিন্‌তা তিন্না তিন, নাক ধিন্না, ধাক্‌ধিন্না, ধাগ্‌ধিন্না, নাক্‌ তিন্না, ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ ধক্‌ ধরাৎ।

শুনিয়ে বাত হাম্মারি ফেরত ম্যায় লিয়ে বাঁশরী;
তেরিনাম সদাফুঁকারী, আর কুছ্‌ম্যা না জানি।

ধিন্‌ তেরে কেটে তাক্‌ নাগ্‌ দিৎ ত্রান,
ধা ধা কিটি তাক, দিন্‌ তা কিটিতাক্‌, কৎ তিকি কিটিতাক, ধাগ্‌ ধাৎ ত্রান।
ধাতেরে কিটিতাক, ধিন্‌ ধিন কিটিতাক, ধক ধিকি ধিকি ধক,
তেরেকেট ত্রান, ধাগ ধিৎ ত্রান, ধাগ্‌ ধাৎ ঘ্রান।

গীত সমাপ্ত হইল। বাইজী শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বাঁ হাতে একখানি পাখা লইবামাত্রই তবলজী অমনি হাঁ-হাঁ করিয়া একখানা বড় পাখা লইয়া বাইজীকে বাতাস করিতে আরম্ভ করিল।

হালদার-পো গীত শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বাইজীকে সেলাম করিতে করিতে বলিল, "বাহবা বাহবা, কেয়াবাৎ সুকনআল্‌গা।"

এই কথা শুনিয়া বড় হাসির ধূম পড়িয়া গেল। বাইজী ও তবল্‌জী উভয়ে হাসিয়া আকুল। তবল্‌জী বলিল, "সুকনআল্‌গা নেহি, সুভানাল্লা কহিয়ে।"

হালদার-পো ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "ও একি বাৎ, একি বাৎ হায়।"

এমন সময়ে 'চিলাম বদ্‌লাইবার' হুকুম হইল। একজন চাকর আসিয়া

আলবোলায় নূতন কলিকা পরাইয়া দিল। অম্বুরী তামাকের সৌগন্ধে চারিধার আমোদিত করিল। বাইজী একটান টানিয়া, 'বাবু সাব তামাকু পিইয়ে' বলিয়া শৌরীন্দ্রমোহনের দিকে নল বাড়াইয়া দিলেন। হালদার-পো অমনি হাঁ হাঁ-হাঁ করিয়া বলিল, "বাবুসাব, তামাকু নেহি পিতে হেঁ।"

হালদার-পো পুনরায় বলিল, "বাইজী, বাবুকো দো একঠো বাঙ্গালা গীত শুনাইয়ে।"

বাইজী বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা, হাম্ যো চিজ গাতী হায় ও সব হামারি তয়ারি, হাম্ কিসিকো ঝুটা চিজ গাতী নেহি। তব শুনিয়ে।"

তবল্জী অমনি 'হাঁ, হাঁ' করিয়া দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে বলিল, "ম্যাবি কিস্থকা বোল নেহি বাজাওতে হুঁ, মেরা চাচা লালা মাধোলালকা পাস যো বোল শিখাথা ওহি বোল ম্যা বাজাওতে হুঁ।"—পরে ঠক্ ঠক্ করিয়া সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

পুনরায় গীত আরম্ভ হইল,—

আমি, মন প্রাণ দিয়ে তোরে তবু পেলেম না
তোর মনে আর কি আছে তাই খুলে বল্না।
শুনি তাই খুলে বল্না।

ধেন্ দাগ, দাগি ধেন্ তা, ধেন দাগ দাগি থুন্ তা।
ধাত্তিন্ তা, ধাক্ ধিন্ ধা, তাক্ ধিন ধা, ধাক তিন তা।

জলের ঘাটে কি ক্ষণে, তোরে হেরেছি নয়নে!
সেই অবধি চিত মোর ধৈর্য্য মানে না;
যাদু আর ধৈর্য্য মানেনা।

ধা তেরেকেট ধিন, ধাগেনাকে তিন, তা তেরেকেটে তিন, তাকে নাকে ধিন।
ধা ত্রেকেট ধিন্, ধাগ্ তিন্না তিন, তা ত্রেকেট ধিন্, ধাগ্ ধিন্না ধিন্,
ধিনি ধাক্ ধিন্না, তিনি তাক ধিন্নি, ধাগ ধৎ ত্রান ধাকধাৎ ত্রান, ধিনিই ধাক।

এমতি তুহি নিদয়, নারীবধে নাহি ভয়,
পুন দেখা হ'ল যদি, তোরে ছাড়্ব না;
এবার তোরে ছাড়্ব না।

ধেরে নাগ্ ধেরে নাগ্ তাক্ ধেরে নাগ্ তাকে ধেরে নাগ্, ধেরে ধেরে নাগ্,
তোকে ধেরে নাগ্ মোকে ধেরে নাগ্ গেদে থুন্না, থুন থুন্না, তুনতুন্না, ধিকি ধিন্না,
ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় ঘড়াৎ, চড় চড় চড় চড় চড়াৎ, ঝর ঝর ঝর ঝর ঝড়াৎ।

শিখাব তোয় ভাল ক'রে, রাখিয়া হৃদি পিঞ্জরে
বাঁধিয়া প্রেমেরই ডোরে, আর উড়্‌তে দিব না।
যাদু আর তোরে যেতে দিবনা।

কড় কড় কড় কড় কড়াৎ বোলে, ধেরে নেরে গুড় গুড়
ঝন ঝন ঝন ঝন ঝনাৎ বোলে তেরেকেটে তুড় তুড়।
গায়রে ধেনে কিটি, তায়রে তেনে কিটি, দাগা থুন্না থুন্ থুন্না ধাগা, ধিন্না, নাগ্ ধিন্,
ত্রেকেট ধিন্না, ধিন ধিন্না, ধিন ধিন্না ধাৎ, সড় সড় সড় সড় সড়াৎ, ধর ধর ধর ধর ধরাৎ।

গীত ও বাদ্য থামিয়া গেল। যে মাত্র 'ধর ধর ধর ধর ধরাৎ' শব্দে বাজনার বিরাম হইল। আমাদের বাইজী ও 'আর তোরে যেতে দিব না' বলিয়া একেবারে সহসা শৌরীন্দ্রমোহনের কোলে বসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল, "সাত রাজার ধন, আমার মাথার মাণিক, আমার হৃদয় রতন, আমায় ছাড়িয়া এতদিন কোন্ নিঠুর প্রাণে কাটাইতেছিলে? তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছিলাম; আর তুমি তো বেশ আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতেছিলে দেখিতেছি। যাদুমণি তোর কি একবারও আমায় মনে পড়িত না—তাই ত দেখ্‌ছি; পুরুষজাতির কি একটুকু মায়া দয়া থাকে না! আজ দৈবযোগে যদি তোর দেখা পাইলাম, আর ছাড়িব না।"

—এই বলিয়া বাইজী শৌরীন্দ্রমোহনের গলদেশ আরও দঢ়রূপে ধরিয়া, তাঁহাকে আপনার বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

শৌরীন্দ্রমোহন শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি হালদার-পোর সকল ছল চাতুরী এখন বুঝিতে পারিলেন। বাইজী ও তবল্‌চীর ছদ্মবেশের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "পাপীয়সী! তুই এখানে?—তোর তীব্র দংশনের ভয়ে আমি ভাগলপুর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। যুগলকিশোর বাবুর নিকট তোর

দুশ্চরিত্রের কারণে বোধ হয় অবিশ্বাসী হইয়াছিলাম। তুই আবার এখানে আমাকে যন্ত্রণা দিতে আসিয়াছিস্। তোর মত পাতকীর মুখ দেখিতেও পাপ আছে। তোর স্বামী তোর কাছে কি দোষ করিয়াছিলেন যে তাঁহাকে তুই পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভালবাসার এরূপ জঘন্য প্রতিদান দিয়া এখানে আসিয়াছিস্! তিনি ত তোকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন, তোর জন্য পাগল: তবে কোন দোষে তাঁহার প্রতি এরূপ জঘন্য আচারণ করিলি। যা নরকী, যা। আর তোর নিঃশ্বাসে আমার দেহ অপবিত্র করিস্ না।"

—এই বলিয়া শৌরীন্দ্রমোহন সবলে জানকীবাইয়ের সে দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিলেন। সে আরও দৃঢ় করিয়া ধরিল। তিনি অকৃতকার্য্য হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

শৌরীন্দ্রমোহনের চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া হালদার-পো হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "এমন নইলে ভালবাসা। যাকে ভাল বাসা বল্‌তে হয়। দেখ দেখনি এমন ভালবাসা কি তোমার সরলা বাস্‌ত।"

নন্দদুলাল হিংসাচক্ষে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি চাহিয়া রহিল। আর আমাদের তবল্‌জী গোঁফের দুইপ্রান্ত মুচড়াইতে মুচড়াইতে বলিতে লাগিল, "বাবু সাব এত্তা খাফ্‌া কাহে। সেরে দুনিয়ামে যো সব্‌সে উম্‌দা চীজ; যিস্‌কা পাঁওপর পাৎসা, নবাব, আমীর সবকই গোলামকা মাফিক পড় রতেহেঁ; আপ্‌কো ভালা নসীব, যো ওহি আপ্‌কো পাশ আপ্‌সে গিয়া। তব কেয়া সব্‌সে আপ্‌কা এত্তা গোসা।"

শৌরীন্দ্রমোহন রুক্ষদৃষ্টিতে তবল্‌জীর প্রতি চাহিলেন; পরে কর্কশ-স্বরে বলিতে লাগিলেন, "কৃতঘ্ন, তোর ছদ্মবেশ আর এখন খাটিতেছে না। তোর জঘন্য চরিত্রের প্রমাণ আমি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম, এখন সম্পূর্ণ দেখিলাম। তোর মুঙ্গেরে থাকিবার কারণ এখন বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। তুই যুগলকিশোর বাবুর অন্নে প্রতিপালিত হইয়া, তাহারই সর্ব্বনাশ করিলি—তাহারই স্ত্রীকে লইয়া পলাইয়াছিস্!—তোর অসাধ্য কর্ম্ম কিছুই নাই।"

ব্রজেন্দ্র বিকৃত-চক্ষে শৌরীন্দ্রমোহনের প্রতি এক কুটিল চাহনি চাহিয়া এক বিকট হাসি হাসিল। সে হাসিতে শৌরীন্দ্রমোহনের দৃঢ় হৃদয় ও কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহা শঠতা ও প্রতিহিংসায় পূর্ণ।

জানকীবাই এতক্ষণ শৌরীন্দ্রমোহনের স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতেছিল। যখন তিনি তাহাকে ওরূপ যোগ্য বাক্যে তিরস্কার করিলেন, তখন জানকী (পাটনার মিশ্রবাই), সেই ভাবে থাকিয়াই বলিতে লাগিল, "নির্দ্দয়! তুই বড়ই নিষ্ঠুর, তা না হইলেই বা তুই ওরূপ কথা মুখে আনিবি কেন?—তোর জন্য কিনা করিয়াছি। তুই আমাকে যখন ভাগলপুরে সেরূপ অপমানিত করিলি তখন কি আমি তোর আশা ছাড়িয়াছিলাম। তোর এই সুন্দর মুখখানি (বলিয়াই চুম্বন করিল) আমার হৃদয়ে জাগিতেছিল। তোকে এক পলকের জন্যও কি আমি ভুলিতে পারি!—আমি তোর মতন নই, আমি এ প্রাণ থাকিতে তোকে ভুলিতে পারিব না—তোর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিব তবু তোর আশা ছাড়িব না"—এই বলিয়া ছল ছল চক্ষে শৌরীন্দ্রমোহনের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পরে আবার কম্পিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "দিবারাত্র তোমাকেই ভাবিতাম; কিসে তোমাকে পাইব, সেই উপায়ই দেখিতাম। তোমার বড়ই নির্দ্দয় প্রাণ, তাহা না হইলে ওরূপ কথা মুখে আনিবে কেন?—যখন দেখিলাম, ভাগলপুরে থাকিয়া তোমাকে পাইবার কোন আশা নাই, তখন তোমার জন্যই, কেবল তোমাকে পাইবার জন্যই স্বামীকে পর্য্যন্তও—"

—আর বলিতে হইল না। শৌরীন্দ্রমোহন শেষ কথাগুলি সকল বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার হৃদয়ে যেন কি হলাহল জ্বলিয়া উঠিল; সমস্ত শরীরে যেন শত শত বৃশ্চিক দংশন করিল। তিনি বিদ্যুৎ বেগে জানকীবাইয়ের আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "পাপীয়সী! নরঘাতিনী! কি বলিলি, স্বামীকে পর্য্যন্তও—"

আর বলিতে পারিলেন না। ভীষণ আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। তিনি দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিলেন; কেহ তাঁহার সে বেগ রোধ করিল না। সকলে তাঁহার বাক্য যেন

ক্ষণেকের জন্য জড়প্রায় হইয়া বসিয়াছিল; কেহ তাঁহার সে বেগ থামাইতে চেষ্টা পাইল না।

দ্বিচত্বারিংশ স্তবক।

পাটনা পরিত্যাগ।

শৌরীন্দ্রমোহন যখন সেরূপ দ্রুতবেগে উঠিয়া গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন জানকীবাই তাঁহার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া সুখ অনুভব করিতেছিল। তিনি সবেগে উঠাতে জানকীবাই স্থানচ্যুত হইয়া মেঝেয় পড়িয়া গেল। মস্তকে দারুণ আঘাত লাগিল। তখন পাপীয়সী ক্রোধে অধীরা হইয়া সম্মুখে অন্য কিছু না পাইয়া আল্‌বোলাটা লইয়া বারাণ্ডায় যাইল। পরে ক্ষিপ্রহস্তে শৌরীন্দ্রমোহনকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িল। সৌভাগ্যক্রমে আল্‌বোলা তাঁহার কেশ স্পর্শ করিয়া কিছু দূরে পড়িল। তাহা না হইলে তাঁহার প্রাণ সংশয় পর্য্যন্ত ঘটিত। কিন্তু কলিকার অগ্নি লাগিয়া তাঁহার চাদর ধরিয়া উঠিল। তিনি সভয়ে চাদরখানি পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন। জানকীবাই হতাশ হইয়া ফণিনীর মত গর্জ্জাইতে গর্জ্জাইতে গৃহে আসিয়া বলিতে লাগিল, "হতভাগা, বড় বাঁচিয়া গেল; কিন্তু যমে যাহাকে ধরে তাহাকে ছাড়ে না, ঔষধে তাহাকে কয়দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারে! হতভাগার নিতান্ত অদৃষ্ট মন্দ, তাহা নহিলে এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিবে কেন!—বলিতে কি হতভাগাকে আমি ভাল বাসিতাম, তাহা নহিলে তাহাকে [illegible] জন্য এমন কার্য্য করিব কেন? আর না, আর আমি উহার জন্য ক্ষণেকের আশা রাখি না। আমার ভালবাসার উপযুক্ত প্রতিদানই দিয়াছে। দেখিব, কেমন ওর অদৃষ্টে সুখ থাকে, দেখিব কেমন ও প্রাণে বাচিয়া থাকে।"—এই বলিয়া সে শৌরীন্দ্রমোহনকে উল্লেখ করিয়া আরও কত কথা বলিতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্র কোন কথা কহিল না, জানকী বাইয়ের কথায় যেন আহ্লাদিত হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

হালদার-পো বলিল, "বেটার যেমন কপাল! অদেষ্ট তেমন না হ'লে আর অমন লক্ষ্মীছাড়া দশা হয়! এমন রত্ন হাতে পেয়ে কিনা বেটা হেলায় হারালে!—বেটার হাড়ে লক্ষ্মী নেইগো হাড়ে লক্ষ্মী নেই। তা নইলে কে একটা ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ের জন্যে কেঁদে কেঁদে মরে। আহা মরে যাই, মরে যাই, বেটা সোণা ফেলে আঁচলে গেরো দিলে গা। এমন হাবাতে ত কোথাও দেখি নাই গা। হায়, হায়, হায়, বেটার এমন পোড়া কপাল, এমন পোড়া কপাল," এই বলিয়া যেন শৌরীন্দ্রমোহনের জন্য দুঃখিত হইয়া সে সঘনে বক্ষদেশে আঘাত করিতে লাগিল।

তখন জানকীবাই ক্রোধে অধীরা হইয়া ওড়না ছিঁড়িয়া ফেলিল। মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল। গাত্রের বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ব্রজেন্দ্র তাহাকে সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিল, "ভয় কি, আমি আছি, আমি আছি। ওটার জন্য আর দুঃখ করিও না—ও একটা অকালকুষ্মাণ্ড বই ত নয়, প্রণয়ের কি ধার ধারে।"

"নসিব, নসিব; কপালমে হ্যায় নেহি"—এই বলিয়া লালা নন্দদুলাল জানকীবাইয়ের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিল।

"জ্বালার উপর জ্বালা; একে আমি সাত জ্বালায় পুড়ে মর্‌চি, তার উপর তুই আবার জ্বালাস্ কেন বাপু? তোর আবার হিন্দী কথা কেন?—এখানে তোর আবার হিন্দী কথা কওয়া কেন?—তুই বেটা ত আমাদের সেই দেদো গোপালে ছাড়া আর কেউ ন'স।"—অত্যন্ত বিরক্তির সহিত হালদার-পো এই কথা বলিল।

"হা-হা-হা-হা! সবই ত জান দাদা, আমি তোমার কতকেলের ইয়ার"—এই কথা বলিতে বলিতে দেদোগোপাল একহস্তে হালদার-পোর গলা জড়াইয়া ধরিল।

"দূর বেটা, দূর দূর; ছাড় বাঁদর, গলা ছাড়; আমার আরও অনেক কাজ আছে", এই বলিয়া দেদো গোপালের হাত ছাড়াইয়া লইয়া হালদার-পো

চারিধার চাহিতে চাহিতে জানকীবাইয়ের একখানি পরিত্যক্ত বহুমূল্য অলঙ্কার চাদরের ভিতর লুকাইতে লুকাইতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "এখানে আর ত কোন আশা নাই, যথালাভ। এখন ও চেষ্টাটা ছাড়া হবে না।"

কিন্তু দেদো গোপালের সে কূট দৃষ্টির নিকট কিছুই লুকাইবার যো ছিল না। সে হাসিয়া বলিল, "দাদা, ভাল, আমি ছোট ভাই।"

হালদার-পো সভয়ে তাহাকে হস্ত সঙ্কেতে কথা কহিতে নিষেধ করিয়া বাম হস্তের পাঁচটী অঙ্গুলী দেখাইল। পরে সবেগে গৃহের বাহিরে আসিল।

দেদো গোপাল এবং হালদার-পো যাহা করিল, জানকীবাই বা ব্রজেন্দ্র কেহই তাহা দেখিতে পায় নাই।

হালদার-পো শৌরীন্দ্রমোহনকে যে আশ্বাসে এখানে আনিয়াছিল, তাহা ত তাহার সিদ্ধ হইল না। সে প্রচুর অর্থলোভে শৌরীন্দ্রমোহনকে জানকীবাইয়ের নিকট আনিয়াছিল ; এখন সে কিছু আত্মসাৎ করিয়া মনে করিল, শৌরীন্দ্রমোহনের আশাটাও ছাড়া হইবে না। সেই জন্য সে একেবারে শৌরীন্দ্রমোহনের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

হালদার-পোকে দেখিবামাত্রই শৌরীন্দ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, "পাজী আবার তুই এখানে?—দূর হ্। তোর মুখ দেখিতে চাহি না। যখন তুই একজন ভদ্রলোকের নামে জঘন্য গ্লানি করিয়াছিলি, তখনই তুই কি ধরণের লোক তাহা আমার জানা উচিত ছিল। যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন তুই কিরূপ চরিত্রের লোক তাহা আমি বেশ জানিতে পারিয়াছি। আর তুই আমার বাড়ীতে আসিস্ না। যা, যা বলিতেছি, নহিলে বল প্রয়োগে বাহির করিয়া দিব।"

"বটে?—ভাল করতে গেলাম, মন্দ হ'লো। তোমার কি খারাপ হচ্ছিল। তোমার সরলার চেয়ে লক্ষ গুণে সুন্দরী, তাতে আপনি সেধে ছিল। যাক্ যখন তুমি তাকে চাওনা, সে কথার আর দরকার নেই—আমাদের আপনা আপনির ভেতর সেই কথা নিয়ে ঝগড়া কর্‌বার দরকার নেই—এস, রাম রাম বোলো দাদা",—এই বলিয়া হালদার-পো শৌরীন্দ্রমোহনের হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইল।

"আমার কথা শুনচিস্‌নি, নিতান্ত মার না খাইয়া যাবিনি"—এই বলিয়া শৌরীন্দ্রমোহন ডাকিলেন, "ধনুকধারি! ধনুকধারি!"

কালান্তক যমের মত আকৃতি অনুগত দ্বারপাল আসিয়া, তাঁহার অনুমতির অপেক্ষায় সম্মুখে দাঁড়াইল। বলিল, "হুজুর!"

হালদার-পো নিরুপায় দেখিয়া শৌরীন্দ্রমোহনের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া দিল। তখন সে দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে মার্‌বি, সাধ্যি বড়; সারা পাটনা আমার ভয়ে কাঁপে। নেহাৎ তার মরণ ঘুনিয়ে এসেছে, তা নইলে আমাকে এমন কথা বল্‌বি কেন!—আচ্ছা, যা, দুচার দিনের জন্যে বেঁচে থাক্‌।"

পরে প্রহারের ভয়ে আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া পলায়ন করিল।

হালদার-পোর শাসন-বাক্যে যদি ও শৌরীন্দ্রমোহন কিছুমাত্র ভীত হয়েন নাই, তত্রাচ তিনি পাটনায় বৃথা কাল হরণ করা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ করিলেন। মনে করিলেন, "আর প্রতারকের ছল বাক্যে ভুলিব না; বৃথা এরূপে সময় নষ্ট করা উচিত নহে। এই পৃথিবীতে কত অসম্ভব অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিতেছে। তা আমি কেন না সরলার সহিত পুনরায় মিলিত হইবার আশা করিব। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, জঙ্গলে জঙ্গলে, যদি সরলার অন্বেষণ করিয়া বেড়াই, তবে কেনই বা না তাহার সহিত একদিন না একদিন মিলিত হইব? বিধাতা, এ অভাগার মানস পূরি

সেই দিন মধ্যাহ্নেই তিনি পাটনা পরিত্যাগ করিলে

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত